আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আল-গাযালীর অবদান

এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

উপস্থাপক

মোহাম্মদ আফছারুল মিজান

এম.ফিল গবেষক

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক

অধ্যাপক

Dhaka University Library
382725
382725

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ডিসেম্বর, ১৯৯৯ খ্রী.

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম.ফিল গবেষক মোহাম্মদ আফছারুল মিজান কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত *আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আল-গাযালীর অবদান* শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে ইতঃপূর্বে এ শিরোনামে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয় নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত কপি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

০১/১২/১১

ড. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক
অধ্যাপক,
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

382725

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা দিচ্ছি যে, *আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আল গাযালীর অবদান* শীর্ষক এম.ফিল অভিসন্দর্ভ আমার নিজস্ব ও একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার এ গবেষণা কর্মের পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি।

৩১/১২/৯৯

মোহাম্মদ আফছারুল মিজান
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ নং ১৩৩/১৯৯৪-৯৫
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

382725

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ইমাম গাযালী (রঃ) একাদশ শতাব্দীর শুরুতে ধর্ম ও চিন্তার সংঘাত নিরসন কল্পে এবং যুক্তিবাদী ধর্ম তাত্ত্বিকগণের মনগড়া ব্যাখ্যার মূলোৎপাটন করে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। ইউরোপসহ গোটা বিশ্বে তখন মুসলমানদের যে দুর্দিন চলছিল তার মোকাবেলায় তিনি যথার্থ ভূমিকা পালন করেন। তারমত মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষ অতি অল্পই পরিচিত। এ অভাব পূরণার্থ তাঁর কর্মজীবনের অবদান সমূহের দু'টি দিক নিয়ে গবেষণার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক তত্ত্বাবধায়ক ড. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক। তাঁর পরামর্শে অভিসন্দর্ভের শিরোনাম *আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আল গযালীর অবদান* নির্ধারণ করা হয়। তিনি আমাকে তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মূল্যবান সময় ও দিক নিদর্শনা দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টির অনুমোদন দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন।

অভিসন্দর্ভ রচনায় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, আরবী বিভাগ গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী ও ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীসহ বিভিন্ন জেলা শহরের ছোট বড় লাইব্রেরী ব্যবহার করেছি। এ জন্য আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞ। এছাড়া গবেষক-প্রাবন্ধিক জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ মানজুর আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে বই, পত্রিকা সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি তৈরীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা করেছেন। আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মাষ্টার জনাব আমিরুল মুমেনীন মামুন আমাকে পাণ্ডুলিপি তৈরী ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন। সহযোগিতার ক্ষেত্রে আমার আম্মা মনোয়ারা বেগম ও আমার স্ত্রী রহিমা জামানের অবদানও কম নয়। এদের সবাইকে আল্লাহ উত্তম জাযা দিন।

সর্বোপরি এ সন্দর্ভ রচনায় বিভাগীয় সম্মানীয় শিক্ষকবৃন্দের পরামর্শ আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছে। তাছাড়া এখানে অনুল্লেখ্য যে সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা হতে আমি সহযোগিতা পেয়েছি তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

মোহাম্মদ আফছারুল মিজান

382725

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত পরিচয়

(স.)	ঃ	সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন)
(আ.)	ঃ	আলাইহিস সালাম (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)
(রা.)	ঃ	রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)
(র)	ঃ	রহমাতুল্লাহি আলাইহি (তাঁর উপর রহমত বর্ষিত হোক)
(হি.)	ঃ	হিজরী
(খ্রী.)	ঃ	খ্রীষ্টাব্দ
(ব.)	ঃ	বঙ্গাব্দ
ই.বি.	ঃ	ইসলামী বিশ্বকোষ
অনু.	ঃ	অনুবাদ / অনূদিত
ই.ফা.বা	ঃ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
গাযালী	ঃ	ইমাম গাযালী (রঃ)

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রত্যয়ন পত্র / আ
ঘোষণা পত্র / আ
কৃতজ্ঞতা স্বীকার / ই
সংকেত পরিচয় / ঈ
ভূমিকা / ১-৩
সমকালীন পরিবেশ / ৪-৭
প্রথম অধ্যায় ঃ গাযালী (রঃ)-এর পরিচয়
প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ বংশ পরিচয়, জন্ম ও শিক্ষা / ৮-১৯
বংশ পরিচয়, গাযালী শব্দের বানান, শৈশবকাল ও শিক্ষা জীবন, আরবী শিক্ষার প্রতি তার আগ্রহ, হাদীস শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন, তাফসীর শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন, মাতৃভাষার প্রতি আগ্রহ, সময়ানুবর্তিতা, উচ্চ শিক্ষার জন্য জুরজান গমন, নিযামিয়ায় ভর্তি, রাজ দরবারে তার আগমন, বায়াত গ্রহণ, তার ক'জন শিক্ষক, সন্তান-সন্ততি, শিষ্যবৃন্দ।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ কর্মজীবন / ২০-৩৫
কর্মজীবনে পর্দাপন, কর্মজীবন থেকে অব্যহতি, দামেস্কে ও জেরুজালেম গমন, মুকামে খলীলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, মদীনা ও মক্কা শরীফে গমন, হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্মস্থান যিয়ারত, সংসার ত্যাগ ও অধ্যক্ষ পদ থেকে অব্যহতির কারণ, নির্জন বাস ত্যাগ করার কারণ, একটি ঘটনা, পুনরায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান, অধ্যক্ষ পদ পুনঃগ্রহণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান, ঈর্ষার কোপে গাযালী, মৃত্যুবরণ, কবরস্থান, মুনাজাত।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ গাযালীর রচিত গ্রন্থ / ৩৬-৩৯
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ আরবীতে আল-গাযালীর অবদান / ৪০-৯৪
মিনহাজুল আবেদীন, বিদায়াতুল হিদায়াহ্, আর রিসালাতুল-ওয়া'জিয়্যাহ সত্যের সন্ধান, ইহয়্যা উলুমিদদ্বীন, মনখুল, মীযানুল আমল, মাকাসিদুল ফালাসিফাহ, তাহাফাতুল ফালাসিফাহ, আরবাঈন।
তৃতীয় অধ্যায় ঃ গাযালীর স্থান নিরূপণ / ৯৫-১০২
চতুর্থ অধ্যায় ঃ ইসলাম শিক্ষা বিস্তারে আল-গাযালীর অবদান / ১০৩-২০৩
প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পরিচয় / ১০৩-১১৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ঈমান / ১১৯-১৩৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ আত্মার পরিচয় / ১৩৪-১৫৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ তাক্ওয়া / ১৫৬-১৭৪
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ গীবত / ১৭৫-১৮৩
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ অহংকার, হিংসা, ক্রোধ, রিয়া / ১৮৪-২০৩
উপসংহার / ২০৪
প্রামাণ্য চিত্র / ২০৫
গ্রন্থপঞ্জী / ২০৬-২০৮

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

কল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের প্রভু। সালাম রাসূল (স.) এর প্রতি যিনি মানব জাতির পথ প্রদর্শক।

ারবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আল-গাযালী'র অবদান শীর্ষক র্ভটি রচনা করতে গিয়ে এ ভূমিকার অবতারণা। একাদশ প্রখ্যাত দার্শনিক, আরবীবিদ, অন্যতম তাপস ও ইসলামী স্তারের পথিকৃৎ গাযালী'র অবদান অতুলনীয়। তিনি একজন চু স্তরের মুসলিম তত্ত্ববিদ[১] সকলের চিন্তার বিরুদ্ধে ভ্রান্তির কল্পে এবং ইসলামের জয়গান তুলে ধরতে তিনি অবিরাম । তার লিখার মাধ্যম ছিল বলা যায় আরবীই। এছাড়া ও তিনি ও লিখেছেন। তাঁর মাতৃভাষা ফারসী হওয়ার শর্তেও তিনি লেখা পড়ার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর সব লিখনীতে ভাবধারার পরিস্ফুটন ঘটেছে।

মুহূর্তে এরিষ্টটল, প্লেটো এবং পাশ্চাত্যের সমসাময়িক দের ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে যুব সমাজ ইসলামী 'অকীদা রে সরে যায়। যুক্তিবাদি ধর্ম-তাত্ত্বিকগণ ইসলামের বিধি-নিষেধ ক শিক্ষা গুলোর মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে। বাতিনিয়া নিজেদেরকে আল কুরআনের বিশেষ গোপনীয় তথ্যের বাহক ী করে এবং ইসলামের যাবতীয় পরিভাষার বিকৃত ব্যাখ্যা দিতে যেমন, ইসলামে নামায অর্থ প্রচলিত নামায নয় বরং নামায কালীন রাজন্যবর্গের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। যাকাত অর্থ জ্ঞানের প্রচারের সাহায্য করা, রোযা অর্থ মনের গোপন কথা রাখার অভ্যাস গড়ে তোলা। জান্নাত অর্থ ইলমে বাতিন আর

---

১ Nasir Jawed, *The Muslims World* (India, Medialine New delh, 1996), P 135.

Dhaka University Institutional Repository

জাহান্নাম অর্থ ইল্‌মে জাহির ইত্যাদি[১]। সূফীরা নিজেদেরকে আল্লাহর বিশিষ্ট নির্বাচিত মনে করেছিল। সে মুহূর্তে গাযালী (রা.) ইসলামী ভাবধারায় এগুলোর মোকাবিলা করেন এবং তাদের মন গড়া চিন্তা ও ধারণার মূলোৎপাটন করেন।

আমার জানা মতে এ যাবৎ বাংলাদেশে ইমাম গাযালীর আরবী ও ইসলামী শিক্ষার অবদানের উপর কোন অভিসন্দর্ভ রচনা করা হয় নি। আমি লক্ষ্য করেছি একাদশ শতাব্দির ন্যায় বর্তমানেও আমাদের যুব সমাজের একটি বিরাট অংশ গ্রীক দর্শনের প্রভাবে ইসলামী আকীদা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আরেকটি অংশ ভণ্ডপীরদের অনুসরণে ইসলামের মৌলিক ইবাদত সমূহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে না। তারা মনে করে নামাজ, রোযা ইত্যাদি করার প্রয়োজন নেই। আমরা সরাসরি আল্লাহকে পাবো। আবার আমরা নিজেদের কে যারা ঈমানদার মনে করি তারাও বিভিন্ন কার্যকলাপে আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্ব করে ফেলি। ফলে তার অজান্তে সে ঈমান হারা হয়ে যায়। এ সব লক্ষ্য করে আমি উপরোল্লেখিত অভিসন্দর্ভটি রচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি।

আমি অভিসন্দর্ভটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। প্রথম অধ্যায়ে গাযালী (রঃ) এর পরিচয় বর্ণনা করেছি। এটি চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে প্রথম পরিচ্ছেদে তার বংশ পরিচয়, জন্ম ও শিক্ষা; দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কর্মজীবন; তৃতীয় অনুচ্ছেদে গাযালীর রচিত গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গাযালী (রঃ) এর আরবীতে অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেছি। মূলত এ অধ্যায়ে তার রচিত গ্রন্থ ও কবিতা সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। তৃতীয় অধ্যায়ে গাযালী (রঃ) সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীদের মূল্যায়ণ তুলে ধরেছি। চতুর্থ অধ্যায়টি বিন্যাস করেছি গাযালী (রঃ) এর ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে

[১] মুশতাক আহমদ, তাহরীকে দেওবন্দ (ঢাকাঃ শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

অবদান সম্পর্কে। এ অধ্যায়টিকে ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে আলোচনা করেছি। এতে যথাক্রমে আল্লাহর পরিচয়; ঈমান; আত্মার পরিচয়; তাক্ওয়া; গীবত; অহংকার, হিংসা, ক্রোধ ও রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সবশেষে গাযালী (রঃ) এর আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় তার অবদানকে মূল্যায়ণ করে উপসংহার টেনেছি। এ অভিসন্দর্ভ রচনায় আমি যে সব প্রামাণ্য গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি তার একটি তালিকা প্রদান করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

সমকালীন পরিবেশ

রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা ঃ

একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় ছিল আববাসীয় শাসনকাল। এ সময় আববাসীয় রাজ বংশের গৌরব সূর্য প্রায় অস্তামিত। তখন ক্ষমতায় সমাসীন ছিলেন সুলতান মাহমুদ। আববাসীয় রাজ বংশের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাজ্যের চারিদিক হতে তখন বিদ্রোহের ঝড়-তুফান আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বিদ্রোহের পুরোভাগে দেখা যায় তুর্কী জাতি। শক্তি সামর্থে তারা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা সমগ্র দুনিয়ায় প্রভূত্ব কায়েম করে। মুসলিম জাহানের অধিকাংশ দেশেই তাদের বিজয় নিশান উড়তে দেখা যায়।[৩] আবার তুর্কীদের মধ্যে সালজুক বংশই ছিল উল্লেখযোগ্য ক্ষমতার অধিকারী। সালজুকগণ তুর্কী গোত্রীয় খুজ বংশোদ্ভূত। তারা অসভ্য নিরক্ষর এবং অজ্ঞ ছিল। আনুমানিক ৯৫৬ খৃ. তুর্কীগণ সালজুক বিন বারকয়ারূপের নেতৃত্বে তুর্কিস্তানের কিরগিজ মালভূমি হতে সয়হুন নদী অতিক্রম করে দক্ষিণ ট্রান্সক্রিয়ানার বোখারায় এসে বসতি স্থাপন করে। কালক্রমে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সুন্নী মতবাদের সমর্থক হয়। অতঃপর তারা সালজুকের পুত্র পিত্ত আরসলানের নেতৃত্বে আক্রাস নদী আক্রমণ করে পূর্ব পারস্য এসে বসতি স্থাপন করে।

সুলতান মাহমূদ তাদেরকে পরাজিত করে আজারবাইজানে নির্বাসিত করেন। সুলতান মাহমূদের মৃত্যুর পর তারা পুনরায় শক্তিশালী হয়ে উঠে। এ সময় সালজুকের পৌত্র তুগারিল বেগ তাদের নেতা নির্বাচিত হন। তিনি সালজুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ও তার ভাই চাগরী বেগ খোরাসান পর্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগে তাদের অধিপত্য বিস্তার করেন। ১০৪০ খৃ. তাঁরা সুলতান মাহমূদের পুত্র মাসুদকে পরাজিত করে

[৩] হাফেজ মাওলানা আবদুল জলিল অনুদিত *মেশকাতুল আনোয়ার* (ঢাকা বাংলাদেশ আজ কোম্পানী ১৯৯৪), পৃ ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

মার্ভ ও নিশাপুর দখল করে। ক্রমেই তাঁরা সমগ্র গজনী রাজ্যই অধিকার করতে সক্ষম হন।[৪] পঁচিশ বৎসর রাজত্ব করবার পর তুগানিল বেগ ১০৬৩ খৃ. মারা যান। তার মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আল্প-আরসালান রাষ্ট্রের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। তিনি ১০৭২ খৃ. মৃত্যু মুখে পতিত হন।

আলপ-আরসালানের মৃত্যুর পর তার পুত্র মালিক শাহ সিংহাসণে আরোহন করেন। সালজুক বংশের ইতিহাসে মালিক শাহের রাজত্বকালে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। তার শাসনামলে সাম্রাজ্যের আয়তন সু-বিস্তৃত ছিল।[৫] আর মন্ত্রী ছিলেন আমীদ কান্দারী। তাঁর অদক্ষতার কারণে তাঁকে মন্ত্রীত্ব হতে পদচ্যুত করে নিযাসূল মুলককে মন্ত্রীত্ব পদে আসীন করেন। অতঃপর মালেক শাহ সাম্রাজ্যের যাবতীয় দায়িত্ব নিযামুল মুলকের উপর অর্পণ করেন এবং তাকে আতাবেগ (আমির শাসন কর্তা) উপাধীতে ভূষিত করেন। নিজামুল মূলক মন্ত্রীত্বের আসনে সমাসীন হওয়ার পর শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গুণীজনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। যাতে করে রাজ্যের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। বিশেষ করে তিনি জ্ঞান তাপস ইমামুল হারামায়ানকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেন।

খলীফা মালিক শাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন নিয়ামুল মূলক। তার আসল নাম খাজা হাসান ইবনে আলী। তার রাষ্ট্রীয় উপাধী ছিল "আতাবেগ"। মালিক শাহের শাসনামলের উন্নতির উচ্চ শিখরের ও গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায়ের জন্য নিযামুল মূলকের অবদান ছিল অবিস্মরনীয়। নিযামুল মূলক এমন ভাবে সাম্রাজ্যের আয়তন ও গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, যা খেলাফতী শাসনের পর আর কোন সুলতানের পক্ষে সম্ভব পর হয়নি। শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে নিযামুল মূলকের দান ছিল

---

[৪]. আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস বাংলা দেশ* (ঢাকা, আইডিয়াল লাইব্রেরী) ১৯৯৫), পৃ ২৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

অপরিসীম। তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের আলেম, গুণী, এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তারই প্রচেস্টায় শিক্ষা-দীক্ষায় যথেষ্ট উন্নতি ও প্রসার লাভ ঘটে ছিল। প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে মক্তব-মাদ্রাসা গড়ে তুলেছিলেন। ইবনে ওমর উপদ্বীপ যেখানে লোকজনের তেমন যাতায়াত ছিল না, সেখানে ও বিরাট মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিভিন্ন স্থানে অনেক মসজিদ তৈরী করেন। তিনি তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির এক দশমাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করেন। তিনি শিক্ষার উন্নতি কল্পে তার নামানুসারে Nizamiyah Academy of Nishapur (1065-1067) প্রতিষ্ঠা করেন। যা বর্তমানে নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত। একই সাথে তিনি একজন প্রতিভাবান রাজনীতিবিদ ছিলেনঃ এ সম্পর্কে অধ্যাপক হিট্রি বলেন। "Nizamul Mulk was one of the ornaments of the political history of Islam।[৬] শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তার যে অবদান সে সম্পর্কে আমির আলী যথার্থ বলেছেন ঃ "Nizamul Mulk was probably after yahya Barmaki the able minister and administrator Asia produced".

শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ

এ সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইসলামের ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। বিজ্ঞানী, শিল্পী, কবি এবং দার্শনিকদের শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে গবেষণাগার স্থাপন করা হয়। যেহেতু রাষ্ট্র পরিচালিত, হতো ইসলামী শরি'য়া মুতাবিক, সেহেতু রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে দেশের প্রখ্যাত আলেমদের পরামর্শ গ্রহণ করা হতো। জটিল ও কঠিন শরি'য়া আইনসমূহ দেশের আইনজ্ঞ আলিমরা সমাধান দিতেন। বিশেষ করে নিযামিয়া মাদ্রাসার প্রধান অধ্যাপক (অধ্যক্ষ) ইমামুল হারামায়ান ছিলেন আইনজ্ঞদের প্রধান। তার মৃত্যুর পর গাযারী (রঃ) ছিলেন অন্যতম। রাজদরবারে সকল সমস্যার ব্যাপারে গাযালী (রঃ) কে ডাকা হতো। সে সময় মুসলিম কৃষ্টি ও সভ্যতা বিকাশে খ্যাতি অর্জন করেন, ফরিদ উদ্দীন

---

[৫]. কে আলী, *ইসলামের ইতিহাস* (ঢাকঃ আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৯৩), পৃ ৩৬৮।
[৬]. *ইসলামের ইতিহাস* প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইবিদ ও দার্শনিক ওমর খৈয়াম, কবিও পরিব্রাজক নাসির-
ইতিহাসিক নিজামী, ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক গাযালী (রঃ)
শাস্ত্রে মুসলামানদের যে অবদান ছিল, পৃথিবীর অন্যান্য
া কোন অংশে কম ছিল না। ইসলামী দর্শনের মূল ভিত্তি
ও হাদীস। দর্শন শাস্ত্র সমৃদ্ধিতে যে সকল মুসলিম মনিষীর
ীয় হয়ে রয়েছে তাঁদের মধ্যে আলকিন্দি, আলফারাবী,
ইমাম গাযালী? জ্ঞান অর্জনের প্রতি মুসলমানদের স্পৃহা
ণ্য। তাঁরা কুরআন, হাদীস, ইসলামী জ্ঞান অর্জন করে
চলিত য়াহূদী, খ্রীষ্টান, পারসিক, প্রাচীন গ্রীক, মিশরীয় ও
জ্ঞান আহরণে প্রবৃত্ত হন। ফলে, জ্যোতিশাস্ত্র, জড়বাদ,
াদি বিভিন্ন প্রকার মতবাদের সংমিশ্রণে মুসলিম সমাজে
র সূত্রপাত হয় এবং ইসলামী আকাঈদ ও জ্ঞানের সহিত
ত্রক অনৈসলামী ধর্ম বিশ্বাস ও জ্ঞান এমন ভাবে মিশে যায়
ামী আকাঈদ ও অনৈসলামী আকাঈদে প্রার্থক্য করা দূরূহ
উঠে। গাযালী (রঃ) এ সকল মতপার্থক্য নিরসনে
াকা পালন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

গাযালী (রঃ)-এর পরিচয়

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ বংশ পরিচয়, জন্ম ও শিক্ষা

নাম ও জন্ম ঃ

পুর্ননাম আবূ হামিদ মুহাম্মাদ ইব্নে মুহাম্মাদ ইব্নে মুহাম্মদ ইব্নে তাস আহমাদ আত-তুশী আশ-শা'ফিয়ী আল গাযালী।[৭] বংশীয় উপাধী গাযালী, স্বয়েনদ্দীন তার মর্যাদা সুচক উপাধী, তিনি পারস্যের বর্তমানে ইরানের খোরাসান প্রদেশের অন্তর্গত তুশ জেলার তাবারান[৮] নগরে ৪৫০ হিঃ সন মোতাবেক ১০৫৮ খৃ. অধ্যাপক শরীফ খানের মতে ১০৫৯ খৃ. জন্ম গ্রহণ করেন।[৯] His dynestic tille is Ghazali[10]. Mujjathul Islam was the surname of Ghajali". "The ornament of the faith" and "The prrof of Islam." Considered a Mujaddid and reckoned equal is rank with the four Imams[11].

গাযালী হিসাবে পরিচয় ঃ

গাযাল শব্দের অর্থ সুতাকাটা, এখানে পশমি সুতা বুঝানো হয়েছে। মাওলানা শিবিবর আহমাদ নু'মানীর মতে, তার পূর্ব পুরুষগণ

---

[৭]. মুহাম্মদ এলাহী বখশ, আল গাযালী, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, (ঢাকা ঃ ই.ফা.বা. ১৯৯১) ১০ম খণ্ড, পৃ-৩৬০।

[৮]. তাবারান শহরটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আক্রমনে ধ্বংস হয়ে যায়। বর্তমানে Meshed নামে পরিচিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা অক্টোবর ডিসেম্বর ১৯৯৭-পৃ.

[৯]. Mohammad Sharif, *Muhammad Anwar Saleem. Muslim Philosophy and Philosophers.* (Ashish publishing House, DELHI, 1994) p-73.

[10]. AL-HAJ FAZLUL-KARIM, *IMAM GHAZZALIS IHYA ULAMUDIN*, Islamic Book. Services. New DELHI, p-2.

[11]. T.C. Rastogi *Muslim world Islam Breaks Frech Ground* (Ashish publishing House, New delhi. 1986) p-92.

Dhaka University Institutional Repository

পশমি সুতা কেটে তার ব্যবসা করতেন।[১২] তাই তাদের বংশীয় উপাধী ছিল গাযালী। কারো কারো মতে তিনি ছোট বেলায় হরিণের মত চক্ষু বিশিষ্ট অপরূপ সুদর্শন ছিলেন। আর গাযালী অর্থ হলো হরিণ। তাই পিতা-মাতা তাকে গাযালী বলে ডাকতেন। আল্লামা শাম'য়ানীর মতে, তুস জেলার একটি গ্রামের নাম গাযালী, তিনি সে গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাই তাকে গাযালী বলা হতো। পরবর্তী সময় গাযালী হিসেবে তার পরিচয় ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং প্রথমোক্ত মতই সঠিক এবং সত্য। যেমন Attar থেকে Attri, Khabbaz, থকে Khabbaji, তমনি গাযালী থেকে গাযালী।

গাযালী শব্দের বানান ঃ

ইবনে খালিকানের মতে গাযালী শব্দটির বানানে তাশদিদযুক্ত ব্যবহার করেছেন, তথা গাযযালা।[১৩] আল্লামা শাম'য়ানী গাযালী শব্দটির তাশদীদ বিহীন ব্যবহার করেছেন, নিকলসন বলেন "যারা তাশদিদ যুক্ত দ্বারা গায্যালী লিখেছেন, তাদের সামান্য ভুল হয়েছে মনে করে আমি সাম'য়ানীর বানান পদ্ধতি তাশদিদ বিহীন গ্রহণ করেছি। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অধ্যাপক শরিফ খান এবং আনওয়ার সেলিম শাম'য়ানীর পদ্ধতি গ্রহণ করেন।[১৪]

শৈশবকাল ও শিক্ষা জীবন ঃ

তাঁর পিতা একজন শিক্ষানুরাগী ও ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সুফীবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি স্বীয় উপার্জনের মাধ্যমে সংসার পরিচালনা করতেন। তার আয়ের উৎস ছিল সামান্য সুতা বিক্রি। গাযালী (রঃ)-এর দাদা ছিলেন একজন গণ্যমান্য নেতা, তাঁর পিতা ইন্তিকালের পর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর মাতা ও দাদা।

---

12 R.A. NICHOLSON *A Literary History of the Aoeabs* (Delhi India. Adam publishers and Distributers, 1907) P-339

13 Ibn Khailikan, *Biographical Dictionary*. (Deslane's translation Vol-I, 1256) P-80.

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসাকে কেন্দ্র করে তিনি বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমন করার সুযোগ পান। এতে তিনি শিক্ষার মান ও মর্যাদা অনুধাবন করতে পেরেছেন। তাই তিনি সংকল্প করলেন যেকোন ভাবে হোক ছেলেদ্বয়কে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করাবেন। মৃত্যুকাল ঘনিয়ে আসলে গাযালীর (রঃ) পিতা তাঁর এক বিশ্বস্ত সুফী বন্ধুর হাতে গাযালী ও আহমাদকে তুলে দিয়ে বলেন, "বন্ধু! জীবনে আমি লেখা পড়া শিখতে পারিনি। তাই আমার একান্ত ইচ্ছে, আমার ছেলে দু'টি যেন লেখা পড়া শিখে আমার সে অপরাধের কিছুটা প্রায়শ্চিত করবে। তুমি তাদের লেখা পড়ার ব্যবস্থা করে দিবে। পিতার মৃত্যুর পর তারা দুই ভাই সে সুফীর তত্ত্বাবধানে থেকে লেখা-পড়া শিখতে থাকেন। অস্বাভাবিক মেধা ও প্রতিভার কারণেই দুই জনই অল্প সময়ের মধ্যে কুরআন হেফ্জ করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরবী শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর একদিন পিতৃবন্ধু ভ্রাতৃদ্বয়কে বললেন, "তোমাদের শিক্ষাদানের জন্য তোমাদের পিতা আমার নিকট যে অর্থ গচ্ছিত রেখে গেছেন তা শেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া আমার আর্থিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নয় যে, তোমাদের শিক্ষা ব্যয়ভার বহন করতে পারি। সুতরাং আমার মতে তোমরা দু'জন এখন হতে কোন অবৈতনিক মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে লেখা-পড়া শিখতে থাকো। পিতৃবন্ধুর পরামর্শ মতে তারা একটি অবৈতনিক মাদ্রাসা খুঁজে বের করলেন। অতঃপর সেখানে ভর্তি হয়ে ধর্মতত্ত্বের উপর শিক্ষা গ্রহণ শুরু করলেন, যাতে করে জীবিকা নির্বাহের উপায় অবলম্বন করা যায়। এ সময় গাযালী (রঃ) নিজ সম্পর্কে বলেন, "We went to the collage to Learn (fiqh) So that we might going our livelihood".[15]

তৎকালীন প্রখ্যাত আলিম আবূ হামিদ আশকারায়েনী (রঃ) আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ যোবয়নী প্রমুখ উস্তাদের নিকট তিনি শিক্ষা লাভ করেন। তাদের মাধ্যমে তিনি ফিকাহ বিষয়ে অস্বাভাবিক জ্ঞান অর্জন

[14] ইমাম গাযালী *মিনহাজুল আবেদীন*, অনুবাদক, মুজিবুর রহমান, ঢাকা ঃ ই. ফা. রা. জুন ১৯৯৪, পৃ-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

করেন। এ সময় কুরআন হাদীস ও বিবিধ বিষয় ও জ্ঞান অর্জন করেন। ফিকাহ শাস্ত্রবিদ আল্লামা আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ বায়কানির নিকট তিনি ফিকাহ শাস্ত্রের প্রাথমিক কিতাবসমূহ অধ্যায়ন করেন। তীক্ষ্ম মেধা ও প্রখরতার কারণে অল্প দিনের মধ্যে মাদ্রাসার সিলেবাস শেষ করেন।

আরবী শিক্ষার প্রতি তার আগ্রহ ঃ

ইরানের ভাষা ফারসী, তাই গাযালীর (রঃ) মাতৃভাষাও ছিল ফারসী। খোরাসানের অধিকাংশ লোক ফারসী ভাষায় লেখা-পড়া শিখতো। কিন্তু তিনি ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি আরবী ভাষাকে লেখা-পড়ার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন যা তৎকালীন সময় ছিল বিরল। তাঁর শিক্ষকদের সু-দৃষ্টির ফলে তিনি অল্প দিনের মধ্যে আরবী ভাষা আয়ত্ব করতে সক্ষম হন। আরবী ভাষার উপর তিনি এত ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেন, যা বর্ণনাতীত। তাঁর রচনাবলী আরবীতে লিখতেন এবং লেখার মাধ্যমও ছিল আরবী। তার প্রায় চারশত রচনাবলী ও একশত তিরাশিটি উপদেশ সভা ছিল। প্রায় সবগুলি তিনি আরবীতে লিখেন। বিভিন্ন সময়ে কবিতা আবৃতি করেন, যা আরবীতে আবৃতি করা হয়। আরবী ভাষায় পারদর্শী হওয়ার কারণে অতি সহজে নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পান।

হাদীস শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন ঃ

গাযালী (রঃ) পাঠ্য জীবনে বিভিন্ন শাস্ত্র শিক্ষার চরম পর্যায়ে উপনীত হলেও ইলমে হাদীসে সে মানে পৌঁছতে পারেন নাই। বিভিন্ন শাস্ত্র শিক্ষার পরে সময়ের অভাব এবং যোগ্য শিক্ষকের অভাব প্রভৃতি কারণে তিনি হাদীস শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জনে বঞ্চিত হন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁর হাদীস শিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এব্যাপারে তার ভাগ্যও সুপ্রসন্ন ছিল। ঘটনাক্রমে, হাফিজ ওমর ইবনে আবিল হাসান নামক তৎকালীন এক প্রখ্যাত মুহাদ্দিস তুস নগরে আগমন করেন।

---

[15] *Auterary History of the Arabs*, প্রাগুক্ত P-339.

Dhaka University Institutional Repository

গাযালী (রঃ) তাঁকে সসম্মানে ও অত্যন্ত যত্নসহকারে নিজের গৃহে স্থান দান করলেন। সেখানে হাদীস গ্রন্থের তালিম গ্রহণ করেন। মুহাদ্দিস ওমর (রঃ) তার এই পূর্ব প্রতিভাশালী ছাত্রকে নিজের মনোরমত করে হাদীস শাস্ত্রে পারদর্শী করে তুলেন্হেই সু-প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসের সংসর্গ ও শিক্ষাদানে গাযালী (রঃ) ইল্ম হাদীসেও সমসাময়িক যুগের শ্রেষ্ঠ হাদীসবিদদের একজনে পরিণত হল।

তাফসীর শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন ঃ

ইমাম গাযালী (রঃ) ইমামুল হারামাযানের নিকট কুরআনের তাফসীর শিক্ষা গ্রহণ করেন। শিক্ষক তাঁর প্রখর মেধা দেখে তার প্রতি যত্নবান হন। ইমাম গাযালী (রঃ) অল্প দিনের তাফসীর শাস্ত্রে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেন। যার ফলশ্রুতিতে তিনি একখানা তাফসীর লিখেন। যার নাম *ইয়া কুতুত্যাবীল ফি তাফসীরিল তানযিন*। যা ৫০ (পঞ্চাশ) খণ্ডে বিভক্ত ছিল।

মাতৃভাষার প্রতি আগ্রহ ঃ

ইবনে সিনা সুলতান আলাউদ্দীনার অনুরোধে গাযালী দর্শন শাস্ত্রে একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব পারসী ভাষায় লিখেন। কিন্তু সাধারণের বোধগম্য না হওয়ায় তার অকালে মৃত্যু হয়েছে। পরবর্তী সময়ে *ইহয়্যা উলুমিদ* দ্বীনকে ফারসীর পরিচ্ছদ পরিধান করালেন এবং *কিমিয়ায়ে সায়াদাত* নামক গ্রন্থখানা ফারসী ভাষায় লিখেন। তারপর তাঁরই প্রভাবে খাজা ফরিদ উদ্দীন আত্তার, মাওলানা রুমী, শেখ সাদী, সিরাজী, হাফেজ প্রমূখ কবি ও সূফী গণের অভ্যুত্থান হয়েছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এ যে, ফারসীর উপর গাযালী (রঃ) এর প্রভাবে যে মতবাদ প্রবেশ করে তা ধর্ম জগতে এক বিপ্রব উপস্থিত করেছে। মাওলানা রুমী যে বিপ্লবের মাঝে আধ্যাত্মিক প্রেরণা প্রবেশ করায়ে দিয়েছেন। মূল কথা হলো, গাযালীর (রঃ) ফারসী ভাষায় অবদান অসামান্য।

Dhaka University Institutional Repository

সময়নুবর্বিতা ঃ

হঠাৎ একদিন "নিয়ামিয়া মাদ্রাসার" (বর্তমানে নিয়ামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে পরিচিত) প্রতিষ্ঠাতা নিযামুল মুলক মাদ্রাসা পরিদর্শন করতে যান। ঘটনাক্রমে সে ছিল নিশাপুরে হাতি প্রদর্শনী চলছিল। গাযালী (রঃ) ছাড়া মাদ্রাসার সকল ছাত্র হাতি দেখতে যায়। 'নিযামুল মূলক' মাদ্রাসা ভবনে উঠে দেখেন কোন ছাত্র নেই। তাই তিনি মনে মনে মনস্থ করলেন, মাদ্রাসা ভবন পুড়ে ছাঁই করে দিবেন, তিনি মন্তব্য করলেন, যেহেতু ছাত্ররা লেখা-পড়ার প্রতি অমনোযোগী সেহেতু মাদ্রাসা রেখে কোন লাভ হবে না।

এ চিন্তা করতে করতে তিনি বের হচ্ছেন। এমতাবস্থায় সিঁড়ির পাশ্বের কক্ষে একজন ছাত্রকে লেখা-পড়া করতে দেখেন। গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তোমার নাম কি ? তুমি কেন হাতি দেখতে গেলে না? প্রতি উত্তরে গাযালী বললেন, আমার নাম আবূ হামিদ। আমি এখানে লেখা-পড়া করতে এসেছি। হাতি দেখতে আসিনি। গাযালীর (রঃ) এ কথা শুনে 'নিযামুল মূলক' অত্যন্ত খুশি হলেন। আর অতি আনন্দে বলে উঠলেন, তোমার কারণে আজ 'নিযামিয়া মাদ্রাসার' অস্তিত্ব রক্ষা পেল। অন্যথায়, ইতিহাসের পাতায় নিযামিয়া মাদ্রাসার নাম থাকতো না।

এতে করে বুঝা যায়, ইমাম গাযালীর (রঃ) লেখা-পড়ার প্রতি কিরূপ আগ্রহ ও উদ্দীপনা ছিল। তাঁর ছিল অস্বাভাবিক সময়ানুবর্তিতা। তাঁর সম্পর্কে আল্লামা নব্বী বলেনঃ "ইমাম গাযালীর সম্পূর্ণ আয়ুষ্কাল ও তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী হিসাবান্তে আমি গড় করে দেখেছি, তিনি গড়ে প্রত্যহ ১৬ পৃষ্ঠা লিখেছেন।

উচ্চ শিক্ষার জন্য জুরজান গমন ঃ

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি জুরজান শহরে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য গমন করেন। এখানে তিনি ইমাম আবূ নসর ইসমাইল (রহঃ) নিকট শিক্ষা গ্রহণ আরম্ভ করেন। আবূ নসর ইসমাইল (রঃ) জুরজানের একজন শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। ইমাম গাযালীর (রঃ) তীক্ষ্ম মেধা ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তিনি তাঁকে

Dhaka University Institutional Repository

সর্বশক্তি প্রয়োগে শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হলেন। তৎকালে শিক্ষকগণ পাঠ্য বিষয় যে বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করতেন শিক্ষার্থীগণকে তা হুবহু লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য করাতেন। এ লিখিত নোট গুলিকে তালীকাত বলা হতো। এভাবে গাযালী (রঃ) তালীকাতের এক বিরাট দপ্তর সঞ্চয় করলেন। জুরজানে অধ্যয়ন সমাপান্তে গাযালী (রঃ) স্বীয় জন্মভূমি তাবারানের অভিমুখে যাত্রা করেন।

ক) দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত ঃ

জুরজান থেকে আগমনের পথে দস্যুদল তা'লীকাতসহ তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নেয়। টাকা-পয়সা পোশাক পরিচ্ছদ ও বিভিন্ন জিনিসপত্র লুণ্ঠিত হওয়ায় তিনি কোন চিন্তা করলেন না বরং তা'লীকাত অপহরণে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তা'লীকাত তথা নোটগুলি ফেরত পাওয়ার জন্য দস্যুসরদারের নিকট এ বলে অনুরোধ জানালেন যে, এতে তার সমস্ত অর্জিত বিদ্যা বিদ্যমান তথা সঞ্চিত রয়েছে। দস্যুসরদার উপহাসের স্বরে বলল, "তুমি তো বেশ বিদ্যা অর্জন করেছ! তবে তো তুমি বিদ্যার জাহাজ"। এ কথা বলে সে তা'লীকাত ফিরে দিলো, দস্যুসরদারের ব্যাঙ্গোক্তি গাযালী (রঃ) মনে দাগ কাটলো। মনে মনে তিনি এ সংকল্প করলেন "যে কোন ভাবে হউক তা'লীকাত মুখস্থ করবো"। অবশেষে অল্প দিনের মধ্যে তা'লীকাত মুখস্থ করতে সক্ষম হন। তার তালিকাত কণ্ঠস্থ করতে তিন বৎসর সময় লাগে।

নিযামিয়ায় ভর্তি ঃ

গাযালীর (রঃ) জ্ঞান পিপাসা এতই প্রবল হয়ে উঠলো যে, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ না করে তিনি কিছুতেই স্থির থাকতে পারলেন না। ঐতিহাসিক ইবনে খালিকানের মতে, তিনি খোরাসানের অন্তর্গত নিশাপুরে অবস্থিত ইসলাম জগতের প্রথম শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা নিযামিয়ায় ভর্তি হন। সেকালে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম রূপে স্বীকৃত আবুল মা'য়ালী আল-জুওয়ায়নী ছিলেন নিযামিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, যিনি ইমামুল হারামায়ান হিসাবে পরিচিতি ছিলেন। গোটা মুসলিম বিশ্বের সুলতানগণ

Dhaka University Institutional Repository

জটিল বিষয়ের মীমাংসার জন্য তার নিকট উপস্থিত হতেন এবং তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গৃহীত হতো। ইমাম গাযালী (রঃ) উপযুক্ত শিক্ষক পেয়ে তার জ্ঞান পিপাসা মিটাতে লাগলেন। তার শিক্ষকগণ তাঁকে দর্শন শাস্ত্র, আইন শাস্ত্র ও বিবিধ জ্ঞান শিক্ষা দিতে লাগলেন। ইতিমধ্যে ৪৭৮ হিঃ মুতাবেক ১০৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর শিক্ষক ইমামুল হারামাযান মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ছাত্রগণের নিকট এত প্রিয় ছিলেন যে, তাঁরা তার ইন্তিকালে প্রায় উন্মাদ হয়ে পড়ে। কেউ বা শিশুর ন্যায় বহুদিন যাবৎ গড়াগড়ি দিয়ে ক্রন্দন করতে থাকেন। ছাত্রগণ প্রায় এক বৎসরকাল উস্তাদের শোকে মুহ্যমান হয়ে থাকেন। গাযালী (রঃ) ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাগদাদে চলে গেলেন। এ সময় তার বয়স ছিল ২৮ বৎসর।

বাই'য়াত গ্রহণ ঃ

গাযালীর (রঃ) পিতা বাল্যকালে তাদের নির্দেশ দেন যে,ধার্মিক সূফী ব্যক্তিদের যেন সম্মান প্রদর্শন করে। এতে কোন প্রকার ভুল করা যেন না হয়। এ কারণে গাযালী (রঃ) সূফীবাদের প্রতি দুর্বল ছিলেন। তাই তিনি তৎকালীন প্রখ্যাত পীর হযরত শায়েখ আবু আলী আল ফারমেদীর (রঃ) স্বহস্তে বাই'য়াত গ্রহণ করেন। He is a pupil of al-Ghazalis own uncle[16]. আল ফারমেদী (রঃ) ছিলেন গাযালী (রঃ) আপন চাচার ছাত্র। আলফারমেদী (রঃ) সর্বপ্রথম তাকে সুফীবাদ সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করেন। গাযালী (রঃ) তার নিকট গিয়ে বুঝতে পারলেন যে, কেবল কিতাব পাঠে আল্লাহর জ্ঞানের জন্য যথেষ্ঠ নয়। এর জন্য দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন জীবন্ত উস্তাদের নিতান্ত প্রয়োজন। পরিশেষে তিনি সূফীবাদের দিকে মনোনিবেশ করেন। নিছক বুদ্ধিবৃত্তি তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে। এছাড়া ও বিভিন্ন সূফীদের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন। সূফীদের সংস্পর্শে এসে নির্জন বাসের দিকে তার মন ধাবিত হয়।

---

[16] . মাওলানা মুহাম্মদ সাখাওয়াত উল্যাহ ঃ হায়াতে ইমাম গাযালী (রঃ) তাবলীগী কুতুবখানা ঃ ৬০ কে সার্কুলার রোড, চকবাজার, ঢাকা-১১।

Dhaka University Institutional Repository

রাজদরবারে গাযালীর আগমন ঃ

ইমাম গাযালীর (রঃ) জ্ঞান ও গুণগরিমার কথা পূর্ব হতেই দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল এবং নিযামুল মূলক এ সংবাদ ভালভাবে রাখতেন। তাই তিনি যখন নিযামুল মুলকের দরবারে পৌঁছলেন তখন তিনি তাঁকে যথেষ্ঠ সম্মানের সাথে অভিনন্দন জানালেন। সেসময়ে জ্ঞানের মাপকাটি ছিল তর্কযুদ্ধ। সময়-সময় আমীরদের দরবারে আলেম-ওলামাদের তর্ক-যুদ্ধের আসন বসতো। যিনি তর্কযুদ্ধে প্রতি পক্ষকে ঘায়েল করতে পারবেন, তাকে বিজয় মাল্য দিয়ে শাহী দরবার হতে সম্মানিত করা হতো। এ তর্কযুদ্ধ এমনই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে প্রায়ই বড় বড় শহরে বিশেষ আগ্রহের সাথে এসব সভা সমিতিতে যোগদান করতো। পরিণামে এ সমস্ত তর্ক যুদ্ধের অনুষ্ঠান একটি প্রচলিত নিয়ম হয়ে দাঁড়ালো।

গাযালী (রঃ) নিযামুল মুলকের দরবারে পৌঁছলে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এই জাতীয় একটি তর্ক-যুদ্ধের মজলিসের ব্যবস্থা করেন। পর পর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি তর্ক যুদ্ধ হলো। গাযালী (রঃ) প্রত্যেকটি বাকযুদ্ধেই বিশেষ দক্ষতার সাথে বিজয় লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে গাযালীর খ্যাতি চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়লো এবং সকলে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো।[১৭] ইতিমধ্যে রাজদরবারে গাযালী (রঃ) "আইনজ্ঞ আলিম্ন" হিসাবে অমাত্য পদ গ্রহণ করেন[১৮]।

সন্তান-সন্ততি ঃ

ইমাম গাযালী (রঃ) কোন পুত্র সন্তান রেখে যান নি। তবে তাঁর কতিপয় কন্যা সন্তান ছিল। তন্মধ্যে এক কন্যার নাম ছিল বিনতুল মুনা। বেশ কয়েক পুরুষ পর্যন্তই তার বংশ ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। সাতশতদশ হিজরীতে শায়খ মাজউদ্দীন (রঃ) নামক যে খ্যাতনামা ব্যক্তি

---

[17] ইসলামী বিশ্বকোষ ইঃ ফাউন্ডেশন ১০ম খ ৩৬০ পৃ.

Dhaka University Institutional Repository

জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি বিনতুল মুনার বংশ ধরের ৫ম অধস্তন পুরুষ ছিলেন[১৯]।

শিষ্যবৃন্দ ঃ

ইমাম গাযালীর (রঃ) শিষ্য সংখ্যা ছিল অগণিত। তাঁর প্রত্যেক আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-শিষ্য সংখ্যা কম পক্ষে ১৫০ জন ছিল। তিনি নিজেই একখানা চিঠিতে তার এক হাজার শিষ্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি অতি খ্যাতনামা এবং উল্লেখযোগ্য ছিল।

মুহাম্মাদ ইবনে তুমরান যিনি স্পেনের তাশেকীন বংশের শাসন বিলুপ্ত করতঃ এক বিরাট হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গাযালীর (রঃ) অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তাছাড়া উনদুলুসের প্রখ্যাত উলামাগণের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি আবূ বকর আরবী ও গাযালী (রঃ) এর শিষ্য ছিল।[২০]

গাযালীর (রঃ) ক'জন শিক্ষক ঃ

গাযালী বিভিন্ন বিষয়ের উপর অসংখ্য শিক্ষকমণ্ডলীর মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে। এখানে তাঁর ক'জন বিশিষ্ট শিক্ষকের নাম উল্লেখ করা হলোঃ

১। আবূ হামিদ আশকারাসেনী (রঃ)

২। আবূ মুহাম্মাদ সোবায়নী।

৩। আল্লামা আমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ বায়কানি।

৪। হাফিজ ওমর ইব্‌ন আবিল হাসান।

৫। পীর আবূ আলী আল ফারমেদী।

---

[18]. অনুবাদক হাঃ মাও আবদুল জলিল ঃ মেশকাতুল আনোয়ার ঃ বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ ঢাকা।

[19]. মুহা সাখাওয়াত উল্যাহ, হায়াতে ইমাম গাযালী (রঃ) (ঢাকা ঃ তাবলীগ কুতুব খানা ১৯৯৩) পৃ.২৫।

[20]. হায়াতে ইমাম গাযালী (রঃ) প্রাগুক্ত ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

৬। আবূ হামিদ ইউসুফ আল-নাস সাজ[২১]।

৭। ইমামুল হারামায়ান।

তার অতি প্রিয় শিক্ষক ঃ

ইমামুল হারামায়ান ছিলেন নিযামিয়া মাদ্রাসার প্রথম অধ্যক্ষ। ইমাম গাযালীর (রঃ) শিক্ষক ছিলেন। তার নাম আবুল মা'য়ালী আল জুওয়ায়নী। কেউ কেউ বলেন আবদুল মালেক।[২২] তার উপাধী ছিল যিয়াউদ্দীন ইমামুল হারামায়ান। ইমামুল হারামায়ান বলার কারণ He was Iman of the Two Sanctuaries, because he taught for several years at Mecca and Medina[২৩]। তার পিতার নিকট তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি নিশাপুরের বায়হাকিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তখন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন আবুল কাসেম আসকাফী। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি বাগদাদের উদ্দেশ্যে গমন করেন। বাগদাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে নিশাপুরে শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন। কিন্তু প্রধান উযীর আমীদ কান্দারীর ইঙ্গিতে আলোপ-আর-সালান সালজুকী এক ফরমান জারী করেন যে, অতঃপর প্রত্যেক মসজিদে জুম'য়ার খুতবায় ইমাম আবুল হাসান আশয়া'রীর উপর যেন অভিশাপ বর্ষণ করা হয়। এদিকে ইমামুল হারামায়ান ছিলেন আশয়া'রী সম্প্রদায়ভূক্ত। কাজে একাজে তিনি মনঃক্ষুন্ন হন। অতঃপর তিনি নিশাপুর ত্যাগ করে মক্কা ও মদিনা শরীফে চলে যান।

তার জ্ঞানের গভীরতা এবং বিচক্ষনার দরুন এখানে তিনি যথেষ্ঠ সম্মান অর্জন করেন। এদিকে খলিফা মালেক শাহ প্রধান মন্ত্রী আমীদ কান্দারীকে মন্ত্রীত্ব হতে পদচ্যুত করায়ে নিযামুল মূলক কে কেন্দ্রীয় প্রদান করেন। অল্প দিনের মধ্যেই নিযামূল মূলকের আদর্শ-চরিত্র, ন্যায়-

---

[21] আবদুল মাওদূদ মুসলিম মনীষ্য, (ঢাকা : ইফা, ১৯৯৯০) পৃ. ১২৩।

[22] মুহাম্মদ ফজলুর রহমান আশরাফী, *বিশ্বের মুসলিম মনীষীদের কথা*, (ঢাকা : আর, আই, এস পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭), পৃ. ১৬।

[23] A Leterary History of Arabs, Abid. P. 339.

Dhaka University Institutional Repository

পরায়নতা এবং সত্য নিষ্ঠার খ্যাতি দেশময় ছড়াইয়া পড়ে। এ খবর ইমামুল হারামায়ানের পৌছলে তিনি স্বদেশ নিশাপুরে চলে আসেন। জ্ঞান প্রিয় মন্ত্রী নিযামুল মূলক আল্লামা ইমামুল হারামায়ানকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেন। অতঃপর তার অধ্যাপনার জন্য এক বিরাট মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মন্ত্রীর নামানুসারে উক্ত মাদ্রাসার নাম রাখা হয় নিযামিয়া মাদ্রাসা। এ মাদ্রাসার প্রধান অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্তি পান ইমামুল হারামায়ান।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ কর্মজীবন

কর্মজীবনে পদার্পন ঃ

নিযামিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন ইমামুল হারামায়ান আল-জুওয়ানী। ইমামুল হারামায়ান (রহঃ) ৪৭৮ হিঃ সনে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের ফলে প্রধানমন্ত্রী ভীষন চিন্তায় পড়ে যান। কাকে অত্র পদে নিয়োগ প্রদান করা যায়। অবশেষে গাযালীর (রঃ) প্রজ্ঞা ও দক্ষতার প্রতি মুগ্ধ হয়ে অধ্যক্ষ পদের জন্য তাকে মনে মনে ঠিক করলেন। প্রধানমন্ত্রী সরাসরি তাকে অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি এতে রাজী হন। অতঃপর ৪৮৫ হিজরী মুতাবেক ১০৯২ সালে ৩৪ বৎসর বয়সে তিনি অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর সুগভীর জ্ঞান-পান্ডিত্ব ও বিচক্ষণতার গুনে তিনি বাগদাদ হুকূমতের প্রধান উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্বে অভিষিক্ত হলেন। ক্রমান্বয়ে তাঁর দায়িত্ব ও প্রভাব প্রতিপত্তি এত অধিক বৃদ্ধি পেল যে, শাসন সংক্রান্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই তার মতামত ব্যতিরেকে নির্ধারিত হতো না।

শিক্ষামূলক ব্যাপারে তার মর্যাদা হলো, তার শিক্ষাদান কেন্দ্রে ৩০০ শত (তিনশত) অধ্যাপক। একশত উমারা বা নেতৃবর্গ উপস্থিত থাকতেন। শিক্ষাদান ছাড়াও তিনি বিভিন্ন স্থানে সভা-সমাবেশে বক্তৃতা করতেন। তার বক্তৃতাগুলো ছিল নসীহত ও উপদেশমূলক। মাঝে মাঝে রাজদরবারে ও আমির-উমারাহদেব উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতেন। বাস্তব ও সত্য কথা বলতে তিনি মোটেই কুণ্ঠা বোধ করতেন না।

অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি প্রচুর গবেষণা করেন। বেশ কিছু কিতাব এ সময় লিখেন। ফিকহ্ শাস্ত্রের উপর প্রচুর পরিমানে পুস্তক প্রণয়ান করেন। তালীমীদের বিরুদ্ধে বিতর্কমুলক কয়েকখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ধর্মীয় ও বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে তিনি

Dhaka University Institutional Repository

কঠোর পরিশ্রম করেন। এতে বুঝা যায় তিনি প্রতিটি মুহূর্তে কাজে লাগান। অধ্যক্ষ পদে তিনি ৪৮৮ হিঃ মুতাবিক ১০৯৫ খ্রী পর্যন্ত বহাল ছিলেন। ১০৯৫ সালে রাজার হতে যুলকাদা মাস পর্যন্ত তিনি আল্লাহর ভয়-জনিত মানসিক পরিবর্তনের তীব্র বেদনা অনুভব করেন। অবশেষে পার্থিব উচ্চাকাংখা পরিত্যাগ করেন। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে অজানা পথে রওয়ানা হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। স্মরণীয় তিনি নিযামুল মূলকের নির্দেশ ক্রমে ৪৮৮ হিঃ সনে অধ্যক্ষ পদে ইস্তফা দিয়ে মন্ত্রী সভায় যোগাদান করেন।[২৪] তবে মন্ত্রীদের সময়কাল ছিল স্বল্প।

কর্মজীবন থেকে অব্যহতি গ্রহণ ঃ

প্রভূত যশ যোগ্যতার সহিত ইমাম গাযালী (রঃ) চার বৎসরকাল মাদ্রাসা নিযামিয়াতে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অল্প কিছুদিন মন্ত্রীত্ব পদ ও গ্রহণ করেন। অধ্যক্ষ থাকা অবস্থায় তিনি নানা জটিল বিষয়াদির চমৎকার ব্যাখ্যা প্রদান করেন। যার কারণে ছাত্রগণ তাঁর জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করে একেবারে বিস্মিত হয়ে পড়ে। এখানে অবস্থান কালে তিনি দর্শন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। তথাপি তাঁর মন পরিতৃপ্ত হলো না। অজানাকে জানবার এবং আখোকে দেখবার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। যাবতীয় কর্মের প্রতি তার মন বিতৃষ্ণা হয়ে উঠলো। তিনি বুঝলেন যে, কেবল পুঁথিগত জ্ঞান দ্বারা বিশেষ কোন কাজ হয় না। বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে একাগ্র সাধনা আবশ্যক। এ সম্পর্কে তিনি স্বয়ং বলেন ঃ "মানুষের সদ্‌গুনরাজির বিকাশের জন্য অক্লান্ত সাধনা ও একনিষ্ঠ সংযম একান্ত আবশ্যক।"

এ উপলব্ধির পর স্বীয় স্বভাব ও কর্মের প্রতি মনোনিবেশ পূর্বক দেখলাম, আমার কোন কাজই এ নীতির অনুরূপ নয়ে। যা দ্বারা আমার স্বভাব, আত্মা ও মানবতার উন্নতি সাধন হতে পারে। আমি আরও

---

[২৪]. ইমাম গাযালী, মেশফাতুল আনওয়ার (ঢাকা ঃ তাজ কোম্পানী লিঃ ১৯৯৪) পৃ-৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

বুঝতে পারলাম যে, আমি প্রকৃতির বশীভূত হয়ে কার্য করতেছি এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আমার কাজই হচ্ছে না। তবে আল্লাহর সন্তোষ-লাভের নিমিত্ত লোকালয়ে অবস্থান করেই দুনিয়ার সকল মোহ বর্জন করতে হবে। এরূপ চিন্তা করতে করতে যাবতীয় কর্মের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা বৈরাগ্যভাব জাগ্রতি লাগলো। মাদ্রাসার অধ্যাপনা এবং পরিচালনার কার্যেও শৈথিল্য দেখা দিল। ঔষধেও অশ্রদ্ধা জাগ্রলি। চিকিৎসকগণ বললেন, "এমতাবস্থায় কোন ঔষধই ফলপ্রদ হবে না" অনন্তর দেশ-ভ্রমনে বাহির হওয়ার মনস্থ করলাম। দেশের আলিম-উলামা, আমীর-উমরাহ, সুধীমণ্ডলী এবং রাজ পুরুষগণ এ সংকল্প পরিত্যাগে আমাকে অনুরোধ করতে লাগলেন। কিন্তু আমি মনকে বশে আনতে পারলাম না। পরিশেষে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে হিজরী ৪৮৮ সনের যিলকাদাহ মাসে আমি গোপনে সিরিয়ার অভিমুখে রওয়ানা হলাম।

জাগতিক জ্ঞান তার মনের তীব্র পিপাসা নির্বাপিত করতে পারে নেই। তাই তিনি এবার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অন্বেষণে বের হয়ে পড়লেন শৈশব কাল হতেই তার ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও জ্ঞান পিপাসা ছিল অত্যন্ত প্রবল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল দার্শনিকদের মতবাদ গভীর মনোনিবেশ সহকারে তিনি অধ্যয়ন করেন। কিন্তু তাতে তার মনের জিজ্ঞাসার কোন সঠিক জবাব তিনি খুঁজে পেলেন না। তাই এক অজ্ঞাত রহস্যের সন্ধানে সংসার বিরাগী সূফী দরবেশ বেশে জীবনের দীর্ঘ দশটি বৎসর নানা দেশ পর্যটনে তিনি অতিবাহিত করেন। এ পথেই তিনি তার চির আকাংখিত রহস্যের সন্ধান খুঁজে পান। তার মন চির রহস্যময় আল্লাহর স্বরূপ উদঘাটনে সমর্থ হয় এবং তার অন্তরের পিপাসা নিবারিত হয়। তিনি কিছুকাল সিরিয়ার পথে দামেশক নগরে অবস্থিত উমায়া জামে মসজিদে অবস্থান করেন। তৎকালে এ মসজিদের পার্শ্বে একটি বিরাট মাদ্রাসা ছিল। গাযালী (রঃ) এ মসজিদের পশ্চিম প্রান্তস্থিত মিনরারের এক প্রকোষ্ঠে স্বীয় বাস স্থান নির্ধারণ করেন এবং অধিকাংশ

Dhaka University Institutional Repository

সময়ই তাতে মোরাকাবা মুশাহাদায় নিমগ্ন থাকেন। অবসর সময় তিনি কিছু সংখ্যক অতি আগ্রহী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দান করাতেন এবং সময় সময় আলিমগনের সাহিত জটিল বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা করতেন।

দামেস্কে ও জেরুজালেম গমন ঃ

মোরাকাবা-মাশাহাদার মাধ্যমে তিনি দামেস্কে দুই বৎসর কাটান। যখন ইবাদতে পরিশ্রান্ত হয়ে যেতো তখনই দামেস্কের বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কোণে ছাত্রদেরকে কিছু কিছু শিক্ষা দিতেন। গাযালীর (রঃ) ২৭ বৎসর বয়সের সময় তিনি প্রসিদ্ধ পীর শেখ আবূ আলী ফারমেদীর হাতে বাইয়াত গ্রহণ পূর্ব তার মুরিদ হয়েছিলেন। তিনি উচুঁ মানের পীরে কামেল ছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নিযামুল মূলক ও তাঁর মুরিদ ছিলেন।

দুই বৎসর দামেস্ক নগরে অবস্থানের পর জেরুজালেম গমন করেন। এর কারণ স্বরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা স্বীয় রুম থেকে বের হয়ে মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসায় গমন করেন এবং এর প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কোন বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। আলোচনা কালে শিক্ষক বলেনঃ গাযালী (রঃ) এসম্বন্ধে এরূপ লিখেছেন-তিনি যে গাযালী (রঃ) তা জানতেন না। গাযালী (রঃ) স্বীয় মনে কোন অহংকার সৃষ্টি হতে পারে ভেবে তিনি তৎক্ষণিক ভাবে সংগোপনে জেরুজালেম চলে যান। অতঃপর বায়তুল মোকাদ্দাম জিয়ারত করেন। তথায় তিনি সাখরাতুস সাম্মা নামক বিখ্যাত প্রস্তরের নিকটবর্তী এক নির্জন প্রকোষ্ঠে অবস্থান করে থাকতেন। এখানে আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে গবেষণা করতেন। গবেষণা করতেন।

অনুবাদ ঃ যারা আল্লাহকে দাড়ানো, শোয়া ও বসা অবস্থায় স্মরণ করে এবং জমিন সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে গবেষণা করে, আর (বলে উঠে)

Dhaka University Institutional Repository

হে আমাদের প্রভূ! ইহা অনর্থক সৃষ্টি করনি, হে আমাদের প্রভূ! আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে বাঁচান।[২৫]

মাকামে খলিলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ঃ

বায়তুল মুকাদ্দাস যিয়ারত করে "মাকামে খলিল"[২৬] নামক স্থানে হযরত ইব্রাহিমের (আঃ) মাযার শরীফ ৪৯৯ হিজরী সনে যিয়ারতে গমন করেন। সেখানে তিনি তিনটি প্রতিজ্ঞা করেন।

১। কখন ও কোন রাজা, বাদশাহর দরবারে গমন করবনা।
২। কোন বাদশাহ বা আমির উমারার হাদিয়া গ্রহণ করব না।
৩। কারো সাথে কোন বিষয়ে তর্ক-বাহাছে অবতীর্ণ হব না।

বস্তুত ঃ এর পর থেকে আমরণ তিনি এ সপথ বা প্রতিজ্ঞা পালন করে গিয়েছেন। এ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার পর নিযামুল মুলকের পুত্র আহমাদ তাকে পুনরায় অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলে তিনি তা প্রত্যাখান করেন। তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত হলে অবশ্যই সরকারী ভাতা এবং বিভিন্ন সময় হাদীয়া গ্রহণ করতে হবে। তাই এ পদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকলেন।

মদীনা ও মক্কা শরীফে গমন ঃ

গাযালী (রঃ) বায়তুল মুকাদ্দাস যিয়ারত করে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। মদীনা শরীফ এসে রাসূল (সঃ) এর রাওজা মুবারক সিয়ারত করেন। মদিনা থাকাকালীন অবস্থা মুনাজাতের মাধ্যমে রাসূল (সঃ) এর নিকট ঐ সকল লোকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। যাঁরা

---

[25] আল কুরআন, সুরা বাকারাহ।
[26] খলীল শব্দটি বর্তমান হাশেমী রাষ্ট্র জর্দানের একটি শহর বায়তুল মুকাদ্দাস হতে প্রায় ১৫ (পনর) মাইল দূরে অবস্থিত। এ জায়গায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দাফন গাহ, সংগ্রহে ইসলামী ফাউন্ডেশন পত্রিকা (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

তার গ্রন্থাবলীর মিথ্যা সমালোচনা করেছে। তিনি রাসূল (সঃ) এর মাযারের পাশে কিছু কাল অপেক্ষা করেন।

মদীনা শরীফ যিয়ারত করে মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে গমন করেন। মক্কা শরীফে এসে তিনি হজ্ব উদযাপন করেন। অতঃপর দীর্ঘকাল এখানে অবস্থান করেন। মক্কা ও মদীনায় অবস্থানের সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু আলিম ও বুযুর্গের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা করেন। তৎপর সেখান হতে তিনি বিশ্ববিখ্যাত আলেকজান্দ্রিয়া এবং মিশর পরিদর্শনে গমন করেন। সেখানে তিনি অনেকদিন অবস্থান করে মরক্কোর ইউসূফ বিন তাশকীনের সহিত সাক্ষাতের নিয়ৎ করেন। ইউসূফ বিন তাশকীনের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর মরক্কোর সফর বাতিল করে দেন। তার মৃত্যুতে তিনি খুব ব্যথিত হন। আলো কজান্দ্রিয়া থেকে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ফিরবার পথে আবার পবিত্র মক্কা মদীনা যিয়ারত করেন।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মস্থান যিয়ারত ঃ

গাযালী (রঃ) বায়তুল মুকাদ্দাস অবস্থানকালে একদিন হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্মস্থান যিয়ারত করেন। এসময় তার সঙ্গে কয়েকজন ধর্মপ্রাণ লোকও ছিলেন। তথায় তিনি দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে ভাবাবেগে কতগুলি কবিতা আবৃত্তি করেন।

সংসার ত্যাগ ও অধ্যক্ষ পদ থেকে অব্যহতির কারণ ঃ

গাযালী (রঃ) অন্তরে হঠাৎ করে পরকালের চিন্তা এসে পড়লো। তিনি দুনিয়ার সকল প্রকার চিন্তা, আশা, ভরসা ত্যাগ করার সিদ্ধান্তে উপনীত হন। নিজ সম্পর্কে তিনি বলেন, "১০৯৬ খৃষ্টাব্দে রজব থেকে ছ'মাস পর্যন্ত এক দিকে পার্থিব ক্ষুধা ও অন্যদিকে ধর্মীয় প্রেমের দ্বিবিধ শক্তির কবলে নিস্পৃষ্ট হয়েছি। তারপর আত্মসমর্পন। নিজকে ছেড়ে দিই ভাগ্যের হাতে। খোদার কৃপাতে আমার জিভে কিছু অসুখের সৃষ্টি হলে

Dhaka University Institutional Repository

এবং ক্লাশে বক্তৃতা দানে বাধা পড়ল। আমার ছাত্রদের কল্যাণের কথা চিন্তা করে বৃথাই শিক্ষকতার কাজ অব্যাহত রাখার বাসনা হয়, কিন্তু আমার বাকশক্তি রহিত। নীরবতার এই নিদারুন শাস্তি যেমন আমাকে ঠেলে দিল ভয়ানক এক নৈরাজ্যের রাজ্যে। উদরেও দৌর্বল্য এসেছে। কোন কিছুতে ক্ষুধা নেই। না পারি এক মুঠো গিলতে, না এক ফোঁটা পানি পান করতে।

শারীরিক দৌর্বল্য এমন চরমে এল যে, চিকিৎসকগণ আমাকে বাঁচানোর আশা ত্যাগ করে বললেন 'আসল ব্যাধি আপনার হৃদয়ে'। সেটাই পরিব্যাপ্ত হয়েছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এই নিদারুন হতাশা রোধ করতে না পারলে নিরাময়ের আশা নেই।

শেষে আমার দুর্বল শরীর ও নিস্তেজ আত্মার কথা স্মরণ করে, জীবনের প্রান্তসীমায় সকল কিছু হারিয়ে মানুষ যেমন শরণাপন্ন হয়, আমি তাই হলাম। 'অসহায়েরা যখন কাঁদে, তখন তিনি তা'শ্রবন করেন; (কুরআন-২৭-৬৩)। কুরআনের এ কথা মনে করে বুঝলাম আমার ক্রন্দন ও তাঁর কাঁধে পৌঁছবে। সম্মান অর্থ এবং পরিবার পরিজনকে ত্যাগ করার বেদনা খোদাই যেন লঘু করে দিলেন। আমি খোলাখুলি জানিয়ে দিলাম যে, আমি মক্কায় যাচ্ছি হজ্ব করতে। অথচ গোপানে স্থির করেছি সিরিয়া যাব, গোপনে এ জন্য যে, আমি যেখানে বসবাস করতে চাই। সেটা যেন খলিফা এবং আমার বন্ধু বান্ধবরা টের না পান। আমার অবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে দেখি আমি নিজেই চার পাশ থেকে জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, আমি যেন একটি অতল গর্ভগহবরের কিনারায় আর আমি যেন জাহান্নামের দিকে ধাবিত হয়েছি।

অবশেষে সকল প্রকার সম্মান, ধন-সম্পদ ছেড়ে বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। বাগদাদে অবস্থান কালে দুই বৎসর নির্জনে কঠোর আরাধনা ও সাধনায় নিয়োজিত ছিলাম। সেখান থেকে আমি

Dhaka University Institutional Repository

বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা হই। প্রত্যেক দিন পবিত্র "মসজিদে সাখরায়' প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে পড়ে থাকতাম। অতঃপর সকালে ইব্রাহিম যিয়ারত করি। এভাবে ১১ বৎসর পুরা নির্জন বসবাস করি। আমার এ কাজটি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ছিল[২৭]।" উল্লেখিত আলোচনার দ্বারা বুঝা যায়, বিশ্ববিখ্যাত নিযামিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদটি অতি মর্যদাপূর্ণ। আর এ পদ থেকে অব্যহতিদান নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া কিছুই হতে পারে না। এ সুযোগে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হন। চরম ত্যাগ তিতীক্ষা ব্যতিত আল্লাহর তাআলার সান্নিধ্য লাভ করা যায় না।

একটি ঘটনা ঃ

নির্জন বাসের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি দৃষ্টান্ত এখানে পেশ করা হলো, "সুলতান ইবরাহীম ইবন আদহাম ছিলেন বলখের রাজা। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাজত্ব ত্যাগ করে দশ বৎসর নির্জন বাসের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ইবাদতে মশগুল ছিলেন। ইবরাহীম ইবন আদহাম রাত্রে অট্টালিকায় শয়ন করতে ছিলেন। হঠাৎ পায়ের শব্দ অনুভব হল। ঘাবড়াইয়া গেলেন যে, রাত্রিকালে শাহী অট্টালিকার উপর কোন লোকেরা এমন দুঃশাহস করতে পারে? জিজ্ঞাসা করলেন, হে আগন্তকগণ! আপনারা কারা ? (তারা ফিরিশতা ছিলেন) ফিরিশতাগণ উত্তর দিলেন, আমরা এখানে উট তালাশ করতেছি। বাদশাহ বললেন কি আশ্চার্য! শাহী অট্টালিকার উপর উট অন্বেষণ করা হচ্ছে। তারা উত্তর দিলেন। এর চেয়ে অধিক আশ্চার্য আমাদের আপনার উপর যে, এ আরাম আয়েশে, ভোগ-বিলাসে আল্লাহকে তালাশ করছেন[২৮]।" অতঃপর তিনি সাম্রাজ্য ত্যাগ করে নির্জনবাসে আত্মনিয়োগ করেন। যার দৃষ্টান্ত ইমাম গাযালীর (রঃ) সাথে মিলে।

---

[২৭] ইমাম গাযালী সত্যের সন্ধান, অনূদিত (ঢাকা ঃ হাফিজিয়া কুতুবখানা ১৯৯৭) পৃ-৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

নির্জন বাস ত্যাগ করার কারণ ঃ

"গাযালী (রঃ) নিজের সম্পর্কে বলেন। আমি যখন লক্ষ্য করলাম যে, মানুষের কালুবে (হৃদয়) রোগ আছে। আল্লাহ সম্বন্ধে অজ্ঞতা কালবের জন্য মারাত্মক রোগ। মানুষের অজ্ঞতার কারণে তারা রিসালতের প্রতি অবিশ্বাস করে। আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস করে বসে, পরকাল এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস হারায়ে বসে। আবার যখন দেখতে পারলাম, আলিম, দার্শনিক এ ধরনের কয়েক শ্রেণীর লোকের ঈমান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আজ নিজকে এ সমস্ত সমস্যা থেকে দূর করার যোগ্য বলে মনে করলাম, আর সূফীবাদ, দর্শন, তা'লীমী মতবাদ, প্রচলিত আচার ও আমাদের চালচলন ভালোভাবে আলোচনা করায় এদেরকে পরাজিত করা আমার পক্ষে খুবই সহজ বলে মনে করলাম, তখন মনে হল যে, এখনই এ কাজ আরম্ভ করার সময়। মনেমনে বললাম, নির্জনবাস ও সংসার ত্যাগ তোমার কোন কাজে লাগবে? রোগ তো ছড়িয়ে পড়েছে। এমন কি খোদ হেকিমই রোগাক্রান্ত হয়েছে। হেকিম দ্বারা গাযালী (রঃ) নিজকে বুঝিয়েছেন।

লোক ধ্বংসের মুখে গিয়ে পড়েছে। এরপর আর কখন তুমি এ আঁধার দূর করতে সচেষ্ট হবে? জামান হয়েছে নবীহীন, আর কাল হয়েছে অন্যায়ের অসত্যের যদি তুমি তাদের অভ্যস্ত পথ থেকে সত্যের দিকে আহবান কর। তাহলে তারা সকলই তোমার সাথে দুশমনী করবে। তাদের দুশমনীর মাধ্যমে তোমাকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "মানুষ কি মনে করেছে যে, আমরা শুধু ঈমান এনেছি। একথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আমরা তাদের পূর্বগামীদের পরীক্ষা করেছি।"

---

[২৪] শাহ হাকিম মুহা আখতার, মা'আরেফে মাজনবী (ঢাকা খানকাহ আমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৭) পৃ-৭২-৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

তারপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে যিনি সৃষ্টির মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তি তাঁকে বলেছেন, "আপনার পূর্বের রাসুলদেরও মিথ্যে বলা হয়েছিল, তারা তাঁদের মিথ্যে বলার জন্য (মনক্ষুন্ন হলেও) ধৈর্যধারণ করেছিলে আর তাঁদের দুঃখ ও দেওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমাদের সাহায্য তাঁদের কাছে এসেছিল। আর আল্লাহর কালামকে পরিবর্তনকারী কেউ নেই। আপনার নকট তো রাসুলদের সংবাদ পৌছেছে।

অতঃপর আমি এ বিষয়ে একজন জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করলাম, তার ঈঙ্গিতে আমাকে নির্জনবাস ত্যাগ করে খানকাহ থেকে বের হবার বিষয় একমত হলেন। এরপর অনেক সৎ ব্যক্তির পুনঃ পুনঃ স্বপ্নও আমার এই কর্মপন্থার মঙ্গল এবং সঠিক জ্ঞান দান করেন। এই শতকের প্রারম্ভে যে মঙ্গল আল্লাহ তা'য়ালা নির্ধারিত করে রেখেছেন, তা-ও বুঝতে পারলাম। আল্লাহ তা'য়ালা প্রতি একশত বর্ষের প্রারম্ভে তার দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। কাজেই আমার আশা দৃঢ় হলো এসব সুলক্ষণ দেখে মনের ভরসা বর্ধিত হল, আল্লাহ তা'য়ালা এ উদ্দেশ্যে ৪৯৯ হিঃ সনে নির্জনবাস থেকে নিশাপুরের যাত্রা সহজ করে দিলেন।

অতঃপর ভ্রান্ত ও পথহারা জাতিকে পথ দেখানোর উদ্দেশ্যে তিনি নির্জনবাস ও সংসার ত্যাগ থেকে ফিরে আসেন। এ সময় মানবতার মুক্তির উদ্দেশ্যে তিনি ইহইয়ায়ুল উলুমিদ্দিন নামক গ্রন্থখানি রচনা করেন এ সময় তাকে অনেক পবিত্র আত্মা স্বপ্নে দেখালেন, যেন তিনি নির্জনবাস ত্যাগ করে মানুষের হিদায়াতের উদ্দেশ্যে বের হন"[১৯]।

পুনরায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান ঃ

নির্জনবাস থেকে ফিরে আসার পর তদানীন্তন সুলতান ফখরুল মূলকের অনুরোধে তিনি পুনরায় অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করতে রাজি হন।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর ৪৯৯ হিজরী সন মুতাবিক ১১০৫ খ্রীষ্টাব্দে নিযামিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করলেন। ৫০০ হিঃ মুতাবিক ১১০৬ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান ফখরুল মূলক গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হওয়ার কয়েকদিন পর তিনি ঐ পদ ত্যাগ করে পূনরায় তুশ শহরে চলে যান। অতঃপর নিজ গৃহের পাশে একটি মাদ্রাসা এবং একটি খানকাহ্ তৈরী করেন। মাদ্রাসায় তিনি একশত পঞ্চাশ জন ছাত্রকে পড়াতেন। বাকী সময় খানকাতে ইবাদতে মশগুল থাকতেন।

অধ্যক্ষ পদ পুনঃগ্রহণের অনুরোধ প্রত্যাখান ঃ

ইমাম গাযালী (রঃ) মাদ্রাসা নিযামিয়ার অধ্যক্ষ পদ দুই বার গ্রহণ করার পর পুনরায় তাকে পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলে তিনি তা প্রত্যাখান করেন। আমীর-উমারহ ও রাজপুরুষগণ নানা উপায়ে তাকে এর অধ্যক্ষ পদে পুনঃ অধিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতে থাকেন। সালজুকী সুলতান এবং খলিফার দরবার হতেও তাঁর নিকট পুনঃ পুনঃ অনুরোধ পত্র আসতে থাকে। কিন্তু তিনি নিম্নলিখিত কারণে তা গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

ক) তুসনগরে বর্তমানে আমার নিকট দেড়শত ছাত্র অধ্যায়নরত রয়েছে। আমি বাগদাদে চলে গেলে তাদের পক্ষে সেখানে যাওয়া দুঃসাধ্য হবে।

খ) পূর্বে আমার কোন সন্তান ছিল না। কিন্তু এখন আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি সন্তান দান করেছেন। তাদেরকে ছেড়ে বাগদাদে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

---

[২৯] সত্যের সন্ধান, প্রাগুক্ত, পৃ-১২।

Dhaka University Institutional Repository

গ) মাকামে খলিলে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, ভবিষ্যতে আর কোন প্রকার বিতর্কে প্রবৃত্ত হন না। কিন্তু বাগদাদে ইহা হতে অব্যাহতির উপায় নেই।

ঘ) খলিফার সম্মানার্থে তাঁর দরবারে উপস্থিত হতে হবে। আমার এটা বরদাশ্‌ত হবে না।

ঙ) রাজদরবার হতে কোন বেতন বা বৃত্তি গ্রহণ করব না। বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। বাগদাদে আমার কোন সম্পত্তি নেই। সুতরাং কিরূপে আমি বাগদাদে অবস্থান করব।

মোটকথা সর্বপ্রকার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি উক্ত অধ্যক্ষ পদ গ্রহণে আর সম্মত হননি। জীবনের অবশিষ্টাংশ তিনি তুস নগরে অতিবাহিত করেন।

ঈর্ষার কোপে গাযালী (রঃ) ঃ

নিযামিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদ পুনঃ গ্রহণের জন্য বাগদাদ অধিপতি গাযালী (রঃ) কে বারবার অনুরোধ করতে থাকেন। কিন্তু ইহাতে তিনি রাযী হন নাই। এই সুযোগে ঈর্ষাপরায়ন কতিপয় লোক তাঁর বিরুদ্ধে সুলতানকে উত্তেজিত করার প্রয়াস পান। বিশেষতঃ ইমাম গাযালী (রঃ) ইহইয়াউল উলুম গ্রন্থে হিংসুক উলামা ও রিয়াকার মাসায়েখদের সম্বন্ধে স্বীয় বক্তব্য যেভাবে পেশ করেছেন, এতে একটি দল তার বিরোধিতায় উঠে পড়ে লাগল এবং প্রকাশ্যভাবে তাকে অপমান করার জন্য বদ্ধ পরিকর হল। সে সময় বাগদাদের শাসনকর্তা ছিলেন সালজুক বংশীয় শাসক মালিক শাহের কনিষ্ঠ পুত্র সানজার। এ বংশীয় লোকজন ইমাম আবু হানিফার (রঃ) প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং নেক ধারনা পোষন করত। তিনি ছিলেন হানীফা মাযহাব অবলম্বী।

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধিদলের লোকেরা সুলতান সালজুকের নিকট গাযালী (রঃ) বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, 'মন্‌খুল' কিতাবে গাযালী (রঃ) ইমাম আবূ হানিফা (রঃ) কে তীব্রভাবে আক্রমন করেছেন। তাঁর সম্বন্ধে উল্টা-পাল্টা ব্যাখ্যা করে বুঝাতে চেষ্টা করল যে, গাযালী (রঃ) নিশ্চয় একজন নাস্তিক আকিদা সম্পন্ন লোক। সুলতান তেমন জ্ঞানীও আলিম ছিলেন না যে, নিজেই তিনি তাদের অভিযোগ সম্পর্কে কোন মীমাংসায় উপনীত হবেন। অতঃপর তিনি তাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে গাযালী (রঃ) কে রাজদরবারে উপস্থিত হবার জন্য নিদেশ প্রদান করেন। ওদিকে গাযালী (রঃ) মাকামে ইব্রাহীমে বসে শপথ গ্রহণ করেছিলেন যে, তিনি আর কখনও রাজদরবারে তাশরীফ নিবেন না। পক্ষান্তরে, বাদশাহর নির্দেশকে ও সম্মান দান করা কর্তব্য। তাই তিনি মাশহাদে রেজা নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে সেখান থেকে বাদশাহর সমীপে একখানা সুদীর্ঘ চিঠি লিখে পাঠালেন।

চিঠিতে অন্যান্য বক্তব্যের সাথে একথাও তিনি উল্লেখ করেন যে, আমি হযরত ইব্রাহীমের মাজার শরীফে বসে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, আমি আর কখন ও কোন রাজা বাদশাহ বা আমীর উমারার দরবারে গমন করব না। সুতরাং অনুরোধ এই যে, আমাকে ওয়াদা ভঙ্গের জন্য বাধ্য না করা হোক, চিঠিখানা পাঠ করার পর সুলতান গাযালী (রঃ) সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রবল হল এবং তিনি তার সভাষদগণকে বললেন, আমি তাঁর সাথে সামনা সামনি আলোচনা করে তার আকীদা ও ধারণা সম্পর্কে অবহিত হব।

সুলতান সানজারের এ সিদ্ধান্ত শুনার পর বিরোধী পক্ষ নাখোশ হল। তারা ভাবল, হয়ত সুলতান তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই তারা প্রচেষ্টা চালাল যাতে গাযালী (রঃ) সুলতানের দরবারে না আসতে পারে। এ উদ্দেশ্যে তারা শাহী দরবারের বাইরে একটি বিতর্ক

Dhaka University Institutional Repository

সভার আয়োজন করল। সুলতানকে তারা বুঝিয়ে চললো যে, এখানেই বাহাছ ও মুনাজিরার মাধ্যমে তাকে যাচ-পরতাল করে নেয়া যাবে।

ওদিকে এইরূপ বিতর্ক অনুষ্ঠানের সংবাদ ছড়িয়ে গেলে তুস নগর থেকে বহু সংখ্যক আলিম উপস্থিত হয়, এরা এসে দাবী করল আমরা গাযালীর (রঃ) ছাত্র। বিতর্কিত বিষয়সমূহ প্রথম আমাদেরই সম্মুখে পেশ করা হোক। আমরা সে বিষয়ে তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর মতামত ও সিদ্ধান্ত সমূহ বিবৃত করব অযথা গাযালী (রঃ) কে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। তারপর যদি এ ব্যাপারে আমরা অপারগ হয়ে পড়ি তাহলে তাঁকে বৈঠকে উপস্থিত করা যাবে। সুলতান দু'পক্ষের এ ধরণের কোন্দল থেকে উত্তম মনে করলেন যে, এই প্রকার বিতর্ক অনুষ্ঠানের চেয়ে বরং স্বয়ং গাযালী (রঃ) কে সম্মুখে ডেকে নিয়ে ফয়সালা করা হোক।

প্রধানমন্ত্রি সুলতানের নির্দেশ নিয়ে গাযালীর (রঃ) দরবারে পৌছলেন এবং অত্যন্ত বিনয় ও আদরের সাথে বাদশাহের দাওয়াতপত্র তার হাতে দিলেন। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে গাযালী (রঃ) প্রধান মন্ত্রির সাথে সুলতানের দরবারে উপস্থিত হলেন। সুলতান দন্ডায়মান হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁকে সিংহাসনে বয়ান। আবূ হানিফা (রঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেনঃ এটা সত্য নয়। তাঁর সম্বন্ধে আমার সে বিশ্বাস বলবৎ আছে, যা আমি ইহইয়াউল উলুম গ্রন্থে প্রকাশ করেছি। তাঁকে আমি ফিকাহ শাস্ত্রের যুগস্রষ্টা বলে স্বীকার করি।" এতে সুলতানের ধারণা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হল।

মৃত্যু বরণ ঃ

ইমাম গাযালী (রঃ) সোমবার জামাদাল উখরা ৫০৫ হিজরী মুতাবিক ১৯ ডিসেম্বর ১১১১ খৃীষ্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর ভাই আহমদ গাযালীর বর্ণিত বিবরণীর উপর ভিত্তি করে অধ্যাপক ডি. বি.

Dhaka University Institutional Repository

ম্যাকডোন্যাল্ড Jurnal of the American Orintal Society তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে গাযালীর (রঃ) মৃত্যু সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"সোমবার দিন আমার ভাই প্রত্যুষে অজু শেষ করে নামাজ আদায় করেন। তারপর বলেন, "আমার কাফনের কাপড় নিয়ে এসো। কাপড় আনতেই সেটি নিয়ে তিনি চুমু দিয়ে চোখের সামনে রাখলেন এবং তাঁকে বলতে শুনা গেল, আমি মালিকের কাছে যাবার আদেশ পেয়েছি। সে আদেশ আমি পালন করবো। এ বলে পাদু'টা ছড়িয়ে দিলেন সাধকের দর্শন মানসে। আল্লাহ করুনা লাভের সক্ষম হন তিনি[৩০]।

কবরস্থান ঃ

ইমাম গাযালীর (রঃ) সমাধী সম্পর্কে অনেক অমূলক কাহিনী প্রচলিত আছে। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ঈসা সিদ্দীক লিখিত 'আরাম গা-ই-গাযালী' (গাযালীর বিশ্রামস্থল) শীর্ষক গ্রন্থটি আমার হস্তগত হয়েছে। তিনি ঐ সমস্ত অমূলক কাহিনী নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন এবং ইউরোপীয় পর্যবেক্ষক ডঃ সুয়েমার ও মার্কিন প্রাচ্যবিদ প্রফেসর পোপ এর বরাতে এবং পূর্ববর্তীকালের প্রাচীন গ্রন্থাকার তাজুদ্দীন সুবকী ও পরবর্তীকালের আকায়ে আলী আসগর হিকমত এর গবেষণা সূত্রে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ইমাম গাযালীর (রঃ) সমাধি পুরাতন দালান 'হারুনিয়ার' পাশেই রয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, খলিফা হারুনের আমলে রাষ্ট্রদ্রোহীদের জন্য একটা কারাগার তৈরী করা হয়েছিল। ঐ কারাগারের নাম 'হারুনিয়া' হিসাবে পরিচিত।

আলী নদভী বলেন। "ইমাম গাযালী (রঃ) ও তার গ্রন্থাদির প্রতি আগ্রহ-আসক্তি আমাদেরকে যেন টেনে হেঁচড়ে তার সমাধিস্থল পর্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে গেল। অনুমিত হলো, যেন অতি সম্প্রতি একটি সমাধি। ঠিকঠাক রা হয়েছে। আমরা যে দালানে গিয়ে উঠলাম তার পাশেই ইমাম গাযালী (রঃ) সমাধি। কিন্তু তাতে এরূপ কোন নাম ফলক নেই যার দ্বারা কিছু বুঝা যেতে পারে। তবে ভিতরে একটি ফলক রয়েছে, যা খুব কষ্টে পড়া গেল[৩১]। নিম্নে লেখা হলো।

অর্থঃ ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই ধ্বংসশীল। একমাত্র আপনার মহিমায় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্ত ছাড়া[৩২]। অন্যমতে গাযালীর (রঃ) মাযার শরীফ ইরানের অমর করি ফিরদৌসীর কবরের পাশে[৩৩]।

মৃত্যু মুখে মুনাজাত ঃ (ফরিয়াদ)

ইমাম গাযালী (রঃ) কাফনের কাপড় খানা বের করে বলেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তুমিতো রহমান এবং রাহিম। হে আল্লাহ! একমাত্র তোমাকে পাবার জন্য আমি সকল প্রকার আরাম আয়েশ ত্যাগ করে ঘুরেছি বছরের পর বছর এবং প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তরে, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও[৩৪]।

---

[৩০] সত্যের সন্ধান, প্রাগুক্ত, পৃ-১২।
[৩১] সায়্যিদ আবুল হাসান নদভী, কাবুল থেকে আম্মান (ঢাকা ই. ফা. বা. ১৯৯৪) পৃ-৬৩।
[৩২] সত্যের সন্ধান, ঈমাম গাযালী কো অনুবাদক আনিস চৌধুরী পৃ-৪৩।
[৩৩] ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইসলামী বিশ্বকোষ ১০ খন্ড পৃ-৩৬০।
[৩৪] ফজলুর রহমান আশরাফী বিশ্বের মুসলিম মনীষীদের কথা (ঢাকা ঃ আর, আই এম পাবলিকেশন্স ১৯৯৭) পৃ-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গাযালীর রচিত গ্রন্থ

তিনি দিবারাত কলম চালিয়ে প্রায় চারশত গ্রন্থ রচনা করেন, গড়ে হিসাব করে দেখা যায় প্রতিদিন তিনি ১৬ (ষোল) পৃষ্ঠা করে রচনা করেন। নিম্নে তার রচনাবলীর বিবরণ দেয়া হলো।

কুরআনের তাফসীর

১। ইয়াকুতুতাবীল ফি তাফসীরল তানযিল।

২। সুরা ইউসুফের তাফসীর।

৩। জওয়াহিরুল কুরআন।

হাদীস শাস্ত্র

৪। কিতাবুল আরবাঈন ফি-উসুলিদ্দীন

ফিকাহ্ শাস্ত্র

৫। আল-ওয়াসীত।

৬। আল-ওয়াজীয।

৭। খুলাসাত আল মুখতাস্সার ফি ফেকহ আশ্-শা'ফে'য়ী।

৮। বাহরুল 'উলুম আল মানযান ফি মাজহাবে আল ঈমাম আল আ'জম।

৯। আলওয়াসীত আল মুহীত বি-এখতারিল বাসীত।

১০। গাইয়াতুল গাওর ফি মাসাযেলে আদ্দাউর।

১১। আল ফারায়েজ আল-ওয়াসীত।

১২। সা'ইল।

১৩। মজমুআতু আল ফাত্ওয়া।

১৪। গায়াতু আল গাওর।

১৫। তা'লীকাতুন ফী-ফরুইল মাযহাব।

১৬। বয়ানুল কাওলায়ান লি আল শাফে'য়ী।

ফিকাহ্ শাস্ত্রের মূলনীতি

Dhaka University Institutional Repository

১৭। কিতাবুল মুসতাশফা মিন ই'লমে আল-উসুল।

১৮। শিফায়ুল ই'লম ফিল কিয়াস ওয়াত্তালিল।

১৯। কিতাবুল মানখুলফিল উসুল।

২০। হাকিকাতু আল কাওলাইন।

২১। তাহসিনুল মাখান।

২২। মুনতাখাল ফি ই'লম আল জিদাল।

২৩। মাখায়ে কি আল-খেলাফিয়াত।

২৪। মুফাস-সালুল খিলাফ-ফী উসুল আল কিয়াম।

মানতিক (তর্ক শাস্ত্র)

২৫। আল সাকসাদ আল আক্সা।

২৬। 'মিয়ার আল উলুম ফি ফান্‌র্লিল মানতেক।

২৭। মাহিক্কু আরনজর ফি মানতিক।

২৮। মিযানুল আ'মল।

২৯। মিয়াতুল ই'লম্।

ইলমে কালাম (ধর্মীয় বিজ্ঞান)

৩০। আল কাওয়া'য়েদ আল্ আ'কায়েদ।

৩১। আল ইকতেসাদ ফিল এ'তেকাদ।

৩২। আর রিসালাত আল্ কুদসিয়্যাহ।

৩৩। আল্ মাকসাদুল এসনায়ু ফি আসমায়িল্লাহ তায়ালা।

৩৪। আল্ এলজামুল কাওয়াম আল্ এ'লমিল কালাম।

৩৫। মুনকিস।

৩৬। ইলযামুল আওয়াম।

৩৭। মুসতাযহারী।

৩৮। ফাযাইহুল এবাহিয়্যাহ।

৩৯। হাকিকাতুর রুহ।

৪০। কিস্তামুল মুস্তাকিম।

৪১। কাওলুন জমীল ফীরাদ্দিল আ'লা মান গাইর‍্যাল ইঞ্জিল।

৪২। মাওয়াহিবুল বাতিনিয়্যাহ।

Dhaka University Institutional Repository

৪৩। তাফাররাকাতু বায়নাল ইসলাম ওয়াল সিন্দিকাহ।

৪৪। মুকাশিফাতুল কুলুব।

৪৫। আত্তিবরুল মাসবুক।

৪৬। সেররুল আ'লামিনা ওয়া কাশপু মা ফিদ্দারাইন।

৪৭। আত্-তাহবির ফি এলমিত-তা'বির।

৪৮। রিসালাতু মালা বুদ্দা মিনহু।

আরবী গদ্য ঃ

৪৯। কাসিদায়ে গাযালী।

বিজ্ঞান ধর্মীয় সাহিত্য ঃ

৫০। নাযরান ফিল কুরআন।

অন্যান্য বিষয়ের উপর আরো গ্রন্থ ঃ

৫১। এমলাউ আলা মুশকিলিল এহইয়্যা।

৫২। আসমাউল হুসনা।

৫৩। আমরারুল হরফ ওয়াল কালাম।

৫৪। তালবীসে ইবলিশ।

৫৫। সিরাজুল সালেকীন।

৫৬। কানযুল ইদত।

৫৭। মাহকুন নযর।

আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয় ঃ

৫৮। এহইয়াউল উলুমদ্দিন।

৫৯। কিমিয়ায়ে সা'য়াদাত

৬০। আখলাকুল আরবার।

৬১। জওয়াহিরুল কুদসী ফী হাকিকাতিন্নাফস।

৬২। মিশকাতুল আনোয়ার।

৬৩। মিনহাজুল আবেদনী।

৬৪। মি'রাজুস-সালেকীন।

৬৫। নাসীহাতুল মুলক।

৬৬। আয়্যুহাল ওলাদ।

Dhaka University Institutional Repository

৬৭। বেদাইয়াতুল হেদাইয়া।

৬৮। মিশকাতুল আনোয়ার ফি লাতাইফিল আখবার।

৬৯। আল মুনকিয মিনাদ্দালাল।

দর্শন শাস্ত্র ঃ

৭০। মাকাসিদুল ফালাসিফাহ্।

৭১। তাহাফাতুল ফালাছেফাহ।

৭২। আল্-হিকমাতু ফি মাখলুকাতিল্লাহ তা'য়ালা।

তাসাউফ (সুফী শাস্ত্র) ঃ

৭৩। খুলাসাতু তাসানিইফ ফি আত্তাসাউফ।

- অনৈসলামিক সম্প্রদায় সমূহের বিরুদ্ধে বিতর্ক মূলক রচনা ঃ

৭৪। আর-রুদ্দুল জামিল লি আলিহাতে ঈসা বেসারিহী আল্ ইঞ্জিল।

৭৫। আল মুসতাজহারী।

৭৬। মুফাচ্ছালুল খিলাফ।

৭৭। আদ-দরজুল মারকুম।

৭৮। কিসতাসুল মুসতাকিম।

৭৯। ফায়সালুত্ তাফাররুকা বাইনাল ইসলাম ওয়াল যানদাকাহ।

বিবিধ ঃ

৯০। হুজ্জাতুল হক

৯১। আল মাজনুন বিহী আ'লা গাইরে আহলিহী।

৯২। আল মাজনুনুস সগীর আত্তাবিল আজাধয়াতিল গাযালীয়া কি মাসায়েলে আল উখরুবিয়াহ।

৯৩। আল কাশফু ওয়াত-তাধায়িনা ফি গুরুবীল খালকে আজমায়ীন।

৯৪। রিসালাতু আদ-দুনিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরবীতে আল-গাযালীর অবদান

আববাসীয় যুগের মধ্য ভাগে জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। তখন বাগদাদ নগরী জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্বের শীর্ষস্থান লাভ করে। এ সময় বাগদাদকে "দারুল হিক্‌মা" বা জ্ঞান বিজ্ঞানের ভান্ডার বলে অভিহিত করা হয়। তাই সকল জ্ঞানী -গুনীদের সমাবেশ হতো বাগদাদ নগরীতে। ইতিমধ্যে কুরআন ও হাদীসের অবতারণা আরবী সাহিত্য কে তুঙ্গে তুলে দেয়। আরবী সাহিত্য চর্চাও চেতনার উত্তাল তরাঙ্গ ক্ষীপ্ত হয়ে আব্বাসীয় যুগের একাদশ শতাব্দীতে এক নতুন রূপ ধারণ করে।

তখন আরবী গদ্য সাহিত্য দু'টি ধারা প্রবাহমান ছিল। একটি কথা সাহিত্য, অন্যটি গবেষণা ও মননশীলতা। মননশীলতার ধারায় নিম্নলিখিত শাখাগুলো সমালোচনা সাহিত্য, ধর্মীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান ধর্মীয় সাহিত্য, দর্শন কেন্দ্রীক সাহিত্য, জ্যোতি বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, নৈতিক বিজ্ঞান ইত্যাদি, গায়ারী'র গ্রন্থ রচনার ভাব দ্বারা বুঝা যায়, তার গ্রন্থ রচনার ধারা ছিল গবেষণা ও মননশীলতা। উল্লেখ যোগ্য গদ্য সাহিত্য বলতে বুঝায় বক্তৃতা, ভাষণ, বংশ তালিকা, উপদেশ, চিঠিপত্র, ও ইতিহাস।

মুসলিম বিশ্বে গাযালীর (রঃ) পরিচয় শুধু দার্শনিক ও তাপস হিসেবে। অথচ তিনি একজন প্রখ্যাত সাহিত্য বিদ ও ছিলেন। ইমাম গাযালী, ইব্‌নসীনা, ইব্‌ন রুশদ প্রমুখ মধ্য যুগীয় সাহিত্যিক ঐতিহাসিক ও দার্শনিকদের লেখনীর মাঝে আধুনিক চিন্তা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের আভাস পাওয়া যায়। এদের ভাষা ও প্রাচীন আরবের ভাষার মধ্যে কোন

Dhaka University Institutional Repository

পার্থক্য নেই[৩৫]। গাযালী'র গ্রন্থ রচনায় ধারা গবেষণা ও মননশীলতা মূলক ছিল, নিম্নে আলোচনা করা হলো, যেমন।

তাফাসীর শাস্ত্র, হাদীস শাস্ত্র ও ফেকাহ শাস্ত্র এগুলো গবেষনা মূলক সাহিত্য। গাযারী (রঃ) কুরআনের উপর গবেষণা করে দু'টি পূর্ণাঙ্গ তাফসীরও একটি সূরার তাফসীর করেন। তার তাফসীর এর নাম ইয়া কুতুজ্ঞাবীল ফি তাফসীরিল তানসিল, যা (৪০) চল্লিশ খন্ডে বিভক্ত ছিল, যেহেতু কুরআন কে আরবী সাহিত্যের স্রষ্টা বলা হয়। সেহেতু যিনি কুরআনের উপর আরবী ভাষায় গবেষণা করেন, তিনিই আরবী সাহিত্যবিদ। এতে করে সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেল গাযালী (রঃ) কত উন্নতমানের আরবী সাহিত্যিক ছিলেন।

তিনি তর্কশাস্ত্র, ধর্মীয় বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ধর্মীয় সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদির উপর আরবী ভাষায় প্রায় তেইশ খানা গ্রন্থ রচনা করেন। এসব গুলো গবেষণা মূলক তাঁর এসব লেখনার দ্বারা বুঝা যায় তিনি অতি উন্নত মানের একজন ভাষাবিদ ছিলেন।

কবিতা চর্চা ঃ

কবিতা রচনাতে ও গাযালীর অপূর্ব দক্ষতা ছিল তাঁর রচিত বহু কবিতার আজ ও পরিচয় পাওয়া যায়[৩৬]। তিনি হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্মস্থান যিয়ারত করতে গিয়ে সেখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষ করেন, অতঃপর ভাষাবেগে কতকগুরো কবিতা আবৃত্তি করে ফেলেন। তিনি একটি "ফাসিদা" রচনা করেন, যার নাম "কাসিদায়ে গাযালী"।

এক ব্যক্তি ইমাম গাযালী (রঃ) কে মরুভূমির মধ্যে একটি কম্বল পরিহিত অবস্থায় একটি থলে হাতে নিয়ে উদাসীন ভাবে বিচরণ করতে

---

[৩৫] জি, এম, মেহেরুল্যাহ, আরবী কবি সাহিত্যিক ও সাহিত্য, (ঢাকা : আল-নাহদা প্রকাশনী ১৯৯৩ সন) পৃ. ১৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

দেখলেন। অতঃপর গাযালী (রঃ) যখন চার শতাধিক ছাত্রের একটি দবসে তালিম দিচ্ছিলেন, তখন উক্ত লোকটি গাযালী (রঃ) কে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন অবস্থায় দেখে বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞেস করল, "এ অবস্থা কি পূর্বে চে উত্তম? উত্তর ইমাম গাযালী (রঃ) দু'লাইন কবিতা পড়লেন। যার সমার্থ হলো ঃ

লাইলা আয় সুদার প্রেম তো আগেই ত্যাগ করেছি।
এখন আমি প্রকৃত মাহবুব ও সর্বোত্তম বন্ধুর সন্ধানে বেরিয়েছি।
প্রেম আমাকে ডেকে বলে।

"হেমরুচারী! কোথায় যাচ্ছে? তুমি ভ্রমন বন্ধ করো। এ দিকে এসো, এখানেই রয়েছে প্রকৃত মাহবুবের ঠিকানা।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা গেল তিনি একজন কবি ও ছিলেন। আরবীতে তাঁর যে অবদান রয়েছে। তা নিম্নে তাঁর আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ সমূহের বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

মিনহাজুল আবেদীন

আরবী ভাষায় লিখিত ইমাম গাযালী (রঃ) এর 'মিনহাজুল আবেদীন' গ্রন্থখানা অতিব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কিতাবগুলোর মধ্যে 'ইহইয়াউলুমীদ্দিন, আল কুরবাতু ইলাল্লাহ ইত্যাদি সাধারণের বোধগম্য হবার মত নয়। ফলে সাধারণ মানুষ তাতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। দতাই ইমাম গাযালী (রঃ) আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিকট এ বলে দোয়া করবেন, "হে আল্লাহ আমাকে এমন একটি কিতাব লিখার ক্ষমতা

[36] আবদুল মওদুদ, মুসলিম মনীষা, (ঢাকা, ইফা, ১৯৮০ সন) পৃ. ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

দান করেন। যাতে সাধারণের উপকার সাধিত হয়"। আল্লাহ তায়ালা তার দোয়া কবুল করলেন।

"মিনহাজুল আবেদীন" সম্পর্কে স্বয়ং ইমাম গাযালী (রঃ) মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "আল্লাহ তায়ালা আমার দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁর করুনাধারায় আমার কাছে তাঁর রহস্য উদ্‌ঘাটন করে ছিলেন, অতঃপর তিনি আমাকে এমন একটি উত্তম তারতীব বাতলিয়ে দিলেন, যা আমি আমার আগেকার কিতা সমূহে প্রয়োগ করিনি। সে নয়া তারতীব অনুযায়ী এ কিতাব শুরু করছি

এ কিতাব খানা প্রকৃত পক্ষে ইবাদত গুজার ব্যক্তিদের জন্য জান্নাতের পথ প্রদর্শক। তিনি আলোচনা করেন, ইবাদতে এলাহী হচ্ছে ইলমের ফল, জীবনের পরিণতি, শক্তিমান পুরুষের সম্বল, আউলিয়া কিরামের পাথেয় এবং একিনের পথ।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

অর্থ ঃ আমি তোমাদের প্রভূ। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর[৩৭]।

যে বান্দা ইবাদতের জন্য তৈরী হয় এবং সেই রাস্তায় অভিযানের উদ্দেশ্য একাগ্রতা হাসিলের যক্ষয় হয়। বুঝতে হবে তার জন্য আল্লাহ তা'আলার ইশরায়ই তা হচ্ছে এবং তাঁকে তিনি বিশেষ তাওফিক দান করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা তা বুঝা যায়।

অর্থ ঃ যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ আল্লাহ তা'আলা ইসলামের জন্য খুলে দিয়েছেন, সে তার প্রভুর নুরের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন[৩৮]।

"মিনহাজুল আবেদীন" গ্রন্থখানায় ইমাম গাযালী (রঃ) দশটি সোপান বা স্তরে বিনাস করেছেন।

---

[37] আল্ কুরআন ঃ সুরা আম্বিয়া, আয়াত ৯২।
[38] আল কুরআন ঃ সুরা যুমার, আয়তা-২২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম সোপান	ঃ	ইলম ও তার প্রয়োজনীয়তা, তওবার মকাম
দ্বিতীয় সোপান	ঃ	মাখলুক
তৃতীয় সোপান	ঃ	শয়তান
চতুর্থ সোপান	ঃ	নফ্‌স আম্মারা দমন
পঞ্চম সোপান	ঃ	পেট ও তার হেফাজত
ষষ্ঠ সোপান	ঃ	দুনিয়া, সৃষ্টিজীব, শয়তান এবং নফসের চিকিৎসা
সপ্তম সোপান	ঃ	রিযিকের প্রশ্নের নির্ভরতা, রিয়া বিল কাা, বিশেষ আলোচনা।
অষ্টম সোপান	ঃ	ইবাদতে প্রেরণাদানকারী বিষয়
নবব সোপান	ঃ	মন্দের প্রভাব মুক্তি।
দশম সোপান	ঃ	হামদ ও শোকর।

প্রথম সোপান

ইলম ও তার প্রয়োজনীয়তা

প্রথমেই ইল্‌ম অপরিহার্য ও জরুরী। কেননা এটাই সব কিছুর ভিত্তিমূল। আর ইল্‌ম ও ইবাদতে ইলাহী-এ দু'টি এমন মূল্যবান বস্তু, যার জন্য এ সৃষ্টি জগতের সকল ব্যবস্থাপনা। নিম্নোক্ত দুইটি আয়াত দ্বারা তা অনুধাবন করা যায়।

অনুবাদ ঃ আল্লাহ তিনিই, যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপভাবে যমীনও। এ সবের মধ্যে আল্লাহর আহকাম নাযিল হয়। যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন। আর আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুকেই তাঁর ইলমের দ্বারা ঘিরে রেখেছেন[৩৯]।

[39]. আল্ কুরআন, সুরা আলাক, ১২।

Dhaka University Institutional Repository

অত্র আয়াত দ্বারা ইলমের মাহাত্ম্য যথার্থভাবে অনুধাবন করা যায়। আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের পূর্বশর্ত হইতেছে ইলম অর্জন করা, ইলম ছাড়া আল্লাহকে জানা যায় না। এ ইলামের গুরুত্বের উপর আলোচনা গিয়ে রাসুল (দঃ) বলেন।

সাধারণ একজন আবেদের (উম্মাতের) চেয়ে আমার মর্যাদা যতখানি উর্ধ্বে একজন ইবাদত-গোযারের চেয়ে একজন আলিমের মর্যাদা ও ততখানি উর্ধ্বে।

রাসুল (দঃ) আরো বলেনঃ আমি তোমাদের নিকট জান্নাতের সর্বাপেক্ষা মর্যাদা সম্পন্নদলের কথা বলব? সাহাবীগণ আরয করলেন ঃ নিশ্চয়ই ইয়া রাসুল! অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের আলিমগণ।

অর্থঃ আমি জিন ও মানুষকে এজন্যই পয়দা করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে[৪০]।

এ আয়াতটি ইবাদতে ইলাহীতে মশগুল হওয়া করেছি যে, তারা আমার ইবাদত সুস্পষ্ট প্রমাণ। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহেরই বলা চলে যে, ইলম ও ইবাদতে এলাহী এমন দু'টি জিনিস-যে জন্য এ দুনিয়া ও আখেরাতের অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। কিন্তুতেই ইলম ও ইবাদতে ইলাহী ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে মশগুল হবে না। তার সকল প্রচেষ্টা ও শ্রম এর জন্যই সীমাবদ্ধ রাখবে এবং এদু'টি বিষয়ের চিন্তা ভাবনাই তার ব্রত হবে। এদু'টি ছাড়া অবশিষ্ট সকল বিষয় বাজে ও মূল্য হীন, এগুলোতে কোন লাভ নেই। আর ও মনে রাখতে হবে। উপরিউক্ত দু'টি বিষয়ের মধ্যে আবার ইলমেরই বিশেষ মর্যাদা ও স্থান পেয়েছে।

ইলমের সাথে আমলের সুদৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। ফলবিহীন বৃক্ষের যেমন কোন গুরুত্ব নেই। তেমনি আমল ছাড়া ইলমের ও গুরুত্বহীন। তারপর ও ইলম ও ইবাদত এদুটির মধ্যে ইলমের মর্যাদাই অধিক। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

মনে রাখতে হবে, ইবাদতের জন্যই ইলমের প্রয়োজনীয়তা নতুবা শুধু ইলম একটা বিরাট বোঝা ব্যতীত আর কিছুই নয়। অতএব ইলম বৃক্ষ আর ইবাদত এলাহী হচ্ছে তার ফল। স্বভাবতই বৃক্ষের মর্যাদা সমধিক, কেননা বৃক্ষই ভিত্তি। বৃক্ষ না হলে ফলের প্রশ্নেই আসে না। তবুও উপকৃত হওয়া যায় কেবল তার ফলের দ্বারাই। এ প্রেক্ষিতে উভয় বিষয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান করা বান্দার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

এ বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে হাসান বসরী (রঃ) বলে ছিলেনঃ এমন ভাবে ইল্‌ম হাসিল কর, যাতে তা ইবাদতে ইলাহীর পথে প্রতিবন্ধকতা হয়ে না দাঁড়ায় এবং ইবাদতে এলাহী ও এমন পদ্ধতিতে করো, যাতে তা ইল্‌ম অর্জনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। এখন একথা যখন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, বান্দার জন্য ইল্‌ম ও ইবাদতে ইলাহী এদুটোরই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নিশ্চিতই ইল্‌মের স্থান আগে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা ইল্‌মই উৎস বুনিয়াদ। রাসুল (সঃ) এর বাণী দ্বারা তা প্রমাণিত হলো।

অর্থ ঃ ইল্‌ম হলো আমলের ইমামস্বরূপ আর আমল হচ্ছে ইল্‌মের অনুসরনকারী।

অত্র হাদীস দ্বারা ইল্‌মের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। ইল্‌মকে ইবাদতে ইলাহীর উপর স্থান দেওয়ার দু'টি কারণ ঃ প্রথমত, এর দ্বারাই ইবাদতের পথ নির্দিষ্ট করতে হয়। দ্বিতীয়ত, এর দ্বারাই প্রতিবন্ধকতা ও বাধা সৃষ্টিকারী বস্তুসমূহ থেকে নিজকে নিরাপদ রাখতে হয়।

---

[৪০] আল্ কুরআন ঃ যারিয়াত ঃ ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইবাদতের জন্য ইল্‌ম ঃ

প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইল্‌ম হাসিল করা ফরজ[৪১]।

এখন তোমার জানা প্রয়োজন কোন ইল্‌ম জানা ফরজ এবং ইবাদতে ইলাহীতে বান্দার জন্য কোন ইল্‌ম প্রয়োজন। মোটামোটা একটি কথা মনে রাখা দরকার, যে সব ইল্‌ম (জ্ঞান) অর্জন করা ফরজ এবং জরুরী তা তিন প্রকার। এক তওহীদ (একত্ববাদ) সম্পর্কিত ইল্‌ম, দুই, অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কিত গোপন ইলম। তিন শরীয়ত সম্পর্কিত ইলম।

ইল্‌মে[৪২] তাওহীদের ততটুকুই অর্জন করা ফরজ, যার দ্বারা দীনের মূলনীতি জানা যায়। দীনের মূলনীতি হলো ঃ একজন প্রকৃত[৪৩] "মা'বুদ আছেন, যিতি সর্বজ্ঞ, সবশক্তিমান, সবকিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন, তিনি চিরঞ্জীব তাঁর কোন শরীক নেই। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও প্রেরিত রাসুল।

তওবার মকাম

আল্লাহর ইবাদতে যিনি মশগুল হতে চান, তাকে অবশ্যই "ওওবা"[৪৪] করে নিতে হবে। ইবাদতে ইলাহীতে মশগুল হওয়ার জন্য জরুরী ও অতীব প্রয়োজনীয়। দু'টি কারণে তওবার প্রয়োজন হয়।

---

41. আল হাদীস, বুখারী ও মুসলিম।
42. 'ইলম 'শব্দটি আরবী, যার অর্থ ব্যাপক জ্ঞান, অহীর জ্ঞান সহ দুনিয়াবী সকল প্রকার জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে। 'তাওহীদ' শব্দটি ও আরবী শব্দ। যার অর্থ একত্ববাদ, এক প্রভূর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করাকে তাওহীদ বলে।
43. 'মা'বুদ' 'আবদুন শব্দ থেকে উৎপত্তি, অর্থ পূজা করা, দাসত্ব স্বীকার করা, আর মা'বুদ অর্থ দাসত্বের উপযুক্ত। যিনি দাসত্বের অধিকারী, অর্থাৎ আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে।
44. তওবা আরবী শব্দ। অর্থ হইতেছে। ফিরে থাকা, বিরত থাকা, নিজাকে গুটিয়ে রাখা, গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়া, গাযালী (রঃ) বলেন, তওবা হইতেছে কলবের একটি প্রক্রিয়ার নাম। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষে তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য পূর্বে গুনাহ বলতে যা কিছু হয়ে গেছে, তাতে পুনরায় লিপ্ত না হওয়াই তওবা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত, গুনাহ মানুষকে দুর্ভাগ্য ও বঞ্চিত অবস্থায় নিপতিত করে, অতঃপর তা দুর্ভোগ ও অপমানের দিকে ঠেলে দিতে থাকে। শুধু তা নয়, গুনাহর আকর্ষণ মানুষকে আল্লাহর পথে চলতে ও তাঁর ইবাদতে এগিয়ে যেতে বাধার সৃষ্টি করে। কেননা গুনাহ্‌র বোঝা মানুষকে এমনি অবস্থায় পৌঁছিয়ে দেয় যে, সে গুনাহ থেকে মুক্তি হয়ে আল্লাহর পথে এগিয়ে যেতে পারে না। অতঃপর গুনাহ মানুষের কালব বা অন্তঃকরণকে কালো করে দেয়, ফলে তার অন্তরে জুলমাত আর পাষাণত্ব ঘাঁটি স্থাপন করে।

দ্বিতীয়ত, ইবাদত যাতে কবুল হয় সে জন্য ও তওবা করা একান্ত প্রয়োজন। হালাল-হারাম মেনে চলা যেমন ইবাদতের জন্য পূর্বশর্ত, তেমনি ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য ও তওবা পূর্বশর্ত। তওবা করা ছাড়া করিয়া গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা হয় না।

তওবার শর্ত চারটি ঃ

প্রথমা শর্ত ঃ গুনাহতে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা অর্থাৎ মনে মনে এ প্রতিজ্ঞা করবে যে, কিছুতেই আর এ গুনাহ্‌তে লিপ্ত হবে না। নিজের এমতকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ যে ধরনের গুনাহ পূর্ব হয়ে গেছে, তা থেকে তওবা করবে। সে গুনাহ পূর্বে করা হয় নি, তা থেকে তওবা করলে তাকে তওবা বলা হবে না।

তৃতীয় শর্ত ঃ এখন যে গুনাহ্‌তে লিপ্ত হওয়াকে পরিতাগ করেছে, তার সাথে তার দ্বারা আগে যা সাধিত হয়েছে, তার গুরুত্ব সমান হতে হবে।

চতুর্থ শর্ত ঃ আল্লাহর মহত্ত্ব উপলব্ধি, তাঁর অসন্তুষ্টি ও ভয়াবহ আযাব থেকে পরিত্রানই গুনাহ থেকে বিরত থাকার একমাত্র উদ্দেশ্যে হওয়া চাই, এগুলি পরিপূর্ণ হলেই বুঝতে এটাই প্রকৃত তওবা।

Dhaka University Institutional Repository

তওবার প্রারম্ভিকা ঃ

তওবার প্রারম্ভিক হিসাবে তিন কাজ করতে হয়। প্রথমত, আল্লাহ তা'আলার আযাবের ভয়াবহতা বিরক্তি ও অসন্তুষ্টির এমন পর্যায়টিকে স্মরণ করবে যা সহ্য করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য কোন মানুষেরই নেই।

তৃতীয়ত, নিজের দুর্বলতা ও স্বল্পস্থায়ী জীবনের কথা স্মরণ করবে। মনে করবে, যে মানুষ সূর্য্যের উত্তাপ, শীতের প্রকোপ এবং পিপিলিকার দংশন পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না। সে কি করে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক দোযখের আযাব এবং ফেরেশ্‌তাদের নির্মম প্রহার সহ্য করতে সক্ষম হবে?

যখন এ সকল বিষয়ের চিন্তার দিকে অগ্রসর হতে থাকবে এবং রাত-দিন সর্বক্ষণ এগুলো স্মরণ রাখতে সক্ষম হবে। তখন খাঁটি তওবা রাভ করতে পারবে।

পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় ঃ

পাপ তিন প্রকার ঃ প্রথমত, আল্লাহ্‌র ওয়াজিব সমূহ ত্যাগ করা-যথা, নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত, ইত্যাদি, যতদূর সম্ভব এ সকল আদায় করা দরকার।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে যা সংঘটিত হয়-যথামদ্য পান, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, সূদ খাওয়া ইত্যাদি, এ সব কাজে লিপ্ত হলে পরক্ষণেই অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং পুনরায় যাতে তাতে লিপ্ত না হতে হয়, তার জন্য মনকে দৃঢ় করা দরকার।

তৃতীয়ত, মানুষের পরস্পরের উপর পরস্পরের যে হক আছে, সে ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া, এ ব্যাপারটি বড় কঠিন ও মারাত্মক। কখনো এ পর্যায়ের পাপ আর্থিক ব্যাপারে সংঘটিত হয়। আবার কখনো জীবন, মান-ইসৃসাত ও ধর্মের ব্যাপারে সংঘটিত গয়। যদি সম্পদ সম্পর্কিত কোন বিষয় হয়, তবে সে মাল ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব।

Dhaka University Institutional Repository

ইয্যত ও মর্যাদা সম্পর্কিত কোন কিছু যদি হয়ে থাকে, যেমন কারো গীবত করলে, কিংবা কারো উপর অপবাদ দিলে অথবা কাউকে গালি-গালাজ করলে এ ক্ষেত্রে যার সামনে এ গুলো প্রকাশ করা হয়েছে। তার নিকট গিয়ে নিজকে মিথ্যাবাদী হিসাবে পেশ করতে হবে। যার গীবত করা হয়েছে। সম্ভব হলে তার নিকট গিয়ে ক্ষমা চাইতে হইবে। সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকট এ গুনার জন্য আহজারী করতে হবে।

সার কথা এই যে, এ সকল ক্ষেত্রে যার 'হক'[৪৫] নষ্ট হবে, তাকে যদি সন্তুষ্টি করার সুযোগ ও সামথ্য থাকে, তবে তা-ই করতে হবে। নতুবা আল্লাহ পাকের নিকট বিনয়, নম্রভাব ও অনুশোচনা এবং দান-খয়রাতের সাথে বিষয়টি পেশ করবে, যেন আল্লাহ পাক সে ব্যক্তিকে তোমার প্রতি সন্তুষ্টি করে দেন, আল্লাহর ইচ্ছায়ই এসব বিষয় কিয়ামতের দিন সংঘটিত হবে।

দ্বিতীয় সোপান ঃ মাখলুক

ইমাম গাযালী (রঃ) এ অধ্যায়ে মাখলুক[৪৬] সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। আমাদের সামনে মখলুক অর্থাৎ সৃষ্ট জগতের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। কোন পর্যায়ে আমাদের নির্জনতা ও নিঃসঙ্গ জীবন অবলম্বন করা উচিত, সে সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, এমন অনেকেই আছেন, যাদের "মাখলুক" থেকে জ্ঞান অথবা অন্য কোন কিছু গ্রহণের প্রয়োজনই নেই এবং তাদের কাছে ও মানুষের প্রয়োজন নেই। এ শ্রেণীর মানুষের পক্ষে মানুষ থেকে নিঃসঙ্গতা অর্জনই উত্তম, জুমআ,

---

45. "হক" আরবী শব্দ, ইহার বহু বচন হুকুক, অর্থ অধিকার।

46. "মাখলুক" আরবী শব্দ, অর্থ সৃষ্টি বস্তু, বা সৃষ্টিজগত, আল্লাহ তায়ালার সকল প্রকার সৃষ্টি বস্তু সমূহ। বিশেষ করে এখানে মাখলুক দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টি সৃষ্টি বস্তু 'মানুষকে' বুঝানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

জামা'আত, ঈদ, হজ্জ ও ইলমের মজলিস এসব ব্যতীত আর কখনো মানুষের সাহচর্যে তার না যাওয়াই উত্তম। তবে সাংসারিক বিষয়ের মধ্যে যদি এমন কোন জরুরী ব্যাপার দেখা দেয়, যা না হলেই চলে না, তাহলে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে দেখা করতে পারেন। যদি এ ব্যক্তি জুম'আর নামাযেও না গিয়ে এ বিবেচনা করেন যে, মানুষের সাক্ষাৎ পরিত্যাগ ও সম্পূর্ণ নির্জনতা অবলম্বন তার জন্য লাভজনক। তা হলে জুম'আতে না গিয়ে অসুবিধা হবে না। এ কথার পরিষ্কার অর্থ এ যে, যদি সত্যিকার ভাবে বুঝতে পারা যায় যে, মসজিদে জুম'আতে হাজির হওয়ার অর্জিত সাওয়াবের দ্বারা মসজিদে যেতে ও মানুষের সাথে মেলামেশার ফলে যে গুনাহ হবে তার ক্ষতিপূরণ হবে না[৪৭]। তবে এ ধরনের ব্যক্তি কোন নির্জন পাহাড়ের চূড়া অবস্থান করা উত্তম। কারণ সেখানে কোন জনবসতি নেই, যার কারণে তার প্রতি জুম'আর ও জাম'আতে নামাজ আদায় করা প্রয়োজন হবে না।

দ্বিতীয়ত যে ব্যক্তির জ্ঞানের ব্যাপারে মানুষের নিকট প্রত্যাশী অথবা তার নিকটই মানুষ জ্ঞান লাভেচ্ছু কিংবা ধর্মীয় ব্যাপারে তার নিকট মানুষের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন, কোন ব্যক্তি জন সমাজে থাকলে তিনি হয়তো কোন একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন বা কোন বিদ'আত দূর করতে সক্ষম কিংবা কথায় বা কাজে মানুষকে নেক কাজের দিকে আহবান করতে পারেন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার ক্ষমতা ও রাখেন এমতাবস্থায় এ শ্রেণীর লোকের পক্ষে মানুষের সঙ্গ ত্যাগ ও নির্জনতা অবলম্বন কোনক্রমেই সঙ্গত নয়। বরং মানুষের মধ্যে তার অবস্থান করা একান্ত দরকার। কারণ তাতে আল্লাহ তা'আলার মুখলুকের নসীহতের কার্য হবে। আল্লাহর দ্বীনের হেফাজত হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার দ্বারা শর'য়ী আহকাম প্রতিষ্ঠা হবে।

---

[৪৭]. মিনহাজুল আবেদীন ঃ গাযালী (রঃ), পৃঃ ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

রাসুল (দঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, "যখন বিদ'আত আত্ম প্রকাশ করে এবং আলিম নীরবতা অবলম্বন করে তেমন আলিমের উপর আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ নাযিল হোক"।

অত্র হাসিদ দ্বারা বুঝা গেল। উপরোল্লেখিত ব্যক্তির নির্জনতা ও নীরবতা অবলম্বন করা জায়েয হবে না।

এখানে একটি বিষয় অবশ্যই স্মরণীয় যে, যে ব্যক্তির ব্যাপারে ধর্মীয় ব্যাপারে সমাজ নির্ভরশীল, মানুষের মধ্যে অবস্থানের জন্য তাঁর দু'টি জিনিসের অত্যন্ত প্রয়োজন, প্রথমত, অসীম ধৈর্য, বিপুল সহিষ্ণুতা, উদার দৃষ্টি ও সকল ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের যোগ্যতা। দ্বিতীয়, সমাজের অন্যান্য সকল ব্যাপারে যদিও তিনি সশরীরে অবস্থান করবেন তথাপি তাঁকে সকল বিষয় থেকে আলাদা থাকতে হবে। সুতরাং যখন তিনি কথা বার্তা বলবেন, ধর্মীয় বিষয়টিকে প্রাধান্য দিবেন। যদি কেউ তাকে সাক্ষাৎ করতে আসে, তবে তার মর্যাদা ও সম্মান অনুযায়ী তাকে মর্যাদা দান ও সম্মান প্রদর্শন করবেন। যদি মানুষ তাঁকে উপেক্ষা করে বা তাঁর সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যায়। তবে এ অবস্থাকে সৌভাগ্য মনে করবে।

এবার আমল আলোচনায় আসা যাক। উদ্দেশ্য ছিল নির্জনতা ও নিঃসঙ্গ জীবন অবলম্বন সম্পর্কে আলোচনা, যদি কেউ প্রশ্ন তোলেন ৫, রাসুল (সঃ) তো বলেছেন ঃ আমার উম্মতের বৈরাগ্য হলো মসজিদে অবস্থান করা, এর দ্বারা সংসার ত্যাগ ও নিঃসঙ্গ জীবন অবলম্বনকে তো নিষিদ্ধই করা হয়েছে।

এর জবাব আমি (গাযালী) বলবো যে, হুযূর (সঃ) এর এ নির্দেশ টি ফিতনার যুগের জন্য নয়। তাছাড়া মসজিদে অবস্থান করলে ও যদি মানুষের সাথে সাক্ষাতকার এবং অন্য কোন ব্যাপারে জড়িত না হয়। তাহলে বাহ্যিক দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে থাকলে ও অন্তরের দিক দিয়েতো সংসার থেকে আলাদাই রয়ে যায়। সংসার ত্যাগ ও নিঃসঙ্গ জীবন অবলম্বনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাই।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় সোপান ঃ শয়তান

শয়তানের সাথে সংগ্রাম ঘোষণা করা উচিত এবং তাকে পরাজিত ও পদাবঞ্চ করার সতর্ক চেষ্টার প্রয়োজন। একাজ টি দু'টি উপায়ে সম্পন্ন করা সম্ভব।

প্রথমত, মনে করতে হবে যে, শয়তান পথভ্রষ্টকারী প্রকাশ্য শত্রু। তোমার ভাল ও কল্যাণের সাথে তার কোন সংস্রব নেই। সর্বদাই তার আকাঙ্খা ও চেষ্টা কেবল তোমার ধ্বংসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। সুতরাং এমন শত্রু থেকে কখন ও নিজেকে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ মনে করা উচিত নয় আল্লা তায়ালার ঘোষণা ঃ

অর্থঃ "হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদের তাকিদ বা প্রতিশ্রুতি দেয় নি যে তোমরা শয়তানের পূজা করোনা। কেননা শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন[৪৮]।

দ্বিতীয়, মনে রাখতে হবে সে শয়তানকে তোমার শত্রুতার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে; সে সব সময় তোমার সাথে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত এবং সর্বদা তোমার পিছনে সে লেগে আছে। সুতরাং তুমি যদি এ ব্যাপারে গাফেল থাক। তবে তোমার অবস্থা কি হবে এবং তার পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা সহজে অনুমান করা যায়।

চতুর্থ সোপান ঃ নফ্স আম্মারা দমন

ইবাদতকারী ব্যক্তির জন্য অতঃপর অত্যন্ত প্রয়োজন ও জরুরী হলো নফ্সে আম্মারা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া। কেননা, এটা সমস্ত দুশমনের মধ্যে সব চাইতে ভয়াবহ, মারাত্মক ও ধ্বংসকারী দুশমন। এ দুশমন থেকে যে বিপদের সৃষ্টি হয়, তাও অতি মারাত্মক এবং তা

---

[৪৮] আল কুরআন, সুরা ইয়াছিন, আয়াত-৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিরোধ করা খুবই কঠিন। এই নফ্সে আম্মারার রোগের ও শেষ নাই। আর রোগগুলোর চিকিৎসা ও সাংঘাতিক কঠিন।

নফ্সে আম্মারা এমন বিপজ্জনক হওয়ার কারণ দুটো। প্রথমত, এটা হলো অভ্যন্তরীন শত্রু। দ্বিতীয় কারণ এই যে, নফ্স হলো প্রিয় শত্রু, অভ্যন্তরীণ শত্রু মানুষের যেরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারে বহিঃশত্রু তদ্রুপ করতে পারে না। নফ্স প্রিয় শত্রু, মানুষ তার বন্ধুর দশমনী সম্পর্কে সর্বদাই অসতর্ক ও উদাসীন থাকে। আর এ প্রিয় বন্ধু যদি প্রিয় শত্রু হিসাবে তার উপর সাওয়ার হয়ে বসে, তা হলে সে সহজে তা অনুভব করতে পারবেনা।

নফ্সের সংশোধন ঃ

নফ্সের চিকিৎসার জন্য সতর্কতা ও দূরদৃষ্টি অত্যন্ত প্রয়োজন, নিম্নে নফসের সংশোধনের তিনটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো, প্রথমত, কাম চরিতার্থতা থেকে সম্পুর্ণ বিরত থাকা। দ্বিতীয়ত, খুব ইবাদত ও নেক আমল করে তার উপর বোঝা হিসেবে তা চাপিয়ে দেয়া। তৃতীয়ত, আল্লাহর দরবারে সাহায্য কামনা করা। কারণ তার সাহায্য ব্যতীত এ নফসে আম্মারা বা কাম-প্রবৃত্তিকে দমন করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। হযরত ইউসুফ (আঃ) এ সম্পর্কে বলেন।

অনুবাদ ঃ "নফ্স তো সব সময় মন্দের প্রতিই আকর্ষন করে- কেবলমাত্র যে নফ্সের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে, তা ব্যতীত"[৪৮]।

পঞ্চম সোপান ঃ পেট ও তার হেফাজত

ইবাদতকারীর জন্য পেটের হেফাজত এবং পেটকে পবিত্র করা দরকার। অঙ্গ পত্যঙ্গের মধ্যে পেটের কর্ম ব্যাপক। আর পেট হচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

সবকিছুর খনি এবং ভিত্তি, এর সকল অঙ্গের সম্পর্ক, ইহাকে সকল প্রকার, হারাম ও সন্দেহজনক বিষয় থেকে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। নচেৎ সকল প্রকার ইবাদত বিনষ্ট হয়ে যাবে। হারাম ও সন্দেহজনক বিষয় থেকে পেটকে রক্ষা করার তিনটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবার জন্য।

আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ

অর্থ ঃ যারা জুলুম করে ইয়াতিমের সম্পদ খায়, তারা নিশ্চয়ই নিজের পেটের মধ্যে আগুন পুরে দেয়-অতি শীঘ্রই যে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে[৫০]।

দ্বিতীয়ত, হারাম ও সন্দেহজনক উপায়ে অর্জিত অর্থ ও হারাম বিষয়-সম্পত্তি ভোগকারী। এ ধরনের ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহর ইবাদতের তৌফিক হয় না, কারণ, আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও আনুগত্য তার পক্ষেই সম্ভব, যে ব্যক্তির সব কিছু স্বচ্ছ ও পরিবত্র, আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা-

অর্থ ঃ নাপাক অবস্থায় প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না গোসল করা[৫১]।

হারাম থেকে বেঁচে থেকে হালাল গ্রহণ করা হচ্ছে মুমিনের আসল পরিচয়।

ষষ্ঠ সোপান

অত্র অধ্যায়ে ইমাম গাযালী (রঃ) দুনিয়া, সৃষ্টজীব। শয়াতান এবং নফ্সের চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি আলোচনা করে। সৃষ্টি জগতে যা কিছুই আছে। আর যে কেউহ ধ্বংস হয়েছে। তা কেবল সত্য পথ থেকে বিচ্যুতির কারণেই হয়েছে। এ গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে আমি

---

[৪৯] আল্ কুরআন, সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত-৫৩।
[৫০] আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত-১০।

Dhaka University Institutional Repository

কেবল এ সবের প্রতিকারের এমন মূল্যবান কয়েকটি কথা বলেই ক্ষান্ত হতে চাই। সে কথা গুলো হবে সংক্ষিপ্ত ধরণের। কিন্তু তার অর্থ হবে ব্যাপক আর অনুসরণকারীদের নিয়ে তুলবে সৌভাগ্যের রাজ-পথে। মোট কথা, দুনিয়া, শয়তান, সৃষ্ট জগত ও নফ্সের চিকিৎসা বা প্রতিকারের ব্যাপারে এ কথা গুলো অকল্পনীয় সাফল্য আনায়ন করতে সক্ষম।

দুনিয়া থেকে নিজকে রক্ষা করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা অপরিহার্য কর্তব্য। এ জন্য সম্ভব মতো দুনিয়া বর্জন করতে হবে। তুমি যদি জ্ঞান, বিবেক ও বুদ্ধিমান হও তাহলে তোমার জন্য এ-ই যথেষ্ট যে, দুনিয়া আল্লাহর দান। এটা তোমাকে মোহিত ও অভিভূত করার ক্ষমতা রাখে। ফলে এ লিপ্ত হলে তোমার বিবেকই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অথচ বিবেকই তোমার মূলধন। সুতরাং কোন জ্ঞান বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষে দুনিয়ার ধোকায় নিপতিত হওয়া কিছুতেই সমীচীন নয়। আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

অর্থ ঃ হে মানবজাতি! কিসে তোমার সম্মনীত প্রভূ সম্পর্কে ধোকায় ফেলেছে[৫২]।

একটি উদাহরণ পেশ করা হলো। একজন মানুষ রোগাক্রান্ত হয়েছেন। ডাক্তার তাঁর চিকিৎসার জন্য দুই পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। একটি ঔষধ দিয়ে রোগ দূরীকরণ, দ্বিতীয়ত, দূষনীয় বা ক্ষতিকর বস্তু থেকে বিরত থাকতে বলবেন। তেমনি মানুষের অন্তঃকরণে রোগ হলে ও এদু'পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। একটি ঔষধ দিয়ে রোগ দূরীকরণ করা অর্থ মৌলিক ইবাদত সমূহ যথার্থ ভাবে সম্পন্ন করা এবং ক্ষতিকর বস্তু সমূহ থেকে বিরত থাকা।

রাসুল (দঃ) বচ্ছেন।

সকল ঔষধের মূল হল ক্ষতিকর ও দূষনীয় বিষয় থেকে বিরত থাকা।

---

[51] আল্ কুরআন, সূরা নিসা ঃ আয়াত-৪৩।
[52] আল্ কুরআন ঃ সূরা ইনফিতার, আয়াত-৬।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম সোপান ঃ রিযিকের প্রশ্নে নির্ভরতা

রিযিক, রুযী-রোজগার এবং অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণ নির্ভরশীলতা অর্জন করতে হবে। এবাদতে-এলাহীর জন্য সম্পূর্ণ মুক্ত নেক আমল সমূহ পুরোপুরি পালন করা। যদি এতে নির্ভরশীলতার মহিমা সৃষ্টি না হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মানসিক স্থিতির অভাব থাকে। ইবাদতের হক সমূহ পুরোপুরি আদায় করা যায় না। আর কেবল মাত্র নির্ভরশীল ব্যক্তিই সকল ব্যাপার থেকে মুক্ত হতে পারে। সকল দুর্বল মনের অধিকারী, দুনিয়ার সামান্য জিনিস ব্যতীত যাদের অন্তর সন্তুষ্ট হয় না, তাদের দ্বারা দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই কোন মহৎ কর্ম সম্পাদন সম্ভব নয়।

নির্ভরশীলতার প্রকৃত অর্থ কি ?

নির্ভরশীলতা সম্পর্কে আলোচনাকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়।

প্রথমত বিষয় ঃ

তাওয়াক্কুল শব্দটি শব্দ থেকে নির্গত। সুতরাং কারো উপর সেই ব্যক্তি তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করতে পারে। যে কাউকে নিজের 'উকিল' মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে, যে উকিল তার সকল কর্মই সম্পাদন করবেন, তার সংশোধনের যামিন এবং বিনা দ্বিধায় ও বিনা অজুহাতে তার সব কিছু অঞ্জাম দিবেন। ইহাই তাওয়াক্কুলের শাব্দিক অর্থ ও ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয় বিষয় ঃ

তাওয়াক্কুল তিন স্থানে প্রয়োগ হয়। প্রথমত, বিতরণের স্থানে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করা যে, তিনি তোমার জন্য যতটুকু রিযিকের প্রয়োজন, তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি যা নির্দিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

করে দিয়েছেন, তাতে কোন ক্রমেই সামান্যতম ও পরিবর্তন হতে পারে না। দ্বিতীয় স্থান সাহায্যের অর্থাৎ আল্লাহ তা'আল্লাহর সাহায্যের উপর পূর্ণ ভরসা থাকা উচিত। যখন তুমি আল্লাহর ইবাদতের ইচ্ছা কর তখন ও তাঁরই সাহায্য সম্পর্কে পূর্ণ ভরসা রাখবে। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা।

যখন তুমি দৃঢ় সংকল্প করো, তখন তুমি আল্লাহর উপর ভরসা কর[৫৩]। তৃতীয় বিষয় রিযিক ও প্রয়োজন ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুল। অর্থাৎ যখন তুমি আল্লাহ তা'আলার ইবাদত এবং খেদমতের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যাবে, তখন তোমার রিযিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সব কিছুর যামিন আল্লাহ স্বয়ং এ নির্ভরশীল তা অর্জন করতে হবে। সুতরাং রিযিকের ভরসা করাই প্রকৃত ভরসা করা।

তাওয়াক্কুল এর পরিচয় ঃ

সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করে কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার দিকে অণ্রণ কেন্দ্রীভূত করাকে 'তাওয়াক্কুল' বলে। আবার কেউ কেউ বলেছেন ঃ উপযুক্ত সময়ে অন্য কোন জিনিসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বা সংযোগ বিলুপ্ত করে দিয়ে অন্তরে আল্লাহ তা'আলার সম্পর্ক স্থাপন করা।

অষ্টম সোপান

খওফ ও রিযার গুরুত্ব ঃ

ভীতিকে দু'টি কারণে অবলম্বন করা দরকার। প্রথমত গুনাহ থেকে বিরত থাকার জন্য। নফ্‌স মন্দ কাজে খুবই উৎসাহী, বার বার সব সময় সে খারাপ কাজে প্ররোচিত করে। নফ্‌সের মধ্যে গুনগত এমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই, যা তাকে মন্দ থেকে বিরত রাখবে। মোট কথা,

---

৫৩ আল্ কুরআন।

Dhaka University Institutional Repository

নফ্সের সংশোধনের একটি মান পন্থা রয়েছে। তা হলো, কথায়, কাজে ও চিন্তায়, সব দিক দিয়ে সব সময় কেবল তাকে ভয় দেখানো।

দ্বিতীয় কারণ, নেকীর জন্য অহংকার এবং আত্মগরিমা প্রকাশ করা উচিত নয়। কারণ এতে নেকীর সওয়াব বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। অর্থাৎ নফ্স যেন কোন সময়ই নেকীর জন্য অহংকার না করে।

আবার রিযার বা আশার সঞ্চার ও দুইটি কারণে দরকার। প্রথমত ইবাদত ইলাহীর উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হওয়ার জন্য। কারণ কাজ খুবই কঠিন। শয়তান সর্বদা তাতে বাধা দেয়। কেবল মাত্র একটি জিনিস রয়েছে, যা তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে, তা হলো আল্লাহর, রহমতের আশা। দ্বিতীয় কারণ-আশা সঞ্চারের দ্বিতীয় কারণ হলোঃ এর দ্বারা বিপদাপদ ও দুঃখ ক্লেশ সহ্য করা সহজ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি সঠিক ভাবে বুঝতে পারে যে, তার কি অর্জন করতে হবে। সে ব্যক্তির পক্ষে সে বিষয় অর্জনে তার সকল চেষ্টা কেন্দ্রীভূত করা সহজ হয়। মোট কথা খাওফ বা ভীতি হল নফ্সের কোড়া, আর আশা হলো নফ্সের সামনে আনন্দের লোভ সাদৃশ।

খাওফ বা ভীতি বলতে বোঝায় সে ভয়কে, যা বান্দা কর্তৃক কৃত কোন মন্দ থেকে ধারনার সৃষ্টি হয়, 'খাশিয়াত' এর অর্থ ও প্রায় অনুরূপই। তবে খাশিয়াতে এক ধরনের আধিক্য ও ব্যাপকতা রয়েছে।

"খাওফ"[৫৪] এর বিষয় চারটি, প্রথমত, যে সব পাপ হয়ে গছে। তাকে অধিক স্মরণ করা-অত্যাচারের দ্বারা যে সব কাজ হয়ে গেছে। তাতে অধিক অনুশোচিত হওয়া। এমন ভাবে এগুলোকে স্মরণ রাখা যেন তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

---

[৫৪] "খাওফ" শব্দটি আরবী। খাওফ এর বিপরীত শব্দ হল 'জুরআত' অর্থ সাহস, এক কথায় ভয়ের বিপরীত সাহস।

Dhaka University Institutional Repository

নবম সোপান

আমাদের চেষ্টা-যত্নকে মন্দ বস্তু থেকে আলাদা রাখা এবং ধ্বংসকারী জিনিস থেকে রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। মন্দ প্রভাব থেকে আমলকে রক্ষা করা অপরিহার্য। আমল এমন সব মন্দ জিনিসে জড়িত থাকতে পারে। যা শুধু ক্ষতিকারকই নয়, আমলকে ধ্বংস করে দিতে ও পারে। যেমন রিয়া, আত্মগর্ব।

Dhaka University Institutional Repository

রিয়ার অনিষ্টকারিতা ঃ

রিয়ার জন্য দুই প্রকারের অসম্মান ও বিপদে পতিত হতে হয়। প্রথমত সমস্ত ফেরেশতার সামনে নিজের ত্রুটি প্রকাশ হয়ে পড়বে। কারণে ফেরেশতাগণ বান্দার আমল সানন্দচিত্তে আল্লাহর দরবারে নিয়ে উপস্থিত হলে আল্লাহ পাক নির্দেশ দান করেনঃ এ আমল 'সিজ্জীনবাসীদের' স্থানে রেখে দাও। কারণ, এই আমল আমার উদ্দেশ্যে করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, আর একবার অসম্মানী ঘটবে কিয়ামতের দিন প্রকাশ্যভাবে, যেমন রাসুল (দঃ) বলেছেন।

অর্থঃ রিয়াকারীকে কিয়ামতের দিন চারটি নামে ডাকা হবে-ওহে কাফির! ওহে ফাজির! ওহে দাগাবাজ! এবং ওহে অনিষ্টকারী! তোর চেষ্ট-যত্ন বরবাদ হয়ে গেছে-তোর (কৃতকর্মের) প্রতিফল বাজেয়াফত হয়ে গেছে। আর তোর জন্য কিছুই অবশিষ্ট নেই। হে ধোকাবাজ, তুই-যার জন্য আমল করছিস। তার কাছ থেকেই সাওয়ার হাসিল কর।

দ্বিতীয় মন্দ বস্তু ঃ

দ্বিতীয় মন্দ বিষয় হলো আত্মগর্ব বা অহংকার এবং আত্মগৌরব। এ বিষয়টি থেকে ও দুইটি কারণে নিজেকে রক্ষা কর্তব্য। প্রথমত, এটি আল্লাহর সাহায্য ও তাওফীকের পথে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে অচিরেই ধ্বংসের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। এ জন্য রাসুল (দঃ) বলেছেন ঃ তিনটি বিষয় ধ্বংসকারী, প্রথমত কার্পন্য, যে কার্পন্যনীতি অনুসরণ করা হয়। দ্বিতীয়ত প্রবৃত্তির এমন কামনা, যেটাকে অনুগমন করা হয় এবং তৃতীয়ত নিজের ব্যাপারে আত্মগর্ব বা আত্মগৌরব করা।

দ্বিতীয় কারণ ঃ

আত্মগর্ব, অহংকার ও আত্মগৌরব থেকে নিজকে রক্ষার প্রয়োজনীয়তার দ্বিতীয় কারণ এই যে, এর দ্বারা নেক-আমল ধ্বংস হয়ে যায়। এজন্যই হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর অনুসারীদের লক্ষ্য করে

Dhaka University Institutional Repository

বলেছিলেন ঃ বাতাস বহু প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছে-আর বহু "আবিদকেই আত্মগৌরব ও আত্মগর্ব ধ্বংস করে দিয়েছে"।

আত্মগর্বের অর্থ ও তার প্রতিক্রিয়া ঃ

আত্মগর্বের প্রকৃত কথা হল নিজের নেক আমলকে বড় মনে করা। আত্মগর্বের বিপরীত বিষয় হলো বিনীত ভাব। অর্থাৎ একথা স্মরণ করা যে, একাজটি আল্লাহ প্রদত্ত তওফীকেই তো সাফল্য মন্ডিত হয়েছে।

আত্মগর্বে নেক আমল যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম বলেছেন ঃ আত্মগর্ব মানুষের আমলকে ধ্বংস করার জন্য প্রতীক্ষা করে। যদি মানুষ মৃত্যুর আগে তওবা করে তাহলে অবশ্য সে নিরাপদ হয়ে যায়। নতুবা কেবল ধ্বংস ব্যতীত আর কিছু থাকে না।

দশম সোপান ঃ হামদ ও শোকর

বান্দার কর্তব্য হয়ে দাড়ায় আল্লাহ তা'য়ালার মহান নিয়ামতের জন্য তাঁর হামদ তথা প্রশংসানীতি ও 'শোকর'[৫৫] আদায় করা। দু'টি কারণে আল্লাহর হামদ ও শোকর করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রথম, প্রাপ্ত নিয়ামত টি স্থায়ী ভাবে লাভ করার জন্য। দ্বিতীয়ত, সেই নিয়ামত আর ও অধিক পাওয়ার কামনা ও আকাঙ্খার পরিপ্রেক্ষিতে।

বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, নিয়ামতের স্থায়িত্ব তার শোকরের উপর নির্ভরশীল। শোকর পরিত্যাগ করলে নিয়ামত বিলুপ্ত এবং ধ্বংস হয়ে যায়।

---

[55] . "শোকরুন" আরবী শব্দ অর্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, "শাকের" অর্থ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী, "শুকরুন" শব্দ থেকে "শাকের" শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন সাধন করেন না, যতক্ষণ না তারা স্বয়ং নিজেদের যোগ্যতার পরিবর্তন করে[৫৬]।

সুতরাং পরম প্রভূ যখন বান্দার দিকে ফিরে তাকান এবং দেখতে পান যে, বান্দা তার নিয়ামতের হক আদায় করছে। তখন তিনি সেই নিয়ামত আরও বাড়িয়ে দিয়ে থাকেন। এমন কি, সেই বান্দাকে উক্ত নিয়ামতের যোগ্য বলে নির্দিষ্ট করে দেন। আর যদি বান্দা নিয়ামতের হক আদায় না করে, আল্লাহ যখন তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখতে পান যে, বান্দা অকৃতজ্ঞ তখন তাঁর নিকট থেকে সকল নিয়ামত কেড়ে নেন। এভাবে অনেক বান্দা আল্লাহর নিয়ামত থেকে সম্পুর্ণ বঞ্চিত হয়।

যারা নিয়ামতের হক আদায় করছে না, কিংবা মূল্য অনুধাবন ও করে না, তাদের নিকট থেকে নিয়ামত কেড়ে নেয়া হয়। যারা নিয়ামতের নাশোকরী করে। তারাই প্রকৃত পক্ষে কৃতঘ্ন[৫৭]।

ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞের মর্যাদা ঃ

ধৈর্যশীলের চেয়ে কৃতজ্ঞের মর্যাদা বেশী। কারণ, বিশেষের মধ্যেও বিশেষ পর্যায়ে এটি সীমাবদ্ধ। আল্লাহপাকের বাণী, "আমার বান্দার মধ্যে কৃতজ্ঞা ব্যক্তি অল্প হয়ে থাকে"। এজন্য বলা হয়েছে যে, বিপদাবস্থার চাইতে নিয়ামত প্রাপ্তির পরই শোকর আদায় করা আল্লাহর নিকট অধিক উত্তম, অতঃপর সবরের গুনাবলী অর্জন করবে। আবার ধৈর্যশীল ব্যক্তির মর্যাদা ও কম না। বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করা সহজ ব্যাপার নয়। আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষণা "নিশ্চয়ই আমরা তাদের ধৈর্যশীল পেয়েছি, তারা (সত্যিই) উত্তম বান্দা ছিল"।

---

[৫৬] আল্ কুরআন, সূরা রা'দ, আয়াত-১১।

Dhaka University Institutional Repository

বিদায়াতুল হিদায়াহ

ইমাম গাযালী (রঃ) এর "বিদায়াতুল হিদায়াহ" নামক গ্রন্থ খানা অতি মূল্যবান। সে সব বিষয় গাযালী (রঃ) অত্র গ্রন্থে আলোচনা করেন, তা নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

প্রথম অধ্যায়

ইবাদত ও আনুগত্য, ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার আদব সমূহ, শৌচাগারে প্রবেশের আদব, উযূর আদব সমূহ, গোসলের আদব সমূহ। মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার আদব সমূহ। মসজিদে প্রবেশের আদব, সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্য ঢলা পর্যন্ত সময়ের আদব সমূহ। নামাযের প্রস্তুতি ও আদব সমূহ। ঘুমের আদব সমূহ। নামাযের আদব ও নীতি-পদ্ধতি। ইমাম ও মুক্তাদীর কর্তব্য, জুমার আদব সমূহ। রোযার আদব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাপকার্য পরিবহার, চোখের আদব, কানের আদব, জিহ্বার আদব, পেটের আদব, যৌনেন্দ্রিয়, হাত, পা, আত্মার পাপাচার, হিংসা, রিয়া, আত্মসমর্থন অহংকার ও দাম্ভিকতা।

তৃতীয় অধ্যায়

সৎসর্গ অবলম্বনের আদব সমূহ। আল্লাহর সংসর্গের আদব, আলেমের পালনীয় আদব। শিক্ষার্থীর পালনীয় আদব, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের আদব। সম্পর্কে তারতম্য হিসাবে মানুষের শ্রেণী বিভাগ। সৎসর্গ ও বন্ধুত্বের হক। বন্ধুত্বের আদব ও হক। সাধারণ পরিচিতদের সাথে আচরণ নীতি। আমি এখানে শুধু আত্মার পাপাচারের উপর আলোচনা করছি।

---

[৫৭] উপকারীর অপকার করে বা তার উপকার অস্বীকার করে এমন, নিমকহারাম, তথ্য-

Dhaka University Institutional Repository

আত্মার পাপাচার ঃ

আত্মা দ্বারা যে পাপ সংঘটিত হয় তাকে আত্মার পাপাচার বলে। অন্তরের ব্যাধি ও দোষনীয় বিষয় সমূহের সংখ্যা অনেক। এসব নিন্দনীয় ব্যাধি থেকে অন্তরকে পবিত্র করতে হলে যেমন দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন, তেমনি এর সূক্ষ্ম ও সুকঠিন চিকিৎসা পদ্ধতি নিরূপন করার জন্যে গভীর জ্ঞানের ও দরকার। সাময়িক ভাবে অন্তরের ব্যাধি ও দোষনীয় বিষয় সমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাধি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। হিংসা, রিয়া ও উজব[৫৮] তবে আত্মাকে এ তিনটি ব্যাধি থেকে মুক্ত করতে পারলে, অন্যান্য ব্যাধি থেকে মুক্ত করা কঠিন হবে না।

রাসুল (সঃ) এরশাদ করেন,

অর্থ ঃ তিনটি ব্যাধি ধ্বংসাত্মক-হীন লীপসা, বেপরোয়া প্রবৃত্তি ও আত্ম প্রশংসা।

হিংসা ঃ

হিংসা উৎপত্তি হয় কৃপনতা এবং হীন লিপ্সা, কেননা কৃপন ব্যক্তি নিজের অধিকৃত সম্পদ অন্যের জন্যে খরচ করতে কুণ্ঠিত হয় আর হিংসুক ব্যক্তি আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত ও অনুগ্রহের ব্যাপারে কার্পন্য করে। অথচ এসবে তার নিজের কোন অধিকার নাই, সম্পূর্ণ আল্লাহর ক্ষমতার ভান্ডারের জিনিস। সুতরাং হিংসুকের লালসা নিশ্চিতভাবে মারাত্মক। হিংসার বিপরীত হলো কল্যাণ অর্থাৎ নিজের অপর ভ্রাতার জন্য আল্লাহর নিয়ামত কামনা করা এবং নিয়ামত অব্যহত থাকার আকাঙ্খা পোষণ করা[৫৯]।

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, কলিকাতা ঃ সাহিত্য সংসদ, ১৯৫৭, পৃঃ ১৬২।

[৫৮] 'উজব' শব্দটি আরবী, যার অর্থ আত্মসমর্থন বা মান ম'র্যাদা, নিজকে নিজে খুব ভাল মনে করা।

[৫৯] ইমাম গাযালী, অনুবাদক, মাও, মুজীবুর রহমান, মিনহাজুল আবেদনী, ঢাকা ঃ ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৬৯, পৃঃ ১২৮-১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

হিংসুক ব্যক্তির প্রবৃত্তি ঃ

হিংসুক ব্যক্তির প্রবৃত্তি হচ্ছে, আল্লাহ তাঁর অফুরান্ত ভান্ডার থেকে যখন কোন বান্দাকে জ্ঞান, সম্পদ, মর্যাদা বা অন্যতর কোন নেয়ামত দান করেন। তখন সে ব্যথিত হয় এবং এসব নেয়ামতের অপসারণ কামনা, যদিও সে এসব নেয়ামতের কোন অংশ লাভ করতে পারবে না। এটা চরম পর্যায়ের হীনতা ও ভ্রষ্টতা। এজন্য নবী করিম (সঃ) এরশাদ করেছেন।

"হিংসা নেক আমলকে এমন ভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেমন আগুন কাষ্ঠকে জালিয়ে শেষ করে দেয়"। (আবু দাউদ, ইবন মাজাহ) হিংসাতুর ব্যক্তি প্রতি মুহূর্তেই অর্ন্তজ্বালাতনের শাস্তি ভোগ করতে থাকে এবং তার প্রতি কেউ করুণা করেনা। কেননা, এই পৃথিবীতে তার পরিচিত এবং সমকালীনদের মধ্যে বহু লোক এমন রয়েছে, যাদের আল্লাহপাক তাঁর অনুগ্রহের ভান্ডার থেকে জ্ঞান, সম্পদ বা প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করেছেন; এদের কে দেখে সে প্রতিনিয়ত অর্ন্তজ্বালা ও মনকষ্ট ভোগ করছে। এভাবে মরণ পর্যন্ত তার এ শাস্তি অব্যাহত থাকছে। অতঃপর আখেরাতের আযাব তো আছেই, যা আর ও মারাত্মক।

রিয়া (লোক দেখানো মনোবৃত্তি) ঃ

গোপন শিরক, শিরকের দ্বিবিধ প্রকারের একটি। মানুষের কাছে মান-মর্যাদা, সুযশ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির লিপ্সাই হচ্ছে এর মূল উৎস। এহেন ব্যাধি প্রধানত ঃ নফ্স ও প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকেই পয়দা হয় এবং শুধু এ কারণেই বহু লোক জীবনে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। একই মানুষ অপর একজন মানুষকে নিজের সাধুতা দেখাতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষ যদি সত্যিকার অর্থে বিচার করে, তা হলে দেখতে পাবে যে, সাধারণ ক্রিয়া কলাপের কথা বাদ দিলে ও দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা এবং ইবাদত বন্দেগীর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ রিয়া বা লোক দেখানো

Dhaka University Institutional Repository

মনোবৃত্তিই কাজ করছে। নিঃসন্দেহ এ মনোবৃত্তিই সকল ইবাদতকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। হুজুর (সঃ) এরশাদ করেন; "কিয়ামতে দিন যুদ্ধে শহীদ এক ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার হুকুম হলে সে বলবে হে আল্লাহ," আমি তোমার পথে জিহাদ করে শহীদ হয়েছি।

তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন ঃ তোমার উদ্দেশ্য ছিল, লোকে তোমাকে একজন বীরযুদ্ধ বলুক; আর তা তোমাকে বলা হয়েছে। এটাই তোমার পুরস্কার। এই একই ধরনের কথা আলেম, হাজী, কারী ও হাফেজকে ও বলা হবে। (মুসলিম শরীফ)

আত্ম সমর্থন ঃ

আত্ম-সমর্থন বলতে বুঝায়, নিজকে নিজে খুব ভাল মনে করা, নিজের আমলকে বড় মনে করা, এটা একটা দুরারোগ্য ব্যাধি, এ ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগী নিজকে আত্ম গৌরব ও আত্মম্ভরিতার দৃষ্টিতে দেখে এবং অপরকে হীন ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে বিবেচনা করে। এ'ফলে তার ভীতর আমিত্বের ভাব সৃষ্টি হয়। সে আমিত্বের ভাব সৃষ্টি হয়েছিল ইবলীসের মধ্যে। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ

অর্থ ঃ "আমি তার হযরত আদম (আঃ) চেয়ে ভাল, আমাকে তুমি আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছ, আর তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি দিয়ে"[৬৩]

উক্ত ব্যাধির ফলশ্রুতিতেই সমাজে কোন বৈঠক বা আলোচনা সভায় নিজের বড়াই অহংকার ও আত্মসইবড়ার মাধ্যমে স্বীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি, মান মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অপ প্রয়াস চালানো হয়, শীর্ষস্থানীয় হওয়ার বা সভাপতিত্বের আসন পাওয়ার লিপ্সা প্রকাশ করা হয়, কেউ তার কোন কোথার প্রতিবাদ করলে রাগ গোস্সা করা হয়। সে নিজে

Dhaka University Institutional Repository

কাউকে উপদেশ দিলে মনে আঘাত দিয়ে কথা বলে, আর অন্য কেউ তাকে উপদেশ দিলে ঘৃণা করে; মেযাজ খারাপ করে। জেনে রাখ-যে কোন ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর কোন মাখলূকের তুলনায় উত্তম মনে করবে, সে দাম্ভিক; অহংকারী। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আখিরাতের জীবনে আল্লাহর কাছে ভাল, সে-ই প্রকৃত ভাল। আর এটা এমন এক বিষয়, যা অদৃশ্য এবং জীবনের শেষ মুহূর্তের উপর নির্ভরশীল। অতএব, তোমার নিজেকে অন্যের তুলনায় উত্তম মনে করা নিতান্ত মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। বরং তোমার উচিত-অন্যের প্রতি যখন তাকাবে, তখন এ ধারণা এবং মন-মানসিকতা দিয়ে তাকাবে যে, সে তোমার চেয়ে ভাল এবং শ্রেষ্ঠতর। তাহলে মনে হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে না। অহংকার ও দাম্ভিকতা কেই আত্মসমর্থন বলে।

আর-রিসালাতুল-ওয়া'জিয়্যাহ

'আর-রিসা-তুল-ওয়া'জিয়্যাহ' গ্রন্থে গাযালী (রঃ) ওয়াজ ও আ'কীদা সম্পর্কে আলোচনা করেন। আরবী ভাষা থেকে অনুবাদের কিয়দাংশ পেশ করা হলো।

অপরকে ওয়াজনসীহত করা ঃ

'অপরকে ওয়াজ-নসীহত করা' প্রসঙ্গে গাযালী (রঃ) বলেন, ওয়াজ-নসীহত করা তাকেই সাজে, যে নিজে ইল্‌ম ও নসীহত অনুযায়ী আমল ও ইবাদতে অভ্যস্ত থাকে। বস্তুতঃ ওয়াজ করা হচ্ছে নিজে ওয়াজ অনুযায়ী আমল করা যাকাত স্বরূপ। সুতরাং যার আমল ও ইবাদতে ত্রুটি রয়েছে, সে মূলতঃ নেসাবেরই মালিক নয়। অতঃএব, অপরকে ওয়াজ-নসীহত করে সে যাকাত দিবে কি করে? নিজেই আলো থেকে বঞ্চিত অপরজন কি করে তার থেকে আলো পেতে পারে? বক্র কণ্ঠের ছায়া কখন ও সোজা হতে পারে না।

---

[60] আল্ কুরআন, সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত-১২।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ঈসা (আঃ) এর নিকট ওহী পাঠিয়েছিলেন ঃ হে ঈসা! তুমি প্রথম নিজেকে ওযাজ ও উপদেশ প্রদান কর। তোমার প্রবৃত্তি যদি তা গ্রহণ করে, তবে জন সমক্ষে উপদেশ প্রদান করতে পার। অন্যথায় আমাকে তোমার লজ্জা করা উচিত।" হযরত নবী করিম (সঃ) এরশাদ করেছেন।

অর্থ ঃ "তোমাদের জন্য আমি দুটি বস্তু উপদেশ দাতা হিসাবে রেখে যাচ্ছি; তন্মধ্যে একটি হচ্ছে সরব উপদেশদাতা অর্থাৎ আল্ কুরআন। অপরটি হচ্ছে নিরব উপদেশদাতা অর্থাৎ মওত"।

গাযালী (রঃ) নিজকে লক্ষ করে বলেন, আমি আমার নফ্স ও প্রবৃত্তিকে কুরআন ও মৃত্যুর নসীহত পেশ করেছি। সে নসীহতের সত্যতা ও স্বীকার করেছে এবং মুখে ও যুক্তির দৃষ্টিতে মেনে ও নিয়েছে কিন্তু কার্যতঃ বাস্তবায়নের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতা প্রকাশ করেছে।

আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষণা ঃ

অর্থ ঃ তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন করতে চাও। সেই মৃত্যুর সম্মুখীন তোমাদের হতে হবে। অতঃপর তোমরা প্রত্যানীত হবে সেই দৃশ্য-অদৃশ্যের পরিজ্ঞার দরবারে এবং তোমাদের কৃতকর্মের ফলাফল তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে[৬১]।

গাযালী (রঃ) নফ্সকে উদ্দেশ্য করে আরো কিছু নসীহত করছেন, অবশেষে কমপক্ষে কতটুকু ঈমান ও আকীদা ফরজ এ সম্পর্কে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থখানা অত্যন্ত ছোট, কিন্তু আলোচনার সার গর্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

সত্যের সন্ধান

'সত্যের সন্ধান' ইমাম গাযালীর (রঃ) গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'আল-মুনক্বিয মিনায যালাল' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ, ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রে যখন সংঘাত চলছিল। সে মুহূর্তের দাবী অনুযায়ী গাযালী (রঃ) অত্র গ্রন্থ খানা লিখেন, সে সময় মুসলিম জগতে ধর্ম ও চিন্তাক্ষেত্রে ভীষণ সংঘাত ও আন্দোলন চলছিল। এ দিকে মুসলিম পন্ডিতগণ এরিস্টেটল, প্লেটো প্রমুখ গ্রীক দার্শনিকদের গ্রন্থ সমূহের আরবী অনুবাদ দ্বারা প্রভাম্বিত হয়ে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা গুলো যথা-সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ, অস্তিত্ব, তার একাত্ববাদ, পরলোক প্রভৃতি বিষয়কে তৎকালীন দার্শনিক সিদ্ধান্ত দ্বারা বিচার করে এক প্রকার অস্বীকার করেছিলেন।

অপর দিকে মুতাকাল্লিমগণ বা যুক্তবাদি ধর্মতাত্ত্বিকগণ যারা তত্ত্ব এবং অনুমানের উপর নির্ভরশীল। তাঁরা দার্শনিকদের কতগুলো যুক্তিকে স্বীকৃতি দিয়ে তারই সাহায্যে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলোকে সমর্থন ও এ সম্পর্কে দার্শনিকদের মতবাদগুলোকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করতে ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছিল। তৃতীয় আরেকটি দল, যারা বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সময়ে ইসমাইলিয়া, বাতিনিয়াহ, তা'লিমিয়াহ, হাশেমী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। এরা নিজেদেরকে কুরআনের বিশেষ গোপনীয় তথ্যের বাহক বলে দাবী করে। এবং ইসলামের বিধি নিষেধ মৌলিক শিক্ষাগুলোর মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে সেগুলোর মূলোচ্ছেদ করেছিল। ইমাম গাযালী (রঃ) ঠিক সে কঠিন মুহূর্ত আগমনে ঐ সময় গোটা ইউরোপ বাসী সহ বিভিন্ন দলকে সঠিক সঠিক পথের সন্ধান দিতে সক্ষম হন। নচেৎ ধর্ম ও দর্শনের সংঘাতের ফলে যুব সমাজকে মুক্তির পথের সন্ধান দেয়ার আর কোন ব্যবস্থা ছিল। ইমাম গাযালী (রঃ) অত্র গ্রন্থে যে সব বিষয়ে উপর আলোচনা করেন, নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

---

[61] . আল্ কুরআন, সূরা জুমুযা, আয়াত-৮।

Dhaka University Institutional Repository

হটকারীদের ছলনা ও জ্ঞানের বিরোধিতা। সত্য-সন্ধানে ব্রতীদের রকমভেদ। ইল্‌মে কালামের উদ্দেশ্য ও তার ফল। দর্শনে অভিজ্ঞতার কথা। দার্শনিক উপগোষ্ঠী এবং অবিশ্বাসের ধ্বজাধারীদের সম্পর্কে। দার্শনিকদের শাস্ত্র সমূহের বিভাগ, তা'লীম সম্প্রদায় এবং তাদের অনিষ্টকারীতা সম্বন্ধে, সূফীবাদ, নবুয়তের বাস্তবাদিক ও মানবজাতির জন্য এর প্রয়োজনীয়তা, জ্ঞান চর্চা ছেড়ে দেবার পর আবার তাতে ফিরে আসার কারণ। ঈমান বিনাশের কারণ ও তার প্রতিকার, গীতব, গীবতের সংজ্ঞা, গীবতের কারণ। গীবত থেকে আত্মরক্ষার উপায়, আন্তরিক গীবত ও হারাম, গীবত জায়েজ হবার কারণাদি। গীবতের কাফ্‌কারা। চোগলখোরী, দ্বি-মুখী কথা অযথা প্রশংসা, কথা বার্তার সুক্ষ্ম ভুল ভ্রান্তি। চল্লিশ হাদিস, ইহাইমূল কিতাবের আলোচনা বস্তু, নিম্নে বিভিন্ন বিষয়ের উপর কিছু আলোচনা করা হলো।

গাযালী (রঃ) বলেন ঃ 'আমি ভেবে দেখলাম, সত্য-সন্ধানীদের চারটি দলে ভাগ করা যায়।

১) মুতাকাল্লিমুন বা যুক্তিবাদি ধর্মতাত্ত্বিকগণ-যারাতত্ত্ব এবং অনুমানের উপর নির্ভরশীল।

২) বাতেনীয়া বা গুপ্ত, রহস্যবিদ এঁরা কুরআনের গোপনীয় তথ্যের বিশেষ বাহক বলে দাবী করেন।

৩) দার্শনিক যারা গতানুগতিক যুক্তির উপর আস্থাবান।

৪) সুফী-যারা নিজেদেরকে আল্লাহ বিশিষ্ট নির্বাচিত বলে মনে করেন এবং যারা ভাবোম্মাদনা ও বিদ্যদৃষ্টি দিয়ে সত্যের জ্ঞান অর্জন করেছেন বলে মনে করেন।

ইল্‌ম কালামের[৬২] উদ্দেশ্য ও তার ফল ঃ

গাডালী (রঃ) বলেন; ইলমে কালাম থেকে শুরু হল আমার সাধনার। আমি এ নিয়ে প্রভূত পড়াশুনা ও ভাবনা চিন্তাকরি। এসব

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ে যাঁদের মত সর্ববাদী সম্মত ভাবে গৃহীত, তাদের লেখা পড়তে থাকি। নিজেও পরে এ সম্পর্কে দু'চারটে বই লিখি। ভেবে দেখলাম, স্বয়ং পরিপূর্ণ হলেও বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমি আমার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারব না। এক কথায় ধর্মীয় বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে কুফরী-বিদ'আতের হাত থেকে সর্বজন স্বীকৃত সুন্নী মতবাদের পবিত্রতা রক্ষা করা। আল্লাহ তা'আলা তার রসূর মারফতে মানুষের নিকট সে শিক্ষা নাযিল করেছেন যা নশ্বর অনন্ত স্বার্থের বিচারে সত্য। এই বিশ্বাসবোধের মূল মর্মবাণী কুরআন ও হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে।

অতঃপর শয়তান এ সর্বস্বীকৃত মতবাদের বিরুদ্ধে নানা কুমন্ত্রণা বিপদগামীদের প্রদান করেন। বিপথগামীগণ অধীর আগ্রহে মন্ত্রণা শুনল এবং বিশ্বাসবোধের পবিত্রতা বিপন্ন হতে চলল। আল্লাহ কখন এমন একদল ধর্মতাত্ত্বিক লোকদের নিয়োগ করেন যাঁরা সর্বজনস্বীকৃত মতবাদ রক্ষায় ব্রতী হন। বিদ'আত প্রচার কারীদের কলাকৌশল খন্ডন এবং কুরআন ও সুন্নাহর স্বীকৃত বিশ্বাস বোধের উপর হামলা প্রতিরোধের জন্য প্রমাণযুক্ত অস্ত্র দিয়ে তাদের করা হল অনুপ্রাণিত।

ইসলামে কালাম শাস্ত্রের সূচনার ইতিহাস এখানেই। এ শাস্ত্রের পন্ডিতদের অনেকেই, যাঁদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা চলে নবুয়তের বাস্তবতা বিদ'আতী অসারতা প্রমাণ করে সর্বজন স্বীকৃত বিশ্বাস বোধ রক্ষা করতে পেরেছিলেন। অবশ্য এ কাজে তাদের স্বভাবতঃই কতগুলো প্রাথমিক সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়েছে। সেগুলো তাঁরা তাদের প্রতিপক্ষের নিকট থেকে নিয়েছেন। এগুলো তারা দলিল ও সর্বজন স্বীকৃত বিষয় অর্থাৎ হাদীস থেকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যে প্রাথমিক বিষয়গুলো তারা মেনে চলেন বলে জোর গলায় প্রচার করেন। সে সিদ্ধান্ত গুলোর সাহায্যেই প্রতিপক্ষের পরস্পর

---

[62] সত্য-সন্ধানীদেরকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রথম দল 'মুতাকাল্লিমগণ'-মুতাকাল্লিমগণ ইসলামী মৌলিক শিক্ষাগুলোকে সমর্থন করবার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী যুক্তির আসল স্বরূপটি তুলে ধরাই ছিল তাদের আসল কাজ। কিন্তু প্রত্যক্ষ সত্য যে মেনে নেয়। তার কাছে এ ধরণের যুক্তি তর্কের কোন মূল্য নেই। ফল দাঁড়ায় এই যে, ইল্‌মে কালাম আমাকে তৃপ্তি দিতে পারল না। আমি যে সংশয় রোগে ভুগছি। তা থেকে তা আমাকে মুক্তি দিতে পারল না।

এ কথা সত্য যে, পরবর্তীকালে ধর্মতত্ত্বের যে বিকাশ হয়েছে। তাতে এ শাস্ত্র কেবল সুন্নাহকে সমর্থন করেই যথেষ্ঠ থাকতে পারেনি। শুরু হল প্রথম কারণ, পদার্থ আকস্মিক গুণ ও যে নিয়ম এ গুলোকে পরিচালিত করে তার গবেষণা। কিন্তু গবেষণার জন্য পূর্ণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তির অভাবে এতে তারা বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। কাজেই সম্পূর্ণ ভাবে অবিশ্বাসের অন্ধকার বিনাশ করবার মত শক্তি তারা লাভ করেন নি এবং কাটল না। একথা আমি দাবী করছি না যে, আমার বেলায় ঘটল না বলে এর শাস্ত্রে সুফল আর কেউ আহরণ করতে পারেন নি; অবশ্যই করেছেন, কিন্তু তাঁদের বেলায় যা অকাট্য সত্য মনে হয় নি, তা বিশ্বাস করানো হয়েছে।

দর্শনে অভিজ্ঞতার কথা ঃ

দর্শন আলোচনাকালে দেখতে হবে, এর মধ্যে কোনটি নিন্দনীয় আর কোনটি নিন্দনীয় নয়। কোন মতবাদ পোষন করলে তাকে কাফির বলা যায়, আর কোন মতবাদ-পোষণ করলে তা বলা যায় না। কোন মতবাদটি বেদ'আত আর কোনটি বেদ'আত নয়। এছাড়া একথাও জানানো দরকার যে, তারা তাদের ভ্রান্ত মত প্রচলন করার জন্য সত্য পন্থীদের নিকট থেকে কালামের কোন মতবাদটি চুরিকরে বেমালুম তাদের মতবাদের ভীতর ঢুকিয়েছে। আর কি করেনই বা মানুষের মনকে সত্য থেকে বিমুখ করতে সমর্থ হয়েছে। কোন মানদন্ডের সাহায্যে খাঁটি সোনাকে খাদ থেকে আলাদা করা যেতে পারে?

যুক্তির আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং ইল্‌মে কালাম নামে একটি পৃথক শাস্ত্রের সৃষ্টি করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

গাযালী (রঃ) বলে, ইল্‌মে কালাম, অধ্যায় শেষে আমি দর্শন অধ্যায়নে মন দিই, জ্ঞানের যে কোন একটি শাখায় হয়তো পান্ডিতেরা ভূল করে বসলেন। কিন্তু সে ভুল কে আবিস্কার করতে গেলে সেই শাস্ত্রটি সম্পর্কে গভীর অধ্যায়ন দরকার। সে বিদ্যা ঐ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে যারা সবচেয়ে বেশী জানেন, তাদের সমান তো হবেই। বরং আরো বেশী হওয়া বাঞ্চনীয়। কারণ অন্যরা যে গোপন তথ্যটি ধরতে পারে নি। সে তথ্যের মূল সন্ধান করতে হবে। আর তাঁদের প্রশ্নের জবাব ও শুধু দেওয়া যেতে পারে এই ইসলামী শাস্ত্রবিদদের মধ্য আমি এ পদ্ধতি অনুসরণের চিহ্ন পর্যন্ত দেখি নি।

দর্শন খন্ডন করার যেসব ধর্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে এবং তাতে দার্শনিকদের জবাব দেবার জন্য যেসব দার্শনিক তথ্যের অবতারনা করা হয়েছে সেগুলো আমার কাছে পরস্পর বিরোধী এবং ভ্রান্তিপূর্ণ মনে হয়েছে। এগুলো দিয়ে পন্ডিতদেরকে তো নয়ই, সাধারণ লোককে ও ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। আমি গাযালী এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, কোন মতবাদ সম্পর্কে পড়াশুনা না করে সেটি খন্ডন করার স্বপ্ন অন্ধকারে ঢিল মারারই নামান্তর। আমি তিন বৎসর যাবৎ দর্শনের উপর গবেষণা করে এ সিদ্ধান্তে পৌছলাম দর্শন শাস্ত্রের কোন্‌টি মূল বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন আর কোনটি বা বুদ্ধি বিচারের আলোকে সূক্ষ্ম, কোনটি সত্য আর কোনটি ছলনা।

ইমাম গাযালী (রঃ) বলেন, আমি বিভিন্ন মতবাদের একটি বিবরণ দেব, এগুলো বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত শুধু তাই নয়। বিভিন্ন মতবাদের অনুসারীদের সংখ্যা ও অজস্র। মতবাদের বিভিন্নতা সত্ত্বেও একটি জিনিস তাদের সকলের মধ্যেই পাওয়া যায়। "অবিশ্বাস ও ধর্মের প্রতি ঔদাসীন্য"। অবশ্য এর যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়। যেমন ব্যতিক্রম দেখা যাবে প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে। দর্শন শাস্ত্রের প্রথম ও শেষ ব্যক্তিটির মধ্যে। কে কত দূর সত্যের কাছাকাছি যেতে

Dhaka University Institutional Repository

পেরেছেন বা সত্যের নাগাল পানি তারই উপর নির্ভর করবে এ ধরনের তারতম্য বিচার।

দার্শনিক উপগোষ্ঠী ঃ

সংখ্যায় ও প্রকার ভেদে বহু হলেও দার্শনিক পদ্ধতি সমূহকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১. বস্তুবাদীদল ২. স্বভাব ধর্মে বিশ্বাসীর দল ৩. আল্লাহতে বিশ্বাসী দল।

১) বস্তুবাদী দল ঃ তারা জ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান স্রষ্টা এবং বিশ্বব্রহ্মান্ডে পরিচালকের অস্তিত্বে বিশ্বাস পোষণ করে না। তাদের মতে, পৃথিবী আদিকাল থেকে চলছে এবং তার জন্য কোন স্রষ্টার বীর্যের দরকার হয় নি। বীর্য থেকে জীবগনের জীবগণ থেকে অনাদিকাল এই প্রক্রিয়াই চলছে এবং চলতে থাকবে যাঁরা এমতে আস্থাবান তারা নাস্তিকের দলভূক্ত।

বস্তুবাদ বা জড়বাদ ঃ বস্তুবাদ হচ্ছে এমন মতবাদ, যা জড় বা বস্তুকে বিশ্বজগতের আদি সত্ত্বা বলে মনে করে। গতি হচ্ছে বস্তুর ধর্ম। বিশ্বজগতের যাবতীয় বস্তু জড় বা পরমানুয আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলে সৃষ্টি হয় এবং বিশ্বজগত কতকগুলো প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। নিম্নে বস্তুবাদের কতগুলি বৈশিষ্ট আলোচনা করা হল[৬৩]।

ক) এ জগতের যাবতীয় বস্তুই জড়ের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলে উদ্ভুত হয়। জড়বাদের মূল বক্তব্য এই যে, এ জগতের যাবতীয় বস্তুরাই মূল উপাদান জড় বা পরমাণু ও তার গতি। আর জাগতিক বস্তু সৃষ্টি করতে জগতকে কতকগুরো প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকতে হয়।

---

৬৩. মুহাম্মদ আবদুল বারী, দর্শনের কথা, ঢাকাঃ হাসান বুক হাউস, ১৯৭৩, পৃ. ১৩৫-১৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

খ) জড়বাদ ভাববাদের সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ। কারণ জড়বাদে কোন অলৌকিক বা অধ্যাত্মিক শক্তির স্থান নাই। প্রাকৃতি বা যান্ত্রিক নিয়মে এ জগতের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করাই জড়বাদের প্রধান ধর্ম। এ দিক থেকে দেখা যায়, আত্মার অস্তিত্ব, অমরত্ব, পরম মূল্য। ইশ্বর ইত্যাদির ধারণা জড়বাদের দিক থেকে সম্পূর্ণ অলীক বা মিথ্যা।

গ) প্রত্যক্ষণই জ্ঞান লাভের একমাত্র পথ এবং যা প্রত্যক্ষণের বিষয় নয়, তার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। তাই একমাত্র বস্তু অস্তিত্ব আছে, কেননা বস্তুকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি।

ঘ) বস্তুবাদ বস্তুকে জগতের আদিম উপাদান বলতে গিয়ে এবং বস্তুকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে নীতি। ধর্ম, পরমমূল্য, ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রভৃতির মূলে কুঠারাঘাত করেছে। বস্তুবাদের মতে, ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা নেই, কেননা পূর্ববর্তী বা অতীত ঘটনাই ব্যক্তির কার্যকে পরিচালিত করে। এখানে একটা কথা হলো। মানুষের যদি কোন ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকে, তা হলে ভাল, মন্দ, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি নৈতিক দায়িত্বের কোন প্রশ্নই-ব্যক্তির উপর আরোপ করা যায় না। আর এর ফলে নীতি, ধর্ম, পরম মূল্য প্রভৃতি মানুষের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে।

২) স্বভাব ধর্মীয় দল ঃ এরা প্রকৃতি এবং জীব ও উদ্ভিদ জগতের বিস্ময়কর লীলা বৈচিত্র আলোচনা করে থাকেন। শরীর বিদ্যার সাহায্যে প্রাণী দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণ করে আল্লাহর বিস্ময়কর সৃষ্টি ও জীবদেহে তাঁর প্রজ্ঞার বিকাশ দেখে এ দলভূক্তরা একথা মানতে বাধ্য হয়েছেন যে, স্রষ্টা একজন নিশ্চয়ই বর্তমান। সে বিজ্ঞ স্রষ্টা সব কিছুর পরিণতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। শরীর বিদ্যা বা প্রাণী দেহের বিশেষ করে মানুষের উন্নত গঠন ও তার দেহের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করে ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলার মহিমায় মুগ্ধ হয়নি এমন কেউ থাকতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু তাদের নৈসর্গিক গবেষণার ফলে তারা মনে করে বসলেন যে, কোন প্রাণীর অস্তিত্ব চরম ভাবে নির্ভর করে তার অঙ্গ প্রতঙ্গের যথাযথ সমতার উপর। তাদের মতে, প্রাণীদেহের বিলুপ্তির সাথে সাথে তাদের এই সমতা ও বিলুপ্ত হয়। কারণ দেহ ও সমত অবিচ্ছিন্ন। তারা মনে করেন, যে জিনিস লোপ পেয়েছে তার পুনরস্তিত্ব অচিন্তনীয়। এক কথায় তারা অমরত্বের কথা অস্বীকার করেন; ফলে তারা বেহেশত, দোযখ পুনরুত্থান এবং শেষ বিচার সম্পর্কে আস্থাহীন হন। এদের ও নাস্তিক বলে অভিহিত করা উচিত। কারণ আল্লাহ তার রসূল ও শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে আস্থাবান না হয়ে কেবল আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করলেই সত্যিকার বিশ্বাসীর মর্যাদা অর্জন করা যায় না। তাঁরা যদি ও আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর যাবতীয় গুণাবলীর কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন, তবু ও তাঁরা বুদ্ধি বিচার দ্বারা কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে নারায।

৩) আল্লাহতে বিশ্বাসীর দল ঃ এদের মধ্যে প্রথমেই অন্তর্ভূক্ত করতে হবে সক্রেটিসকে। সক্রেটিসই ছিলেন প্লাটোর শিক্ষা গুরু, যেমন প্লাটো ছিলেন এ্যারিস্টটলের। সক্রেটিসই তাঁর শিষ্যদের জন্য তর্কশাস্ত্রের আইন কানুন গুলো প্রণয়ন করে দিয়ে যান। শুধু তাই নয় বিজ্ঞান শাস্ত্রকে তিনি করলেন সুসংহত এবং যা ছিল দুর্জ্ঞেয় তাকে করলেন মানুষের বুদ্ধির গোচর, সক্রেটিস পন্থীরা অন্য অন্য দুই মতবাদে বিশ্বাসী অর্থাৎ বস্তুবাদ ও স্বভাব ধর্মে বিশ্বাসীদের অনুসৃত নীতি অস্বীকার করলেন। কিন্তু এই দুই দলের ভ্রান্ত ও বিকৃত মতবাদ উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে তাঁরা কিছু এমন সব যুক্তির আশ্রয় নেন, যা তাদের নেওয়া উচিত হয় নি।

দার্শনিকদের শাস্ত্র সমূহের বিভাগ ঃ

দর্শন শাস্ত্রকে ছ'টি ভাগে ভাগ করা যায়। ১. গণিত শাস্ত্র ২. পদার্থ বিদ্যা ৩. তর্কশাস্ত্র ৪. অধিবিদ্যা ৫. রাজনীতি বিদ্যা ৬. নৈতিক দর্শন।

Dhaka University Institutional Repository

১) গণিত শাস্ত্র ঃ গণিত শাস্ত্রের আওতায় পড়ে গণনা, জ্যামিতি ও মহাশূন্য সম্পর্কীয় জ্ঞান। ধর্মীর বিজ্ঞানের সঙ্গে গণিত শাস্ত্র সম্পর্কহীন। কারণ এ শাস্ত্র ধর্মের পক্ষে যেমন, তেমনি ধর্মের বিরুদ্ধে ও কোন কিছু প্রমাণ করে না। গণিত শাস্ত্রের ভিত্তি হচ্ছে মৌলিক প্রমাণাদির উপর। সে-সব প্রমাণ সম্পর্কে একবার সুস্পষ্ট ধারণা হলে তাকে আর নাকচ করে চলে না। অবশিষ্ট গণিতশাস্ত্র দু'ধরণের হানিকর প্রবণতা সৃষ্টি করে।

ক) তার প্রমাণটি হল এই শাস্ত্র অধ্যয়নকারীদের কেউ কেউ প্রমাণ তথ্যের সূক্ষতা ও সুস্পষ্ঠতা দেখে মোহিত হয়ে যায়। দর্শন সম্পর্কে তাদের আস্থা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মনে করেন যে, দর্শনের অন্যান্য শাখা ও বোধ হয় গণিত শাস্ত্রের মতই সুস্পষ্ট ও খাঁটি প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

খ) দ্বিতীয় অনিষ্টের মূলে রয়েছেন সেই সকল মুসলমান যাদের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না। অথচ অজ্ঞানতাহেতু তাঁরা মনে করেন। ধর্মকে রক্ষা করার সর্বোত্তম উপায় বুঝি সকল বৈজ্ঞানিক সত্যকে অস্বীকার করা। বিজ্ঞানের পন্ডিতগণকে তারা ভ্রান্ত পথে চালিত বলে মনে করেন, চন্দ্র সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত তাদের মতবাদ অস্বীকার করেন এবং ধর্মের নামে তাঁদের নিন্দা করেন। এসব অভিযোগ ক্রমান্বয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দার্শনিকদের কানে ও সে কথা পৌঁছে। দার্শনিক ভাল করে জানেন এসব মতবাদ অভ্রান্ত সুতরাং তার অবস্থা হ্রাস পাওয়া দুরে থাকুক আরো বাড়তে থাকেদ বরং তিনি ভাবে অজ্ঞানতা এবং বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি অস্বীকার করাই বুঝি ইসলাম ধর্মের ভিত্তি; ফলে দর্শনের প্রতি তার টান যতই বাড়তে থাকে ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণা ততই বেশী হতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে এ কথা ভাবা খুবই অন্যায় হবে যে, মৌলিক বিজ্ঞানকে অস্বীকার না করে বুঝি ইসলামকে রক্ষা করা যায় না। ধর্মীয় অনুজ্ঞায় এমন কিছু নেই যাতে এ বিজ্ঞানকে সমর্থন বা অস্বীকার করা হয়েছে। আবার বিজ্ঞানের ও ঐ কথা; ধর্মের সঙ্গে তার কোন রেষারেষি নেই।

২) তর্ক শাস্ত্র ঃ এ শাস্ত্রেও ধর্মের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন মত প্রকাশ করা হয় নি। বিভিন্ন প্রমাণ ও ন্যায় বাক্য, একটি ন্যায় বাক্যের প্রস্তাবের মধ্যে যে শর্ত থাকা উচিত, তা প্রস্তাবগুলোর সংযুক্তির ধারা, উত্তম সংজ্ঞা নির্ধারণের নিয়ম এবং উহা নির্ধারণের উৎকৃষ্ট পন্থা এ সবই তর্কশাস্ত্রে অধ্যায়ন করা হয়ে থাকে।

৩) পদার্থ বিদ্যা ঃ বিশ্ব সৃষ্টির উপাদান নিয়ে পর্যালোচনা করাই পদার্থ বিদ্যার উদ্দেশ্য। আকাশ, নক্ষত্র ও তন্নিন্যস্থ বস্তু সমূহের উপাদান আমিশ্রবস্তু যেমন বায়ু, মাটি, পানি, আগুন এবং মিশ্রবস্তু যেমন প্রাণী, উদ্ভিদ ও খনিজ দ্রব্য তন্নিম্নস্থ উহাদের পরিবর্তনের নূতন বস্তুর রূপ পরিগ্রহের ও মিশ্রনের কারণ প্রভৃতি সম্পর্কে অধ্যায়ন এ শাস্ত্রের লক্ষ্য।

৪) অধিবিদ্যা ঃ দার্শনিকদের ভ্রান্তি সৃষ্টির এটি হচ্ছে একটি উর্বর ক্ষেত্র। তর্কশাস্ত্রে অকাট্য যুক্তিগুলো, কঠোর নিয়ম ও শর্তগুলো পালনে তারা এ ক্ষেত্রে অসমর্থ, দর্শন নিয়ে পড়াশুনা করতে গেলে তাদের পরস্পরের মধ্যে যে সংঘাত দেখা দেয়, তার মূল কারণ এখানেই দর্শনের যে পদ্ধতিটা মুসলিম পন্ডিতের মতবাদের খানিকটা কাছাকাছি তা হলো ফারাবী এবং ইব্নসীনা কর্তৃক বর্ণিত এ্যরিস্টটলের নীতি। কিন্তু দর্শনে যে সকল ভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়। তা মোট কুড়িটি নীতিতে ভাগ করা চলে। তার মধ্যে তিনটি কুফরী পর্যায়ে এবং বাকী সতেরটি বিদ'আত।

Dhaka University Institutional Repository

যে তিনটি কুফরীর পর্যায় তা উল্লেখ করা হলো-

ক) দার্শনিকগণ বলেন, দেহের পুনরুত্থান নেই, কেবল আত্মাই পুরস্কৃত হবে বা শাস্তিভোগ করবে ভবিষ্যতের শাস্তি সে কারণে শুধু আত্মার, দেহের নয়, আত্মা সম্পর্কে তারা যা বলেছেন তা ঠিক, আত্মার অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু দৈহিক শাস্তিকে অস্বীকার করে গিয়ে তাঁরা ভুল করেছেন এবং করতে গিয়ে তারা ইসলামী বিধানেরই অবাধ্যতা করেছেন।

খ) আল্লাহ শুধু সার্বিক জ্ঞান ব্যাযন, বিশেষ অর্থাৎ খুঁটিনাটি ব্যাপার গুলো জানেন না। এটা একটা একান্তই ইসলাম বিরোধী উক্তি। কুরআনে পরিস্কার ভাবে বলা হয়েছে; আকাশ বা পৃথিবীতে এক পরমানু পরিমান ও তাঁর জ্ঞানের অগোচর থাকে না।

গ) তারপর দার্শনিকেরা বলেন, বিশ্ব অনন্তকাল থেকে বলে আসছে। আর এর কোন লয় নেই।

৫) রাজনীতি-বিজ্ঞান ঃ এ শাস্ত্রের পন্ডিতরা নশ্বর বস্তু বা রাজকীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী কতগুরো নিয়ম প্রণয়নের মধ্যেই তাদের কাজ সীমাবদ্ধ রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা তার প্রেরিত নবীদের কাছে যে সমস্ত গ্রন্থ নাযিল করেছেন ঐ সমস্ত গ্রন্থ থেকে এবং যুগ যুগান্তর ধরে প্রাচীন নবী ও সাহবীদের যে সব উক্তি আসছে সেগুলো থেকেই তারা অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেছেন।

৬) নৈতিকদর্শন ঃ এ শাস্ত্রের পন্ডিতগণ আত্মার বিভিন্ন গুণের সংজ্ঞা দান। শ্রেণীগত, জাতিগতভাবে তাদের পূর্ণবিন্যাস ও সেগুলো আয়ত্বে আনার ও নিয়ন্ত্রণ করার উপায় বর্ণনা করেছেন। এ পদ্ধতি তাঁরা ধার করেছেন সূফীদের কাছ থেকে। দার্শনিকেরা এসব তথ্য তাঁদের

Dhaka University Institutional Repository

নিজ নিজ মতবাদে ব্যবহার করেছেন। এমনি ভাবে ব্যবহার করেছেন যাতে তাদের মতবাদ সুন্দর প্রতীয়মান এবং তাদের মিথ্যা ভাষণ সর্বসাধারণের নিকট গ্রাহ্য হয়।

ইহয়্যা 'উলুমিদ-দ্বীন ঃ

অর্থাৎ ধর্মীয় বিজ্ঞানের পুর্নজন্ম, ইমাম গাযালী (রঃ) অত্র গ্রন্থখানা ও আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ। ইসলাম জগতে তাঁর এ গ্রন্থটি বিশেষ ভাবে সমাদৃত। এ গ্রন্থটি চার খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ড ইবাদত সম্পর্কীত, ২য় খন্ড ব্যবহার সম্পর্কীত ৩য় খন্ড বিনশন সম্পর্কীত, ৪র্থ খন্ড পরিত্রাণ সম্পর্কীত।

১ম খণ্ডের বিষয়সমূহ ঃ বিদ্যার্জ্জন, ইমানের বিষয়বস্তু, দৈহিক পরিবত্রতার গূঢ়তত্ত্ব, নামাজের গূঢ় তত্ত্ব, জাকাতের গূঢ়তত্ত্ব, রোজার গূঢ় তত্ত্ব, হজ্জের গূঢ় তত্ত্ব, কুরআন পাঠের নিয়মাবলী, জিকর, দোয়া ও ওজিফার নিয়মাবলী, দৈনন্দিন কর্তব্য কার্যের ধারাবাহিক সময় নিরূপন।

২য় খণ্ডের বিষয়সমূহ; পানাহারের নিয়মাবলী, বিবাহ সংক্রান্ত নিয়মাবরী। জীবিকা উপার্জ্জনের রীতিনীতি। হালাল ও হারাম, লোকের সহিত সৎসর্গ ও আচার ব্যবহার, নির্জন বাসের নিয়মাবলী, গান ও সঙ্গীত, সৎকার্যে উপদেশ ও অসৎকার্য্যে নিষেধ। জীবন যাপন প্রণালী এবং নবীদের স্বভাব চরিত্র।

৩য় খণ্ডের বিষয়সমূহ ঃ কালবের অত্যাশ্চর্য কার্যাবলীর ব্যাখা আত্মসংযম উদরের ও কামরিপুর অপকারিতা, রসনার বিপদ, ক্রোধ, ঈর্ষা, বিদ্বেষের অনিষ্টকারিতা, সংসাবের নিন্দা, বিষয়-সম্পত্তি ও কৃপণতার নিন্দা, রিয়া ও খ্যাতির নিন্দা, অহংকার ও আত্মাভিমান, আত্ম-প্রবঞ্চনার নিন্দা।

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ খণ্ডের বিষয়সমূহ ঃ তওবা, ছবর ও শোকর, শাস্তির ভয় ও রহমতের আশা, অল্পে পরিতৃপ্তি ও বৈরাগ্য অবলম্বন, তওহীদ ও আল্লাহর উপর ভরসা, ভালবাসা প্রেম ও সন্তোষ, নিয়ত, সত্যবাদিতা ও অকপটতা, মোরাকাবা, আত্ম বিচারে প্রবৃত হওয়া। সৃষ্টি নৈপুন্য সম্বন্ধে চিন্তা করা। মৃত্যু ও মৃত্যুর অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করা।

বিদ্যা অর্জন ঃ

জ্ঞান-অর্জন শব্দদ্বয়কে আরবীতে 'তালাবুল ইল্‌ম' বলা হয়। 'ত্বলাবুন' শব্দের আভিধানিক অর্থ তালাশ করা। অনুসন্ধান করা, অন্বেষণ করা, অর্জন করা, আকাংখা করা। আর 'ইলমুন' শব্দের অর্থ অহীর জ্ঞান, বিদ্যা, সততরাং 'ত্বলাবুল ইল্‌ম' অর্থ অহীর জ্ঞান অর্জন করাকে বুঝানো হয়।

ইসলামের পরিভাষায় ঃ আল্ কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক তথা সত্য মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় এবং হালাল-হারাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করাকে 'তালাবুল ইল্‌ম' বা জ্ঞান অর্জন করা বুঝানো হয়।

কুরআনের প্রথম বাণী 'ইক্বরা' অর্থ পড়, তোমার প্রভূর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। আয়াতের মর্মানুযায়ী বুঝা যায়, মানুষকে তার প্রভূর সম্পর্কে জানার জন্য প্রথমে জ্ঞান অর্জন করা অত্যাবশ্যক। জ্ঞান মানুষের অন্তরকে সত্যের আলোকে আলোকিত করে এবং তার অন্তর হতে সকল প্রকার মূর্খতা ও অজ্ঞানতাকে দূরীভূত করে মহান প্রভূর সৃষ্টির রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে সাহায্য করে। জ্ঞানের বলেই মানুষ সৃষ্টির সেরা এবং বিশ্বে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছে। জ্ঞানের অভাবে মানুষ স্বীয় পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা; আল্লাহ তায়ালা, ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত আলেমগণ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই[৬৪]।

আলেমদের সম্মান, পদমর্যাদা ও বুজর্গী কত উচ্চে, ইহা হতেই যথেষ্ট বুঝা যায়। হযরত আবদুল্যাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) রাসুল (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আলেমদের পদমর্যাদা মোমেনদের পদ মর্যাদা থেকে সাতশতগুন বেশী। জ্ঞানের দ্বারা যেমন দুনিয়াতে পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায়, তেমনি পরকালে ও বিদ্যার দ্বারা পদ মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, ব্যবহারিক জীবনে আল্লাহ আদেশকে আলেমদের ইজতেহাদ উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ আদেশকে প্রচার করার জন্য তাদের পদ মর্যাদা নবীদের পদমর্যাদার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। এ অধ্যায় গাযালী (রঃ) বিদ্যা অর্জনের গুরুত্বের উপর আলোচনা করেছেন।

ইমানের বিষয়বস্তু ঃ

আল্লাহ-তা'আলা এক অদ্বিতীয়। তাঁর অস্তিত্বে অদ্বিতীয়। তার কোন শরীক নাই। তিনি একক, তার কোন সাদৃশ্য নাই। তিনি অভাব শূন্য, তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তিনি সর্বেসর্বা তার কোন অংশিদার নাই। তিনি অনাদি তার কোন প্রথম নাই। তার কোন প্রারম্ভ নাই। তিনি চিরস্থায়ী অনন্ত ও অসীম, সর্বক্ষণ বিরাজমান, তার কোন বিরাম নাই। তিনি অনন্ত কাল স্থায়ী। তার কোন শেষ নাই। তিনি প্রথম, শেষ, তিনি প্রকাশ্য তিনি গুপ্ত এবং সর্ব বিষয়ে তিনি মহাজ্ঞানী। সকলই তার মুষ্টির ভিতর। তিনি পৃথিবী ও পাতালের সৃষ্টি কারী। তার নিকট হতে নেয়ামত এবং করুণা সৎবান্দাদের উপর কেয়ামতের দিন বর্ষিত হবে এবং করুণা প্রাপ্ত লোকগণ তার নিকট হতে পূর্ণ নিয়ামত পাবে।

---

[৬৪] আল্ কুরআন ঃ সুরা আল ইমরান, আয়াত-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

তার স্বত্তা ও ক্ষমতায় বিশ্বাস স্থাপন ঃ

মহান আল্লাহ জীবিত, শক্তি শালী, পরাক্রমশালী, ধ্বংসকারী, দোষ-ত্রুটি ও ব্যর্থতা হতে মুক্ত। তাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না। মৃত্যু তার নাই। তিনি সমস্ত জগতের ফেরেশতাদের, সম্মানের এবং সর্ব ক্ষমতার মালিক। ক্ষমতা, সৃষ্টি, ধ্বংস, 'আমর তারই। সমস্ত সৃষ্টি তার মুষ্টির ভিতর ধ্বংসশীল, তিনি সৃষ্টিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তিনি নব সৃষ্টিতে অদ্বিতীয়। তিনি সৃষ্টির সৃষ্টিকারী। সৃষ্টজীবের কাজ-কর্ম, তাদের রিজিক এবং মৃত্যু তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তার শক্তি হতে রেহাই পাওয়ার কারো উপায় নাই। ঘটনার পরিবর্তন তার কুদরতের বহির্ভূত নহে। তার শক্তি গণনার বহির্ভূত।

তার জ্ঞানে বিশ্বাস স্থাপন ঃ

তার জ্ঞান সীমার বহির্ভূত, সকল জিনিসের সম্বন্ধেই তিনি জ্ঞাত। পৃথিবীর অতল তল হতে সর্বোচ্চ আসমান পর্যন্ত যা যা ঘটে, তা জ্ঞানের ভিতর, তিনি সর্বজ্ঞানী, আসমান ও জমিনের ভিতর ক্ষুদ্র জিনিস ও তার জ্ঞানের বহির্ভূত নয়। বরং তিনি ঘোর অন্ধকার রাত্রে শক্ত পাথরের উপর চলাচলকারী পিপীলিকার বিষয় ও জ্ঞাত আছেন। প্রকাশ্য ও গুপ্ত সকলই তার জ্ঞানের ভিতর। মনের কুমন্ত্রনা ও চিন্তাধারা সকলই তার জ্ঞানের ভিতর। তার জ্ঞান অনাদি, তার কোন বৃদ্ধি ও হ্রাস নেই। তার জ্ঞান দোষ-ত্রুটি বির্বাজ্জিত।

তার ইচ্ছায় বিশ্বাস স্থাপন ঃ

মহান আল্লাহ সৃষ্টির ইচ্ছাকারী, ঘটনার সৃষ্টিকারী, তার রাজত্বের ভিতর ক্ষুদ্রও বৃহৎ, ভাল ও মন্দ্র, উপকারী বা অপকারী, ঈমান বা কুফরী, জানা বা অজানা, লাভ বা লোকসান, পাপ বা পূণ্য কোন কিছুই তার হুকুম, তার কুদরত। তার হিকমত এবং তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত অস্তিত্বে আসে না। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। যা ইচ্ছা করেন না, তা হয় না। দর্শনকারীর চক্ষুর পলক বা দেলের হঠাৎ চিন্তা তার ইচ্ছার বহির্ভূত

Dhaka University Institutional Repository

নহে, বরং তিনি প্রথম এবং পুনঃপুনঃ সৃষ্টিকারী। তিনি যা ইচ্ছা করেন। তিনি তাহাই করেন। তার হুকুমের পরিবর্তন নেই, তার আদেশের প্রতিবন্ধক নেই। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তিনি তাই করেন।

তাঁর শ্রবন ও দর্শনে বিশ্বাস ঃ

মহান আল্লাহ দর্শনকারী ও শ্রবনকারী। তার দর্শন ও শ্রবণ সর্বব্যাপী। কোন জিনিস অতি গুপ্ত হলে ও তার শ্রবন হতে সরে যায় না। কোন দেখিবার জিনিস অতি সূক্ষ্ম হলে ও তার দৃষ্টি বহির্ভূত নহে। দূরত্ব তাঁর শ্রবন ও দর্শনকে বাঁধা দেয় না। দূরত্ব ও নৈকট্য তার নিকট একই সমান। অন্ধকার তার দৃষ্টিকে ব্যর্থ করে না। তিনি চক্ষু ব্যতীত দেখেন, কর্ণ ব্যতীত শুনেন, দেল ব্যতীত জ্ঞান রাখেন, হাত ব্যতীত ধরেন, এবং যন্ত্র ব্যতীত সৃষ্টি করেন। তার গুন সৃষ্টির গুনের তুল্য নহে, যেরূপ তার অস্তিত্ব সৃষ্টির অস্তিত্বের তুল্য নহে।

তার কালামে বিশ্বাস ঃ

আল্লাহ তা'আলা কথোপকথন করেন। তার কালাম অনাদি, তার স্বত্ত্বার সহিত অনাদি, সৃষ্টির কথোপকথনের সহিত তার সাদৃশ্য নেই। তাঁর কালামের স্বর নেই, বায়ুর চলাচলের সহিত ইহার সম্পর্ক নেই। শব্দের ও ভাষার সাহায্য লওয়া হয় না। কুর'আন, তৌরাত, ইনজিল, জাবুর তাঁর রাসুল গণের উপর প্রেরিত কিতাব। কুর'আন রসনা দ্বারা পড়া হয়, কাগজে লেখা হয় এবং হৃদয়ে কণ্ঠস্থ করা হয়। এতৎসত্ত্বে ও ইহা অনাদি, আল্লাহর অস্তিত্বের সহিত বিদ্যমান আছে। ইহা হতে পৃথক হতে পারে না।

তার কার্য্যে বিশ্বাস স্থাপন ঃ

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কেহ কোন কার্য্যের সৃষ্টিকর্তা নহে এবং কোন কিছু তার বিচারের বহির্ভূত নহে। প্রত্যেক বস্তুই তিনি উৎকৃষ্ট রূপে ও আকারে সৃষ্টি করেছেন। অন্য কোন রূপ বা আকার উহার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

উৎকৃষ্ট হতে পারে না। তার কার্যের বিষয়ের তিনি মহাজ্ঞানী এবং হুকুমের বিষয়ে তিনি সুবিচারক।

কবর আজাব ঃ

করব আজাবকে সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং আল্লার ইচ্ছানুযায়ী শরীর ও রুহের উপর সুবিচারের বিশ্বাস করা এক কথা অদৃশ্যের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা।

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার গূঢ়তত্ত্ব ঃ

রাসুল (সঃ) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব প্রদান করেন। রাসুল (সঃ) বলেন, 'পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, তাই তিনি পবিত্রতাকে ভালবাসেন। পবিত্রতার ভিতর চারটি বিষয় আছে। প্রথমত, প্রকাশ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অপবিত্রতা ও নাপাকী হতে পবিত্র করা; দ্বিতীয়ত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহ ও দোষ ত্রুটি হতে পবিত্র করা; তৃতীয়ত; মন্দ স্বভাব ও নিন্দ্রনীয় অভ্যাস হতে মনকে পবিত্র করা; চতুর্থ আল্লাহ ব্যতীত অন্য জিনিস হতে মনকে পবিত্র করা, পবিত্রতার প্রত্যেক বিষয়ই আ'মলের অর্ধেক।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর মারফত অর্জন হয় না যে পর্যন্ত দেলকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য জিনিস হতে পবিত্র করা না হয়। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-'বল, 'আল্লাহ, তারপর তাদিগকে তাদের অনর্থক কথার ভিতর ছাড়িয়া দাও, তাতে তারা খেলতে থাকুক[৬৫]।

কেননা একই দেলের ভিতর দু'টি জিনিস থাকতে পারে না। আল্লাহ কোন মানুষের ভিতর দু'টি দেল সৃষ্টি করেন নাই। দেলের আ'মলের পরোক্ষ উদ্দেশ্য প্রশংসনীয় গুণাবলীর দ্বারা এবং শরীয়তের ধর্ম-বিশ্বাসের দ্বারা ইহাকে মজবুত করা। ইহা প্রকাশ যে দেল এ' সকল

Dhaka University Institutional Repository

গুনের দ্বারা গুনান্বিত হবে না যে পর্যন্ত দেলের ভিতর মন্দ দোষাবলী ও ফাছেদ ধর্ম-বিশ্বাস থাকে। মানুষ যে পর্যন্ত মন্দ দোষগুলি হতে অন্তরকে পবিত্র না করবে। এবং সংগুনাবলীর দ্বারা ইহাকে মজবুত না করবে। সে পর্যন্ত সেই প্রকৃত পবিত্রতায় পৌঁছতে পারবে না। সে যে পর্যন্ত হারাম দ্রব্য হতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে পবিত্র না করবে এবং ধর্ম-কাজ দ্বারা উহাদিগকে মজবুত না করবে, সে পর্যন্ত অন্তরকে পবিত্র করতে পারবে না। উদ্দেশ্যে যতই সম্মান জনক হবে, ততই তার পথ দুর্গম এবং দীর্ঘ হবে।

যার অর্ন্তদৃষ্টি এ সকল দরজার তারতম্য দর্শনে অন্ধ, সে পরিত্রার উপরোক্ত বিষয় চতুষ্টয় সম্বন্ধে বুঝবে না। শুধু সে পবিত্রতার নিম্নতম বিষয় সম্বন্ধে বুঝবে। তাহা মগজের সম্পর্কে মস্তকের খুলীর ন্যায়। তদ্রুপ অন্য বিষয়ের তুলনায় প্রকাশ্য পবিত্রতা সে বুঝতে পারে, ইহাই চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করে, ইহার পথে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করে এবং নিজের কাপড় চোপড় পরিস্কারে, অন্যান্য প্রকাশ্য পরিস্কার পরিচ্ছন্নতায় এবং প্রচুর পানি অন্বেষণে শয়তানের কুমন্ত্রনার কারণে সমস্ত সময় নষ্ট করে। বিকৃত বুদ্ধির কারণে যে এই ধারণা করে যে, সম্মানজনক পবিত্রতা শুধু এ বাহ্যিক পবিত্রতা।

প্রাথমিক মুসলমানদের স্ববাব, চরিত্র এবং তাদের সমস্ত চিন্তা ও পরিশ্রম শুধু অন্তরের পবিত্রতার জন্য ছিল এবং প্রকাশ্য পবিত্রতায় তারা শিথিল ছিল। এমন কি হযরত ওমর (রাঃ) এত উচ্চ পদে সমাচীন থাকা সত্ত্বেও। তিনি খ্রীষ্টান এক স্ত্রী-লোকের পাত্র হতে পানি লয়ে অজু করেছিলেন। সাহাবীগণ সময় সময় খাওয়া-দাওয়ার পর চর্বির মিশ্রিত হাত ধুইতে পারতেন না। বরং তাদের অঙ্গু'লী সকল পায়ের তলায় মুছিয়ে লইতেন। সাবান ব্যবহারকে তারা বেদ'আত মনে করতেন। তারা মসজিদের ভিতর মাটির উপর নামায পড়তেন এবং নগ্নপদে পথে

[৬৫]. আল্ কুরআন, সূরা আল্-আনয়াম, আয়াত-৯১।

Dhaka University Institutional Repository

বিচরণ করতেন। তাদের শরীর ও মাটির মধ্যবর্তী আর কোন বিছানা ছিল না।

নামাজ ঃ

গাযালী (রঃ) বলেন, আমি অতঃপর নামাজের বর্ণনা করিতেছি। নামাজ ধর্মের খুঁটি এবং ধর্ম বিশ্বাসের রক্ষা কবচ এবং মূল এবং ধর্ম কাজের শীর্ষ স্থানীয়। তিনি নামাজের সাতটি দিকের উপর আলোচনা করেন। নামাজের ফজিলত, নামাজের বাহ্যিক কার্য্যের ফজিলত, নামাজের আভ্যন্তরীন কার্য্যের ফজিলত, ইমামতী, জুময়ার নামাজ, নামাজ সম্বন্ধে বিভিন্ন মাস'আলা, ফরজ ব্যতীত অন্যান্য নামাজ।

ফরজ নামাজের ফজিলত ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয়ই নামাজ মোমেনদের উপর সময় নির্দিষ্ট ফরজ। রাসুল (সঃ) বলেছেন, বান্দার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আল্লাহ তা'আলা ফরজ করেছেন, যে তা পড়ে এবং তার কার্যাবলী হতে কোন কিছু ও বাদ দেয় না। আল্লাহর নিকট হতে তার জন্য একটি প্রতিজ্ঞা আছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। যে ব্যক্তি তা পড়ে না তার জন্য আল্লাহর নিকট হতে কোন প্রতিজ্ঞা নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারেন[৬৬]।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, যে পর্যন্ত কেহ কবিরা (বড়) গুনাহ না করে। সেই পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ তার গুনাহকে মোচন করেন[৬৭]। অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে, হে আবু হরায়বাহ, তোমার পরিজন বর্গকে নামাজ পড়তে আদেশ দেও, কেননা আল্লা তা'আলা

---

[66] অত্র হাদিস খানা হযরত ওবাদাতা ইবন সামেত (রঃ) হতে বর্ণিত বোখারী।
[67] হযরত আবু হরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, বোখারী।

Dhaka University Institutional Repository

কোথা হতে তোমাকে রিযিক দিবেন তা তুমি ধারনা ও করতে পারবে না।

কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম যে আমল উপস্থিত করা হবে। তা হবে নামাজ। যদি তা সম্পূর্ণ বলে দেখা যায়। তা কবুল করা হবে এবং অবশিষ্ট আমল উপস্থিত করা হবে। যদি তা অসম্পূর্ন পাওয়া যায়। তা তার নিকট ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তদ্রুপ অন্যান্য আমল ও ফিরিয়ে দেয়া হবে[৬৮]।

"ইহয়্যা-উলুমিদ-দ্বীন" গ্রন্থের ব্যাপক আলোচনার সামান্য কিছু আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থখানা অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। যা সকলেই অধ্যায়ন করা একান্ত দরকার।

মনখুল ঃ

ফিকাহ শাস্ত্রবিদ আল্লামা আহমাদ ইব্নে মুহাম্মদ বায়কানির নিকট ইমাম গাযালী (রাঃ) ফিক্হ শাস্ত্রের অস্বাভাবিক জ্ঞান অর্জন করেন। যার ফলশ্রুতিতে তিনি প্রথমেই ফেকাহ শাস্ত্রের মূলনীতির উপর "মনখুল" নামক কিতাব রচনা করেন। যা অতি সুন্দর ও সূক্ষ্মযুক্তি পূর্ণ। ইহা সুধীজনের উচ্চ প্রশংসা অর্জন করে। তার শিক্ষক ইমামুল হারামায়ান (রঃ) এ গ্রন্থখানা পড়ে মন্তব্য করেন; "জীবিতাবস্থায়ই তুমি আমাকে সমাধিস্থ করলে"। অর্থাৎ ছাত্রের খ্যাতি উস্তাদের জীবদ্দশায়ই তাঁর খ্যাতি কে অতিক্রম করে গেল। এতে করে বুঝা যায়, ইমাম গাযালী (রঃ) কলমের ধার কত নিখুঁত ও সূক্ষ্ম ছিল। তার শিক্ষক পর্যন্ত তার গ্রন্থ রচনায় বিস্ময় প্রকাশ করতে বাধ্য হলেন। য়ুউরোপ ইহাকে বহু সাদরে গ্রহণ করে রক্ষা করেছে। নতুবা মুসলিম জগত এ অমূল্য কেতাব হতে বঞ্চিত হতো।

Dhaka University Institutional Repository

মীযানুল আ'মল ঃ

ইহা মানতিক বা তর্কশাস্ত্র, মানতিক শাস্ত্রে তিনি আরো কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। মীযানুল আ'মল গ্রন্থটি ইসলামে সাম্রাজ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু য়ুউরোপেতা সংরক্ষিত আছে। ইহা হিরু ভাষায় মসিয়ে ইব্রাহিম হাছদায়ী নাম এক য়ুহুদী অনুবাদ করেছিল। মসিয়ে গুল ডেন্টহল ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে উহা মুদ্রণ করেছিল। আল্লামা ইমাম তাইময়া (রঃ) এর বর্ণনা থেকে জানা যায়। তিনি তার কিতাবুর রদ আলাল মানতেক নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, মুসলিম ওলামাবৃন্দ মানতেকের ব্যবহার অত্যন্ত খারাপ কার্য বলে মনে করতেন। ইমাম গাযালীর (রঃ) যমানা থেকেই উহা শুরু হযেচে। ইবনে তাইমিয়া (রঃ) অনত্রে লিখেছেন। যিনি সর্বপ্রথম মানতেক শাস্ত্রকে মুসলমানের একটি উসূলী বিষয়ের মধ্যে গন্য করেছেন তিনি হলে ইমাম গাযালী (রঃ)।

ইতিপূর্বে মুসলমানদের মধ্যে এধারনা ছিল যে, তর্কশাস্ত্র শরীয়ত বিরোধী, ইহা ইসলামে বৈধ নয়। ইমাম গাযালী (রঃ) ইহার ব্যাখ্যা করে ওলামা সমাজকে বুঝাতে সক্ষম হন। গাযালী (রঃ) এর আমলে নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তর্কশাস্ত্রে শিক্ষা দেয়া শুরু হয়। ইহার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে তর্কশাস্ত্রের শিক্ষা প্রদান করা হতো না।

মাকাসিদুল ফালাসিফাহ ঃ

ইহা দর্শন শাস্ত্রে কিতাব। যে মুহূর্তে এরিস্টটল, প্লেটো এবং পাশ্চাতের অন্যান্য অমুসলিম দার্শনিকদের ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে যুব-সমাজ ইসলামী অকিদা থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। সে মুহূর্তে ইমাম গাযালী (রঃ) পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের মতবাদকে ইসলামী দর্শনদ্বারা অকার্যকর হিসাবে প্রমাণ করে দেকান। গাযালী (রঃ) এ কিতাবে গ্রীক দর্শনের ব্যাখ্যা করেছিলেন। ইহার একখানা কপি ও ইসলামী রাজ্যে পাওয়া যায় না। অথচ স্পেনের শাহী লাইব্রেরীতে ইহার একখানা কপি

---

[৪] এ হাদিস খানা ও হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায়। ১২০০ খৃীষ্টাব্দে ল্যাটিন ভাষায় মিরছালবী নামক এক ব্যক্তি এ কিতাবের অনুবাদ করে।

তাহাফাতুল ফালাসিফাহ ঃ

এই গ্রন্থে ইম্যাম গাযালী (রঃ) গ্রীক দর্শনের ভ্রান্তমত বের করে তার রদ করেছেন। ইবরাণী ভাষায় ইহার অনুবাদ হয়ে তা ফ্রান্সের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। সাঁসিয়ে শামুসেল এবং সাঁসিয়ে মোনক এই গ্রন্থের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। বর্তশান বাংলায় অনুবাদ করেছেন আবুল কাসেম মুহাম্মাদ আদমুদ্দীন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত। অত্র গ্রন্থে তিনি সর্বপ্রথম গ্রীক দর্শনের ভ্রান্তমতগুলো বের করেন। অতঃপর যুক্তি ও তর্কের মাধ্যমে উহা যে অনুপযোগী তা প্রমাণ করে দেখান। এতে করে ইসলামী আকিদা থেকে দূরে সরে যাওয়া যুব-সমাজ ইসলামের দিকে ফিরে আসে। এছাড়া দর্শন শাস্ত্রে তিনি আরো কয়েক গ্রন্থ রচনা করে সবগুলো সময়োপযোগী ছিল। দর্শন শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে স্বয়ং তিনি বলেন, "এমন কোন দার্শনিক ছিল না যার দর্শন আমি অধ্যায়ন করি নি" দর্শন শাস্ত্রে তিনি এতবড় পন্ডিত যাতে অমুসলিম দার্শনিকগণ ও তার সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হন।

আরবাঈন ঃ

আরবী ভাষায় লিখিত ইমাম গাযালী (রঃ) অন্যতম দান আরবাঈন। উর্দু ভাষায় আরবাঈনের নাম করণ করা হয় তাবলীগে দ্বীন। অল্প দিনের মধ্যে আরবাঈনের মত "তাবলীগে দ্বীন" ও ভারতের আলেম সমাজে সমাদৃত হয়। এমনি হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) কিতাব খানা পছন্দ করে তার মুরীদদের পড়তে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি তার কিতাব খানায় ইবাদতের সকল দিক, আত্মার পরিশুদ্ধি, তওবার শ্রেণী বিন্যাস, তাওয়াক্কুল আ'লাল্লাহ ইত্যাদির উপর ব্যাপক আলোচনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এবাদককে তিনি দশটি দিকের উপর শ্রেণী বিন্যাস করেন। প্রথম ইবাদত হিসাবে "নামায" স্থান পায়। তিনি নামায সম্পর্কে বলেন, মনে রাখিও, নামাযের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালার সঙ্গে কথাবাতা বলা হয়। অতএব, নামাযের প্রতি খুব লক্ষ্য রাখা দরকার, হাতে কোন রকম ত্রুটি হতে না পারে। নামাযের মধ্যে তিনটি বিষয়ের প্রতি তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখা সকলের কর্তব্য। প্রথম কর্তব্য ওযু, দ্বিতীয় কর্তব্য নামাযের আরকান, তৃতীয় কর্তব্য নামাযের প্রাণ, নামায পড়ার পূর্বশর্ত হলো ওযু, ওযু মধ্যে গলদ থাকলে নামায পড়া না পড়া এক সমান। ভাল করে ওযু না করে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ও যদি কোন ব্যক্তি নামায আদায় করে তা অনর্থক কাজ বলে বিবেচিত হবে। তদ্রুপ নামাযের আরকানের প্রতি ও তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখার দরকার। নামাযের আরকান সমূহ যথাযথ ভাবে পালনের মাধ্যমে নামায শুদ্ধ হয়। নিয়ত ও হুযূরে কলব অর্থাৎ একাগ্রতা নামাযের প্রাণ। সুতরাং ইহার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে। নামাযের মধ্যে যা পড়া হয় এবং যে কাজ করা হয় মনের মধ্যে ও সেরকম ভাব পয়দা করতে চেষ্টা করবে। হুযূরে কলব ছাড়া নামাজের হক আদায় হয় না।

দ্বিতীয় ইবাদত যাকাত ঃ

আল্লাহ আ'আলা ফরমায়েছেন ঃ "আল্লাহ পথে দানের উদাহরণ-এ রকম একটি বীজের মত, যাতে সাতটি ছড়া হয়। প্রত্যেকটি ছড়ায় একশত করে শষ্যের দানা থাকে"।

যাকাত ও খয়রাত দ্বারা দীন-দুঃখীর জীবন রক্ষা হয় এবং খোদার সৃষ্ট জীবের উপকার সাধিত হয়। সেজন্য যাকাতকে ধর্মের স্তম্ভ নির্ধারন করা হয়েছে। আল্লাহর সহিত ভালবাসা রাখা মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিক। মুসলমানগণ আল্লাহর প্রতি মহব্বতের দাবী করে থাকে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের মহব্বতের পরীক্ষার জন্যই মালের যাতাক দেওয়ার আদেশ করেছেন। ইহাই যাকাতের মূল রহস্য। তিনি গাযালী (রঃ) আল্লাহর পথে দানকারীদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যাঁরা

Dhaka University Institutional Repository

যা কি পান, তৎসমুদয়ই আল্লাহ পাকের রাস্তায় লুটিয়ে দিয়ে খোদার প্রেমের সত্যতা প্রদর্শন করেন, তারাই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। আবার যারা আল্লাহর পথে সমস্ত ধন-সম্পদ দান করেন না সত্য। কিন্তু তারা নিজেদের জন্য ও দরকারের অতিরিক্ত খরচ করেন না। নিজেদের খাওয়া-পরা সারিয়ে সর্বদা তারা দীন-দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য তৎপর থাকেন। এরা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। আর যারা যাকাতের নির্ধারিত অংশ দান করাকেই যথেষ্ঠ মনে করেন। তাঁরা অতিরিক্ত দান না করলে ও যাকাতের পরিমিত অর্থ দান করতে মোটেই অবহেলা করেন না। এরা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত।

এভাবে ইমাম গাযালী (রঃ) ইবাদত অধ্যায়ের মধ্যে রোজা, সংখ্যার হিসাবে রোযার মর্যাদা। হজ্জের আদব সমূহ, হজ্জের তত্ত্বকথা, তেলোয়াত কুরআনের আদব, আল্লাহর সিকর, হালাল রুযী অন্বেষণ, তাক্ওয়া হিসাবে মুসলমানদের শ্রেণী বিবাগ। ভিক্ষাবৃত্তির অপকারিতা, সদ্ব্যবহার, চরিত্র সংশোধন ধমোপদেশ দান। লোভ, অল্পাহারের অভ্যাস। গীবত বা পরনিন্দা, নিরর্থক কথা, সুন্নতের তাবেদারী ইত্যাদি বিষয় গুলো অত্যন্ত সুন্দর ভাবে আলোচনা করেন্যা অনুসরণ করলে যে কোন লোক সঠিক পথের সন্ধান পাবে।

এ কিতাবে ইমাম গাযালী (রঃ) "আত্মার সংশোধন" নামে একটি অধ্যায় পেশ করেন। যেখানে তিনি কিভাবে আত্মার চিকিৎসা করতে হবে। সে ব্যাপারে বিশদ ভাবে আলোচনা করেন। আত্মার কি কি রোগ আছে তা নির্ণয় করে কি কি ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে তাও বলে দিয়েছেন।

সেখানে তিনি সৎস্বভাব ও তৎ-সম্পর্কে নফসের ধোঁকা। যুরত ও সীরত। ক্রোধের প্রকার ভেদ, কাম শক্তির বিভিন্ন অবস্থা। আত্মার রোগ

382725

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

নির্ণয় ব্যাপারে নফসের ধোকা; নফসের রোগ নির্ণয়ের সহজ উপায়। মানবাত্মা ও জীবাত্মা।

শেষ পর্যায়ে "আত্মার উন্নতি" নামে একটি অধ্যায় উপস্থাপন করেন। আত্মার উন্নতি হয় আল্লাহর সঙ্গে তা'আল্লুক দ্বারা। আল্লাহর সঙ্গে তা'আল্লুক পয়দা করার অর্থ আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা। এ তা'আল্লুক যতই মজবুত হবে ততই আত্মার উন্নতি হবে। তা'আল্লুক মা'আল্লাহু অর্থাৎ আল্লাহ সঙ্গে এমন দৃঢ় সম্বন্ধ যা হৃদয়গত ও স্বভাবে পরিণত হয়েছে। এ তা'আল্লুক আল্লাহের কতগুলো দিক আছে যা তিনি বর্ণনা করেছেন।

অত্র কিতাব খানার মূল্যায়নে বলা যায়। ব্যক্তি জীবনের এমন সব দিকগুলো তিনি উল্লেখ করেছেন, যে গুলো মেনে চললে অনায়াসে যে কোন লোক মুক্তি পথ খুঁজে পাবে। এতে কোনমন্দের কারণে নেই বিশেষ করে ইহা সুফিবাদের জন্য অতি সহায়ক গ্রন্থ বলে পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

গাযালীর স্থান নিরূপণ

অত্র অধ্যায় বিভিন্ন মনিষীদের মতামতের আলোকে গাযালীর স্থান নিরূপন করা হলো।

মুহাদ্দিস মায়েজী (রঃ) ঃ

একজন উচ্চ মর্যাদাশালী ব্যক্তি হিসাবে গাযালীর (রঃ) পরিচয়, মায়েজী ইমাম গাযালী সম্পর্কে বহু কিছু লিখেন। আল্লামা ইব্নুল বাকী (রঃ) তাঁর "কাবুল শা'ফিয়াতে" তা'উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তার সার সংক্ষেপ উল্লেখ করা হলো।

মায়েজী (রঃ) বলেন। ইমাম গাযালীর (রঃ) শিষ্যগণকে আমি দেখেছি এবং তাদের নিকট তাঁর অবস্থা ও ধারণাদির কথা বিস্তারিত ভাবে শ্রবন করেছি, যেন আমি খোদ গাযালী (রঃ) কে নিজের চোখেই অবলোকন করেছি। তিনি ইল্‌মে ফিক্‌হতে উসুলে ফিক্‌হর তুলনায় বেশী যোগ্যতা রাখতেন। ইল্‌ম কালামের উপর ও তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন কিন্তু এ শাস্তে তার তত যোগ্যতা ছিল না। এর কারণ হল ইল্‌মে কালামের পুরোপুরি যোগ্যতা অর্জন করার পূর্বেই তিনি দর্শন শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। যার ফলে তার মনে দর্শন শাস্ত্রের প্রভাবই বেশী প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর সম্পর্কে আমি আর একটি খবর শুনেছি যে, তিনি 'ইখওয়ানুছ সাফা' গ্রন্থখানা বেশী পাঠ করতেন। উক্ত গ্রন্থখানার রচয়িতা আবু জা'ফর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আত-তাহাবী ছিলেন। যিনি দর্শনকে ধর্মীয় বিষয়ের সাথে মিশে ফেলার পক্ষপতে ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল ওয়ালিদ তারতুশী (রঃ) এর মত ঃ

আমি ইমাম গাযালী (রঃ) এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে তাঁর আ'কিদা ও ধারণা সম্পর্কে ওয়াকিফ হয়েছি। আমি গাযালী (রঃ) কে দেখলাম, নিঃসন্দেহে তিনি অত্যন্ত মেধাবী, বিরাট আলেম এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীর জ্ঞানী। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি তা'লীম আদান-প্রদানে রতছিলেন। কিন্তু শেষ কালে তিনি তা পরিত্যাগ করে সুফি দরবেশদের সাহচর্য অবলম্বন করেন এবং দার্শনিক মতবাদকে মানসুর হাল্লাজের ভাবধারার সাথে মিশে ফেলেন।

মুহাদ্দিস ইব্নুছ ছালাহ এর মত ঃ

তিনি মতামত পেশ করতে গিয়ে বরেন, "আমি ইমাম গাযালী সাহেবের প্রতি নাখোশ, কারণ তিনি ইল্ম মানতিক সম্পর্কিত কিতাব লিখে গেলেন কেন? ইল্মে মানতিক শিক্ষা করা পরিস্কার হারাম।

আল্লাম ইব্ন তাইমিয়ার মত ঃ

তিনি তার "কিতাবুর রদ 'আলাল মানতিক" নামক গ্রন্থে লিখিছেন যে, মুসলিম ওলামাবৃন্দ মানতিকের ব্যবহার অত্যন্ত খারাপ কার্য বলে মনে করতেন। ইমাম গাযালী (রঃ) এর জামানা থেকেই উহা শুরু হয়। তিনি অনত্রে লিখেছেন। যিনি সর্বপ্রথম মানতিক শাস্ত্রকে মুসলমানের একটি উসূলী বিসয়ের মধ্যে গন্য করেছেন। তিনি হলেন ইমাম গাযালী (রঃ)। গাযালী (রঃ) স্বয়ং তাঁর 'মুস্তাসফী' গ্রন্থের ভূমিকায় পরিস্কার ভাবে উল্লেখ করেছেন যে, মানতিক শাস্ত্রটি যে কোন শাস্ত্রের জন্য একটি অতি আবশ্যক।

প্রথম দিকে অবশ্যই ওলামায়ে কেরাম ইমাম গাযালী (রঃ) যথেষ্ট বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃত সত্যকে কেউ কোন দিন চেকে রাখতে সক্ষম হয় নি। যা সত্য তা আপন শক্তির বলে প্রকাশিত হয়ে উঠবেই। দেখা গেল, কিছু দিনের মধ্যেই এলমে মানতিক সবার নিকটই

Dhaka University Institutional Repository

একটি পছন্দনীয় বিষয় রূপে বিবেচিত হল এবং সফলেই একে গ্রহণ করল।

ইম্যামুল হারামায়ান এর মত ঃ

ইমাম গাযালী (রঃ) এর শিক্ষক ইম্যামুল হারামায়ান (রঃ) গাযালী (রাঃ) প্রথম বয়সের প্রথম রচনা "মনখুল" পড়ে এ মন্তব্য করতে বাধ্য হলেন। 'জীবিতাবস্থায় তুমি আমাকে সমাধিস্থ করলে। অর্থাৎ ছাত্রের জ্ঞান শিক্ষকের তুলনা বেশী প্রমাণিত হওয়ায় শিক্ষক এ মন্তব্য করলেন। উল্লেখযোগ্য ইম্যামুল হারামায়ান ছিলেন নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এতে করে গাযালী (রঃ) জ্ঞানের গভীরতা অনুমান করা যায়।

D. Boer এর মত ঃ

গাযালী নিঃসন্দেহে সমগ্র মুসলিম জাহানের সর্বশ্রেষ্ট মনিষী। তিনি ইসলামকে গ্রীক দর্শনের প্রভাব থেকে উদ্ধার করেন। তিনি দর্শনের অন্তনিহিত দূর্বলতা, ত্রুটি, বিচ্যুতি প্রদর্শনের জন্য উহাকে সাধারণের বোধগম্যের স্তরে টেনে নিয়ে প্রকাশ করেন[৬৯]।

মিঃ হুইন ফিল্ডের বক্তব্য ঃ

তিনি মত প্রকাশ করেন যে, গাযালী সুফীদের দিয়ে যান একটি দার্শনিক পরিভাষা। তিনি আহরণ করেন প্লোটিনাম এবং সংস্কার পন্থী প্লাটোনিস্টদের লেখা[৭০]।

অধ্যাপক ম্যাকডোন্যাল্ড এর মত ঃ

"Development of Muslim Theology" পুস্তকে তিনি গাযালীকে ইসলামের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ট এবং নিংসন্দেহে সর্বাপেক্ষা সহানুভতিশীল

---

[৬৯] আবু জাফর, রাষ্ট্র দর্শনে মুসলিম মনিষী, ঢাকা ঃ প্রকাশনা ঃ ১৯৭৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ-৯৫।

[৭০] আবু জাফর, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিরূপে আখ্যায়িত করেন। তাঁর মতে' গাযালী চার মহান ইমামের সম-আসন অধিকারী এবং ইসলাম কর্তৃক নিয়োজিত পরবর্তী বংশধরদের একমাত্র 'শিক্ষাগুরু'।

তিনি আরো বলেন, " ইসলাম তাকে ছাড়িযা যেতে পারে, পুরোপুরি তাকে বুঝতে ও পারে নি। ইসলামের পুনরুজ্জীবনের যে অধ্যায় সূচিত হতে চলছে। তাতে গাযালীর ভূমিকা অবলুপ্ত থাকবে না। নতুন দৃষ্টি ভঙ্গিতে তাঁর রচনা পঠিত হয়ে এক নবজীবনের ধারা সেখানে প্রবাহমান হবে[৭১]।

মনীষীরাসেলের মন্তব্য ঃ

"The mysties see in the light of a visio bisede which all other knowledge in ignorance".

অর্থাৎ সূফী সাধকেরা যে দৃষ্টি আলোকে দেখেন তার নিকট সমস্ত জ্ঞানই মূর্খতাবেই আর কিছুই নয়। অর্ন্তদৃষ্টির আলোকেই একমাত্র আলো যার সাহায্যে সূফী সাধকেরা বিশ্ব রহস্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে[৭২]।

কবি ব্লেকের ভাষায় ঃ

I question not my corporeal or vegetative eye any more this, I would question a window concerning a sight, I look through it and not with it

অর্থাৎ চোখের সাহায্য ব্যতিরেকে শুধু জানালা দিয়ে যেমন কোন দৃশ্য দেখা যায় না। তেমনি সত্যিকার দেখা বাহ্যিক দৃষ্টিতে নয়। এ মনের চোখ দিয়ে দেখতে চাইলেন গাযালী সত্যের স্বরূপ[৭৩]।

---

[71] . আসিন চৌধুরীএ মূল গাযালী, সত্যের সন্ধান, ঢাকাঃ সংস্করন- ১৯৯৭, ভূমিকা দেখুন,
[72] . গোলাম রসুল, ইমান গাযালী পরিচিতি, রাজশাহীঃ প্রকাশকাল ১৯৮০, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, পৃ-৩।
[73] . গোলাম রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ-৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রখ্যাত কবি দাঁন্তে, মনিষী রেমন্ড মার্টিন, মনিষী সেন্ট টমাস, এক্যুইনাস, প্রখ্যাত ফরাসী মিষ্টিক, ব্লেইসি, পাসকেল, ইমাম গাযালীর গ্রন্থরাজি হতে তাদের যুক্তি ও উদাহরণ গ্রহণ করেন। তারা গাযালীর মতামতকে প্রামান্য বলে উল্লেখ করেন[৭৪]।

অধ্যাপক ম্যাকডোন্যাল্ড আরো বলেন ঃ

"Deep study of Al-Ghazali may Suggest to muslim's step to be taken if they are to deal successfully with the contemporary situation."

তিনি আরো বলেন ঃ

"He was not a scholar who struck out a path. But a man of intense personality who entered on a path al-ready trodden and made it the common high way. We have here him character[৭৫]."

P.K. Hitti এর মত ঃ

অধ্যাপক হিট্টি বলেন, "Al-Ghazali Constructed such a scholastic shell for Islam that all its future progress became arrested with in it[৭৬]."

DR. THOLOCK এর মত ঃ

"তিনি গাযালীর মহত্ব, সরলতা, সাধুতা ও পান্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি আরো বলেন। গাযালী কুরআনের শিক্ষা এমন ৭৯ সাধুতা পান্ডিত্য দিয়ে সুন্দর করেছেন যে, আমার মতে তা খ্রীষ্টানদের ও গ্রহণ যোগ[৭৭]।

---

[৭৪]. গোলাম রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ-৩।
[৭৫]. গোলাম রসুল, ইমাম গাযালী পরিচিতি, প্রাগুক্ত পৃ-৩।
[৭৬]. Md. Sharif Khan, Muslim Philosophy and Philosopher, প্রাগুক্ত, 7.76.
[৭৭]. WIT. Stace, Mysticism and Pholosophy, London : 1961, P-227.

Dhaka University Institutional Repository

জনৈক পন্ডিতের মত ঃ

গাযালী না হলে মুসলমানেরা নিউটন ও এরিস্টটলের জাতিতে পরিণত হয়ে যেত।"[৭৮]

মহাকবি আল্লামা ইকবালের মত ঃ

তিনি গাযালী (রঃ) কে দার্শনিক কান্ট এর সঙ্গে তুলনা করেন, তিনি আরো বলেন,

"রয়ে গেছে আজান প্রথা, নাই বেলালীর প্রাণের সাড়া
রয়ে গেছে দর্শন শাস্ত্র, গাযালীর শিক্ষা ছাড়া"।

অর্থাৎ আযান প্রথা রয়ে গেছে কিন্তু রুহ-হানীর বেলালী বর্তমান নেই। যে বেলাল (রাঃ) এর আযানের আওয়াজ আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। দর্শন শাস্ত্র রয়ে গেছে, কিন্তু গাযালী (রঃ) একত্ববাদে বিশ্বাসের আলোক সে দর্শন শাস্ত্র বর্তমান নেই। দর্শন শাস্ত্রে গাযালী (রঃ) যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন এবং যে সকল পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন সেগুলো বর্তমান নেই।

ইকবাল আরো বলেন, "তিনি (গাযালী) চার ইমামের সমকক্ষ মর্যাদা পান"[৭৯]।

অধ্যাপক ওয়াটের মতে ঃ

"The adoption of the mystic life is not simpoly a refusal toface difficaties. The spiritual vision which had hither guided the development of Islamic religion was it. Self pointing to great concentration on the inner life."

---

[৭৮] গোলাম রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ-৩।
[৭৯] গোলাম রসুল; প্রাগুক্ত, পৃ-০৪।

Dhaka University Institutional Repository

জনৈক বিশ্লেষক এর মতামত ঃ

"Of his philosophical ability and eminence no one who reads his clear. Penetrating analytic prose. Even intranslation can be in doubt. He also possessed great literary skill. One his writing is rendered delightful by reason of his extra ardinary gift for apt and illuminating illustration and examples[৮০]."

ইব্‌ন খালদুন বলেন, "ইমাম সাহেবই সে প্রথম ব্যক্তি যিনি এল্‌মে কালামের সাথে দর্শনের সংমিশ্রন ঘটিয়েছেন[৮১]।

মুহাম্মাদ যাইন ইরাকী (রঃ) বলেছেন যে, গাযালী (রঃ) রচিত "ইহয়্যা-উলুমিদ দ্বীন" কিতাবখানা ইসলামের একখানা উচ্চ পর্যায়ের গ্রন্থ", শায়খ আবু মুহাম্মাদ কারযুনী (রঃ) বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে, যদি দুনিয়ার সমস্ত এলেম ও বিলীন করে দেয়া হয় তাহলে শুধু ইহয়্যা-উলুমিদ দ্বীন" কিতাব খানা থাকলেই হল। কারণ এর দ্বারাই বিলুপ্ত ইলম সমূগগ পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়।"

শায়খ আবদুল্যাহ ঈদরূস (রঃ) যিনি একজন বিখ্যাত সূফী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি অত্র কিতাব খানা আগাগোড়া মুখস্ত করে ফেলেছিলেন। শায়খ আলী (রঃ) প্রায় পাঁচশ বার কিতাব খানা আগাগোড়া অধ্যায়ন করেছিলেন, এছাড়া সম-সাময়িক সূফী সাধকগণ ইমাম সাহেবের কিতাবখানা আল্লাহর ইলহাম সম্বলিত বলে মনে করতেন।

কুতুব শাজলী (রঃ) জনৈক প্রখ্যাত তাপস ছিলেন। একদা তিনি এইহ্যাউল উলুমিদ দ্বীন এর একখানা কপি হাতে নিয়ে বাইরে এলেন এবং লোকগণকে তা'দেখিয়ে বললেন, তোমরা কি জান ইহা কোন কিতাব? এ কথা বলে তিনি নিজের অঙ্গে একটি চাবুকের আঘাত

[৮১] গোলাম রসুল প্রাগুক্ত, পৃ-২১।

Dhaka University Institutional Repository

দেখিয়ে বললেন। আমি প্রথম দিকে এ কিতাব খানার প্রতি দ্বিমত পোষন করতে ছিলাম। আজ স্বপ্নযোগে দেখলাম হযরত গাযালী (রঃ) আমাকে নিয়ো হযরত রসুল (সঃ) এর দরবারে উপস্থিত করলেন এবং সেখানে আমাকে উক্ত মত পোষণ করার জন্য শাস্তি স্বরূপ আমার অঙ্গে এ ভাবে চাকুরে আঘাত করা হয়েছে[৮২]।

ইমাম গাযালীর (রঃ) যুগ পর্যন্ত ফারসী ভাষায় আরবী এলেম ও বিষয় সমূহের কোন স্থান ছিল না। তার কিমিয়ায়ে সা'আদাত রচিত হওয়ার পর থেকে অধিক সংখ্যায় আখলাক সম্বন্ধীয় কিতাব রচিত হতে লাগল। ফারসী ভাষায় বিশেষতঃ ফারসী ভাষায় কাব্য সমূহে যে ছুফী বাদের বিরাট প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে, তা ইমাম গাযালীর (রঃ) পূর্ব পর্যন্ত এরূপ ছিল না বললেনই চলে। তাঁর অনুসরণ করে ফরিদ উদ্দীন আত্তার, আল্লামা জালালুদ্দিন রুমী, কবি শেখ সাদী হাফেজ সিরাজী প্রমুখগণ এ পথে অগ্রসর হন।

গাযালী (রঃ) বিভিন্ন শাস্ত্রে বিশেষতঃ আ'কায়েদ ও কালাম শাস্ত্রে নানা রূপ সংশোধনী আনেন। এর ভিতরকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপরিপক্কতা দূর করে দেন। এর নিয়ম প্রণালী ও বুনিয়াদ দৃঢ় করে এর থেকে দোষগুলি দূর করে দিয়ে একে একান্ত পরিশুদ্ধতার সাথে মানুষের সম্মুখে তুলে ধরেন। ইসলামী আকিদা ও মূল ভিত্তির থেকে দলীল ও প্রামাণিক আলোচনা করে সব মোবাহগুলো দূর করে দেন, মোট কথা তিনি কোন একটি দিকে দৃষ্টি প্রদান করা বাকী রাখলেন না।

---

৪১ . ছাখাওয়াত উল্যাহ, হায়াতে ইমাম গাযালী (রঃ), ঢাকাঃ সংস্করণ ১৯৯৩ ইং তাবলীগী কুতুবখানা, পৃ-৩০।

৪২ . . ছাখাওয়াত উল্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ-২৭।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আল-গাযালীর অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পরিচয়

আল্লাহর পরিচয়ের জন্য আত্মার পরিচয় অত্যাবশ্যক। আত্মার পরিচয় লাভ করতে পারলে আল্লাহ পরিচয় পাওয়া যায়। জনৈক মনীষীর বাণী।

"যে ব্যক্তি নিজকে চিনেছে তিনি আল্লাহকে ও চিনেছে"।

মনোযোগের সহিত স্বীয় আত্মার প্রতি লক্ষ করলে আল্লাহর পরিচয় পাওয়া যায়। বহুলোক স্বীয় আত্মার প্রতি গভীর ভাবে দৃষ্টিপাত করে, কিন্তু আল্লাহর পরিচয় পায় না। কারণ, তাদের আত্ম-পরিচয় পূর্ণ হয় না। এ জন্যই প্রকৃত আত্ম-পরিচয় লাভ করা আবশ্যক। কেননা ইহা আল্লাহর পরিচয় লাভের আয়না স্বরূপ। আত্ম-পরিচয় লাভের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় লাভ করা যায়। আত্মা কর্তৃক দেহ পরিচালিত হয়। মানুষ আত্মা সম্পর্কে জ্ঞান-অর্জন করতে না পারলে তার অজ্ঞাতে ইহা অসুস্থ হয়ে যায়। অতঃপর তার দেহ ও অসুস্থ হয়ে যায়। যার ফলশ্রুতিতে সে সুস্থ মানসিকতার অধিকারী এক কথায় আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হয় না।[৮৩]

আল্লাহর অস্তিত্ব বুঝার সহজ উপায় ঃ

মানুষ নিজের অস্তিত্ব দেখে আল্লাহর অস্তিত্ব উপলব্ধি করবে। স্বীয় গুণ দেখে আল্লাহর গুণ চিনে লইবে এবং স্বীয় দেহ-রাজ্যের উপর তার যে প্রভূত্ব ও ক্ষমতা চলে তা হতে সমস্ত বিশ্বজগতে আল্লাহর প্রভূত্ব ও ক্ষমতা বুঝে লইবে। মানুষ স্বীয় অস্তিত্বের প্রতি লক্ষ করলে বুঝতে

---

[৮৩] সৌভাগ্যের পরশমনি, আবদুল খালেক, মূল গাযালী (রঃ), ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ. ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

পারবে যে, কয়েক বৎসর পূর্বে তার নাম ও নিশানা কিছুই ছিল না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই মানুষের উপর কালের এমন একটি অংশ অতিবাহিত হয়েছিল, যখন সে উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু ছিল না। নিশ্চয়ই আমি পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে মানুষকে সম্মিলিত শুক্র বিন্দ হতে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাকে শ্রবণকারী ও দর্শনকারী বানায়েছি[৮৪]।

প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ এক বিন্দুনাপাক শুভ্র শুক্রবিন্দ মাত্র ছিল। ইহাতে বুদ্ধি, শ্রবন শক্তি, দৃষ্টিশক্তি, গোশত, চর্ম কিছুই ছিল না। অতঃপর ঐ সকল অঙ্গ পতঙ্গ ও আশ্চর্য কৌশল পুন যন্ত্র সমূহ হইতে সংযোজিত হয়েছে। মানুষ নিজ দেহ নিজে সৃষ্টি করে নেই। বরং আপন কোন সৃষ্টি কর্তা সৃষ্টি করেছেন। কারণ সে এখন পূনাঙ্গ মানবে পরিণত হয়ে ও এক গাছি কেশ পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারে না। এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, এক বিন্দু শুক্ররূপে থাকাকালে মানুষ কতদূধল ও অক্ষম ছিল। এমতাবস্থায় নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সে নিজে কিরূপে তৈয়ার করবে? সুতরাং মানুষ নিজের প্রাথমিক অবস্থার কথা চিন্তা করলে আপনা-আপনিই বুঝতে পারে যে, এক মহাশক্তিশালী সৃষ্টিকর্তা তাকে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে আনায়ন করেছেন। অতএব মানুষ নিজ অস্তিত্বের বিষয় চিন্তা করতে গিয়ে আল্লাহর অস্তিত্ব বুঝতে পারে।

মানুষের বর্তমান দোহবয়ব ও তার দৈহিক গঠন এক জীবন্ত ও অতি উচ্চমানের পরিকল্পনাকারী স্রষ্টার অকাট্য ও অনস্বীকার্য সাক্ষী। মানুষের অসম্পূর্ণতা সত্বে ও মানবদেহ কিভাবে পরিকল্পত ও সৃষ্ট হয়েছিল। সে সম্পর্কে মানুষ অনেক জানছে, অধিক বিজ্ঞজনেরা ও তাদের মনে বিস্ময় উদ্রেকের কারণ বিশ্লেষণ করছেণ[৮৫]।

---

[৮৪] আল্ কুরআন।

Dhaka University Institutional Repository

God is the cause of all that we see around us as also of ourselves[86].

Dr. W.W. Aklers নামের জনৈক বিশ্ববিদ্যালয় ইঞ্জিনিয়ার ১৯৬৬ সন একজন শল্য চিকিৎসকের সঙ্গে মিলে একটা কৃত্রিম হৃৎপিন্ড তৈরী করার কাজে ব্যস্ত হয়েছিলেন। এ সময় তিনি বিস্ময়বেদনা সহকারে হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলেন ঃ

The body is the ultimate in technological perfection. Almost any machine you can dream up-no matter how sophisticated you can Look in the body and find one better[87].

অর্থ ঃ দেহটি প্রযুক্তির পূর্ণত্বের শেষ পর্যায়ের ছিল। মোটামুটি প্রায় ধারণাযোগ্য কোন যন্ত্রের মত। তা কত অসরল বা জটিল, সেটা কোন ব্যাপার নয়। তুমি দেহ টি দেহটি দেখতে পার এবং ভালোই দেখা যাবে।

এক সময় মানুষ একটা একক গর্ভস্থ ডিম্বমাত্র ছিলে এই বাক্যটি শেষ হওয়াকালীন সময়ের তুলনায় ও ক্ষুদ্রতর একটি কোষ। সেই সহজ শুরু মুহূর্ত থেকে চরম জটিল উন্নয়নের মাধ্যমে তোমার দেহ গড়ে উঠেছে। মানবদেহ-সৃষ্টি ও উন্নয়নের এই জটিলতর পদ্ধতি একজন অতিশয় বুদ্ধিমান বিচক্ষণ সৃষ্টিকর্তার এবং একজন একক সংগঠকের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

আল্লাহ পুরুষের দেহে একটি বিশেষ অঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। যার মাধ্যমে নারীর গর্ভের বীর্য সঞ্চার হয়। এই বীর্য সেখানে ক্রমান্বয়ে একটি পূর্ণ মানব দেহে রূপান্তরিত হয়। অবশ্য এ পরিপূর্ণ দেহ গঠিত

---

[85] . মুহাম্মদ আবদুর রহীম, বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ মার্চ ১৯৯২, পৃঃ ১৩৮।

[86] . T.C Rastogi, Muslim World, Islam Breaks fresh ground, P.94 (94)

[87] . Sanfrancisco Examiner and Chronicle, September 11, 1966, P-30.

Dhaka University Institutional Repository

হতে কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। প্রথম পর্যায়ে বীর্য থেকে রক্তের সৃষ্টি হয়, অতঃপর জমাট রক্ত থেকে মাংশপিন্ড, তারপর সৃষ্টি হয় অস্থি এবং এরপর আসে মাংশের আবরণ। অতঃপর তাকে শিরা-উপশিরার জাল দ্বারা পরিবেষ্টিত করে একটি মানব দেহে রূপান্তরিত করা হয়, এর পর সে দেহে চোখ, কান ও অন্যান্য অঙ্গ প্রতঙ্গ সৃষ্টি করা হয়[৮৮]।

আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা,

অর্থ ঃ আমি মানুষকে মাটি সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্র বিন্দরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শক্রবিন্দুকে জমাট রক্ত রূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি। এরপর সেই মাংসপিন্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাড় করিয়েছি, নিপুনতম সৃষ্টিকতা আল্লাহ কত কল্যাণময়[৮৯]।

The First Nine Months নামক বইতে মানব-দেহ সৃষ্টির সূচনা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

When the Sperm nucleus reaches the egg nucleus these two lie side by side as their content is combined. Is this half hour an immeasurable number of traits of the new bady are decided within the pin-point egg. (The first mine months, 1962-P-25).

অর্থ ঃ শুক্র অনু যখন ডিম্বানুতে পৌছায়, তখন এ দুটি পাশাপাশি শয়ন করে, কেননা তাদের সন্তুষ্টি সংযুক্ত। এ অধ-ঘন্টা সময়ের মধ্যে নব্য শিশুর অসংখ্য বৈশিষ্ট্য বিশেষত্ব আল-পিনের অগ্রভাগের মত সূক্ষ্ম ডিম্বের মধ্যে স্থিরীকৃত হয়ে যায়। এ দু'টো কোষ যখন একত্রিত হয়

[৮৮] ইমাম গাযালী, সৃষ্টির সহস্য, অনুবাদক-বশির মেসবাহ, ঢাকাঃ হোসায়নিয়া কুতুবখান্য, জুন ১৯৯৫, পৃঃ৫১।
[৮৯] আল্ কুরআন, সূরা মুমেনুন ঃ আয়াত ১০-১৬।

Dhaka University Institutional Repository

তখন সম্পূর্ণ নতুন একটা মানুষ সৃষ্টির জন্যে জন্মগত DNA-এর মধ্যে পরিকল্পনা তৈরী করে নেয়া হয়। আর এটা মাত্র কয়েক মিনিট সময়ের ব্যাপার।

একটা মানব দেহ কিংবা দেহ-ব্যবস্থা নিজেকে যে পন্থা ও পদ্ধতিতে বিচ্ছিন্ন করে উদ্দেশ্যমূলক প্রক্রিয়ার কোন সন্তুষজনক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম নন।

The whole process seems much more like the development of organized structure from a relatively simpler system. The molecules of protein and fat in the yoke appear to be marshaled into position to from an orderly and highly complex system some what analogous to the process by which a house is built of bricks. Wood and glass in accordance with a predetermined plan. The machine seems to operate in other words, in a highly purposive way and the term 'organizer' has been applied to it --- There seems to be some principle at work[90].

অর্থ ঃ গোটা প্রক্রিয়াই মনে হয় এক আপেক্ষিক সরল পদ্ধতি থেকে গড়ে সুসংবদ্ধ কাঠামোর উন্নয়ন। আমিষ উপাদান ও চর্বি জোয়ালের মধ্যে একটি অবস্থানে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে একটি নিমাণের প্রক্রিয়া সৃদশ। যেখানে কাঠ ও কাঁচ পুর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সাজানো হয়। --- যন্ত্র চালানো হচ্ছে মনে হয়। অন্য কথায় একটি উচ্চতর উদ্দেশ্যমূলক পথে এবং সংগঠক যে নিয়ম তাতে কার্যকর করেছে। -- মনে হবে সেখানে কতক চালিকানীতি কাজ করছে।

মাতৃগর্ভে জীব শিশুর অবস্থানের জন্যে যে ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়েছে তা অবশ্যই লক্ষণীয়। তাতে ও খুব দক্ষতা ও বিচক্ষণতাপূর্ণ

---

[90]. বিবর্তন বাদ ও সৃষ্টি তত্ত্ব প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম কোষ সংক্রান্ত লিখিত তথ্যের নির্দেশনায় কিভাবে এ ব্যভস্থাপনা কার্যকর হলো[৯১]।

The fertilized egg cell contains in its liny uncleus not only all the genetic instructions for building a human body. But also a complete manual on how to construct the complex protective armamentarium amnion. Umbilical cord placenta and all-that makes possible the embryo's existence in the womb, (Life পত্রিকা, ১৯৫৬ সন ৩০শে এপ্রিল)।

অর্থ ঃ উর্বর ডিম্বকোষ নিজের ক্ষুদ্রপরিসর অনুর মধ্যে একটি পূণাঙ্গ মানব দেহ তৈরীর সমস্ত জন্য সংক্রান্ত নির্দেশাবলী ধারন করে। শুধু তা-ই নয়। গর্ভের ফুল সংরক্ষণে দুর্ভেদ্য জটিল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কি করে গড়ে তোলা হবে তার নির্দেশনা ও ধারণ করে তার ফলেই না ভ্রুণটির ডিম্বের মধ্যে অবস্থান নিশ্চিত হয়ে থাকে।

মায়ের গর্ভের প্রতিরক্ষা সম্পন্ন একটা অবস্থিতির ব্যবস্থা ভ্রুনের জন্যে অপরিহার্য। অপরিহার্য সেদিন থেকেই যেদেনি ডিম্ব উর্বর হয়ে উঠে। এটা হচ্ছে বাইরে উপাদান। এবং সাধারণভাবে ব্যক্তির অনতিক্রম্য প্রতিরোধ শক্তি এ ধরনের একটা বাইরের বৃদ্ধিকে প্রজ্ঞাখান করে। কিন্তু উর্বর ডিম্ব এ ধরনের প্রতিরোধকে সহজেই ফাঁদে ফেলতে সক্ষম। এরূপ প্রতিরোধমূলক গৃহব্যবস্থার সমস্ত কৃতিত্ব সৃষ্টিকর্তাকে দিয়ে।

ডেভিড তাই বলেছেন ঃ You kept me sereened off in the belly of my mother.

অর্থ ঃ আমার মায়ের গর্ভে তুমিই আমাকে পর্দার অন্তরালে সুরক্ষিত করে রেখেছো, হে স্রষ্টা।

---

৯১ মুহাম্মদ আবুদুর রহীম, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত এরূপ নিখুঁত সুন্দর বিস্ময়কর ও উদ্দেশ্যমূলক পদ্ধতি প্রক্রিয়া ক্রমবিকাশের আওতাধীন হতে পারে না। এ থেকেই উচ্চতর বিচক্ষণতা সম্পন্ন এক মহাসৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অকাট্য ও অনস্বীকার্য হয়ে উঠে। এ জন্যে অপরিহার্য এক অনন্য সাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন সংগঠক ও সৃষ্টিকর্তা। আর এ কথাটি Where there is deign there most be a designer যেখানে নক্শা আছে যেখানে অবশ্যই একজন শিল্পী রয়েছে। কথাটির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল। আমরা যতটা বিচক্ষণ স্রষ্টা কল্পনা করতে পারি, মানব জাতির সৃষ্টি কর্তা তার চাইতেও অধিক মাত্রায় দক্ষতা ও বিচক্ষণতা সম্পন্ন স্রষ্টা। ডেবিট এ সৃষ্টি পদ্ধতি দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে অনুষ্ঠিত স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে স্বীকার করেছেন যে, এটা মহান স্রষ্টা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু মানুষ হচ্ছে স্রষ্টার সংখ্যা বহির্ভূত সৃষ্টিকূলের মধ্যে মাত্র একটি সৃষ্টি মানুষ ছাড়া আর ও বহু বহু সৃষ্টি রয়েছে, যা এক মহাশক্তিমান স্রষ্টার অস্তিত্ব অকাট্য অনস্বীকার্য ভাবে প্রমাণ করছে। দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গের কাজের প্রতি লক্ষ্য করো দেহের প্রতিটি অঙ্গই কোন না কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রতিটি যথারীতি স্ব স্ব কাজ আনজাম দিয়ে যাচ্ছে। আর প্রতিটি অঙ্গকেই তর কাজের উপযোগী আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রতিটি অঙ্গই তাদের স্ব স্ব কাজ সুষ্ঠুভাবে আনজাম দিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি অঙ্গনিয়ে একটু ভাবলেই এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, এ সব কিছুতেই রয়েছে আল্লাহর অসীম কুদরতের সুস্পষ্ট নিদর্শন।[৯২]

আল্লাহ পাকের অপার হেকমত ও অসীম কুদরতের প্রতি লক্ষ্য করো, তিনি বীর্যের ন্যায় অপবিত্র পদার্থ থেকে মানব দেহ সৃষ্টি করেছেন। এতে রয়েছে আল্লাহর অশেষ মহিমা ও অসীম কুদরতের নিদর্শন। তিনি তাঁর নিপুন সৃষ্টি কুশলতায় যে অবয়বে মানব দেহ সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন তাতে কোন পরিবর্তন বা হ্রাস বৃদ্ধির অবকাশ নাই। এতে সামান্য পরিবর্তন করতে যাওয়ার অর্থই হলো নানা সমস্যার সৃষ্টি করা। এতে রয়েছে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন ও চিন্তাশীলদের জন্য শিক্ষনীয় বিষয়।

দেহের অভ্যন্তরে প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা অংশের প্রতি লক্ষ্য কর এগুলো কি তিনি সুবিন্যাস্ত ও সুশৃংখল ভাবে গঠন করা হয়েছে। প্রয়োজনের সময় যাতে হাড়গুলো নড়াচড়া করতে পারে বা বাঁকা সোজা হতে পারে সে জন্য মাংস পেশী ও ঝিল্লী দ্বারা কতগুলো বন্ধ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ গুলো মোট ৫২৯টি এগুলো কোনটা ছোট, কোনটা বড়, আবার কোনটা চওড়া, কোটা সরু, এর মধ্যে ২৪টি চোখের পলক সঞ্চালনের সময় বিভিন্ন কাজ করে থাকে। যদি এর একটি ও কম হতো। তবে চোখের কর্যর্যকরিতা ব্যাঘ্যাত ঘটতো এবং দৃষ্টি শক্তি অসাড় হয়ে পডতো অনুরূপ প্রত্যেক অঙ্গের জন্য বিভিন্ন অংশ রয়েছে। প্রয়োজনানুসারে এক একটি এক এক আকৃতির। অরঃপর শিরা-উপশিরা, পেশী, ঝিল্লী ইত্যাদির অবস্থান ও বিন্যাস এবং তার গূঢ় রহস্য আরো বিস্ময়কর। এগুলোর প্রকৃতিগত গুনাগুন ও কার্যকরিতা সম্পর্কে মানুষ সম্যক ভাবে জ্ঞাত নয়।

মনবদেহের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি অংশে আল্লাহর অশেষ করুনা ও কুদরতের সুকোমল পরশ রয়েছে। আর নিহিত রয়েছে, সীমাহীন রহস্য ও হিকমত যা মানুষের ধারণার আল্লাহ এ সম্পর্কে ঘোষণা করেন।

অর্থঃ এরই মধ্যে শিক্ষনীয় রয়েছে দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য[৯৩]।

মানুষ যখন নিজের জন্ম ও অস্তিত্বের কথা চিন্তা করে এবং স্বীয় দেহ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গে'র সুবিন্যস্ত ও সুশৃংখলার কথা চিন্তা করে তখন তার অন্তরে মহান সৃষ্টি কর্তার মহিমা ও কুদরতের

---

[৯২]. সৃষ্টির রহস্য, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৫।
[৯৩]. আল্ কুরআন, সূরা আল্ ইমরান, আয়াত ১৩, (অংশ বিশেষ)

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়। আর স্রষ্টার একত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্ববিনয়ে অবনত মস্তকে মেনে নেয়।

জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ ভাল-মন্দ, উপকারী অনপোকারী বস্তুর তারতম্য করতে পারে। জ্ঞানহীন মুর্খ ব্যক্তি না পারে ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করতে না পারে সৃষ্টির নৈপুন্য অনুধাবন করতে। সে জ্ঞানের অমীয় পরশ থেকে বঞ্চিত। তদপরী সে ও জ্ঞান এবং তার কল্যাণ ও অবদানকে অস্বীকার করতে পারে না।

জ্ঞানের দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ন ও গতিশীল। এর সামনে অনেক অদৃশ্য রহস্যই দৃশ্যমান যেখানে পৌছতে পারে না দৃষ্টিশক্তি, যা শুনতে পায় না শ্রবনশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি যেখানে অক্ষম, অপারগ। সেখানেই পৌছে যায় জ্ঞানের গতিশীল দৃষ্টি। আসমান ও জমিনের বহু বস্তু লোক চক্ষুর অন্তরালে, কিন্তু জ্ঞানের বিস্তৃত দৃষ্টির কাছে তা অতি স্পষ্ট। সৃষ্টির যেসব বস্তু ইন্দ্রিয় শক্তির নিকট প্রচ্ছন্ন বা অদৃশ্য। জ্ঞানের তীক্ষ্ন আলোতেই তা স্পষ্ট ও দৃশ্যমান। যতই জ্ঞানের চর্চা করবে ততই অন্তদৃষ্টির গভীরতা ও বিস্তৃতি ঘটবে। তখন মহাকাশ ও ভূগর্ভের দৃশ্য-অদৃশ্য সকল রহস্য অনাবৃত হয়ে জ্ঞান ও অনুভূতির গন্ডিতে চলে আসবে। মানুষ যখন তার দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করে বা কোন অঙ্গ সঞ্চালনের ইচ্ছা করে তখন তার সাথে সাথেই সে অঙ্গ সঞ্চালিত হয়। আর এ সঞ্চালন এতো দ্রুত হয় যে, এটা নির্ণয় করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে যে, কোনটি আগে হয়েছে ইচ্ছা নাকি সঞ্চালন? অবশ্য ইচ্ছার পরেই সঞ্চালন হয়। তবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ তা'আলা মানুষের ইচ্ছার এতো অনুগত করে দিয়েছেন যে, ইচ্ছার সাথে সাথেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সক্রিয় হয়ে উঠে। যা অধুনা জগতের বিজ্ঞানীদের শেষ গবেষণার ফসল কম্পিউটার কেও হার মানায়। এ জ্ঞান ও অনুভূতি সত্ত্বেও মানুষ তার সৃষ্টি দর্শন ও এর গূঢ় তত্ত্ব পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গ'ম করতে ব্যর্থ।

Dhaka University Institutional Repository

কেননা কখনো সে অজ্ঞতার আবর্তে আবদ্ধ থেকে ও এমন সব জটিল কাজ সমাধা করে ফেলে যা কল্পনার ও অতীত। আবার কখনো ও সে নিজকে মহাপন্ডিত বলে দাবী করে ও এমন সব কাজ করে বসে যার কোন বাস্তবতা নেই এবং এর পরিণতিতে তাকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়।

মানুষ যদি একটু গভীর ভাবে ভাবে যে, জন্মের পূর্বে সে কোথায় ছিল, তবে জন্ম ও জীবনের রহস্য কোথায় নিহিত, কিভাবে তার কণ্ঠ থেকে 'স্বর' সৃষ্টি হচ্ছে? এর উৎস কোথায়। স্বর থেকে কিবাবে অর্থপূর্ণ বর্ণের সৃষ্টি হয়? তার দৃষ্টিশক্তির উৎস কোথায় ? চোখের জ্যোতি কোথা থেকে কিভাবে আসে, কিভাবে তা প্রতিপালিত হয়, বিস্তৃত হয় ? এসব চিন্তা ভাবনায় গভীরতাই তাকে মহান সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল আলামীনের অসীম কুদরত, হেকমত ও নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের সাথে পরিচয় করে দিতে পারে। মানুষকে আল্লাহর পরিচয় খুজে পাওয়ার সুযোগ করে দেয়।

একটি উদাহরণ দ্বারা ও আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা করা যায়। কেহ যদি বলে সমুদ্র পথে একটি জাহাজ দ্রুতগতিতে চলছে। ইহার কোন পরিচালক নেই। যেমন এ কথা অবিশ্বাস্য। পৃথিবী আপনা আপনি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। ইহার কোন পরিচালক নেই। মানুষ প্রকৃত হতে সৃষ্টি হয়েছে। তার সৃষ্টির পিছনে কোন স্রষ্টা নেই। পৃথিবী সৃষ্টির রহস্যে যেমনি একজন স্রষ্টা রয়েছে তেমনি মানুষ সৃষ্টির রহস্যে ও একজন স্রষ্টা রয়েছেন। কারণ সমুদ্র জাহাজ যেমনি চালকাবিহীন চলতে পারে না। তেমনি গোঠা পৃথিবী ও আপন আপনি সুচারুরূপে পরিচালিত হতে পারে না এর পিছনে রয়েছে একজন পরিচালক, তিনিই হচ্ছে মহা-পরাক্রমশালী আল্লাহ।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর অপরিসীম জ্ঞান ঃ

মানুষ যখন নিজের গুনাবলী ও স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করে বুঝতে পারে যে, আল্লাহ কি উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তখন সে স্বীয় সৃষ্টিকর্তার অপরিসীম জ্ঞানের সন্ধানে লাভ করে; জানতে পারে তার জ্ঞান কত পূর্ণ ও কত ব্যাপক। বিশ্বজগতের সকল বস্তুই তাঁর জ্ঞানের অন্তর্গত, কোন পদার্থই তার জ্ঞানের বহির্ভূত নহে; বিশ্বের সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীদিগকে যদি বলা হয়, আল্লাহ যে প্রণালীতে মানুষ দেহে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সৃজন ও সংযোজন করেছেন তোমরা তোমাদের সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান খাটিয়ে তদপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর প্রনালী বাহির কর এবং এ কার্য সমাধা করতে যদি তাদিগকে অসীম আয়ু ও দেয়া হয় তথাপি তা তদপেক্ষ উৎকৃষ্টতর প্রণালী বের করতে পারবে না। এক কথায় বিশ্বের সমস্ত বৈজ্ঞানিকগণ মিলিত হয়ে আল্লাহ যে প্রণালী মানব দেহ- সৃজন করেছেন সে প্রনালীতে সৃজন করতে পারবেনা।

মানব সৃষ্টির আশ্চার্য গঠনের প্রতি লক্ষ করলে আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম জ্ঞান সম্পর্কে বুঝতে এবং জানতে পারা যায়। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা ঃ

অর্থ ঃ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন। তিনি তোমাকে তার ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন[৯৪]।

তার জ্ঞান গোটা আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীকে ঘিরে আছে। অর্থাৎ তিনিই সকল জ্ঞানের উৎস। তিনিই বর্তমান অতীত ও ভভ্যিত সম্পর্কে জানেন। তিনি ছাড়া ভবিষ্যত সম্পর্কে আর কেউ সু-স্পষ্ট ধারণা পেশ করতে পারে না। তার জ্ঞান সম্পর্কে স্বয়ং তিনি বলেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ ঃ সমুদ্র গুলো যদি আমার রবের কথা সমূহ লেখার জন্য কালি হয়ে যেতো তাহলে আমার রবসের কথা শেষ হওয়ার আগেই কালি শেষ যেতো[৯৫]।

অত্র আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ কত মহাজ্ঞানী, যার জ্ঞানের কোন তুলনা চলে না, তার জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করা এবং লেখা শুরু করলে আলোচকের আলোচনা শেষ হয়ে যাবে এবং লিখককে সমস্ত সমুদ্রের পানিকে কালি বানিয়ে দিলেও তার কালি নিঃশেষ হয়ে যাবে। তথাপি আল্লাহর গুন গানের কথা শেষ হবে না।

আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন।

অর্থ ঃ যমীনে যত গাছ আছে, তা সবই যদি কলম হয়ে যেতো, আর সমুদ্র (দোয়াত হতো)। আরো সাতটি সমুদ্র একে কালি সরবরাহ করতো। তা-হলে ও আল্লাহর কথা গুলো (লিখা) শেষ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরক্রমশীল ও মহা-বিজ্ঞানময়[৯৬]।

এ বর্ণনা হতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান জগতের সমস্ত বস্তুকে ঘিরে আছে এবং তিনি সমস্ত অবগত আছেন। যে ব্যক্তি এ সমস্ত যত অধিক অবগত সে আল্লাহর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ও অসীমতা ততই বেশী বুঝতে পারবে।

আল্লাহর অনন্ত দয়া ঃ

মানুষ স্বীয় প্রয়োজন ও অভাবের দিকে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারে যে, সে সর্বদা পর-মুখাপেক্ষী। মানুষ সৃষ্টি থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। পানি, বাতাস, পর্দা, গাছ-পালা, ফল-মূল, তৃণ-লতা, খনিজ সম্পদ জ্ঞান-বিজ্ঞান সকলই মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

---

৯৪. আল্ কুরআন, সূরা ইনফিতার, আয়াত ঃ ৭-৮।
৯৫. আল্ কুরআন, সূরা কাহাফ ঃ আয়াত ঃ ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

আর যে কোন ভাবেই হউন না কেন মানুষ এগুলোর প্রতি মুখাপেক্ষী, এগুলো ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। যেহেতু মানুষ এগুলোর প্রতি মুখাপেক্ষা সেহেতু সে আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষা, কারণ এ সকল বস্তু গুলোর সৃষ্টি কর্তা আল্লাহ।

তিনি মানুষের সর্বপ্রকার অভাব পূরণের উপাদান সামগ্রী পূর্বেই প্রয়োজনমত প্রস্তুত করে রেখেছেন। তিনি উপাদান সামগ্রী পূর্বেই তৈরী করে না রাখলে বা ইহাতে গুন ও উপযোগিতা অগ্রেই সংযোজিত করে না দিলে লোকে স্বীয় অভাব দুর করতে পারতো না। ইহাতে বুঝা যায় যে, এ সমস্তই মানুষের প্রতি পরম করুণাময় আল্লাহর অসীম দয়া ও দান। একমাত্র অনুগ্রহ ও মেহেরবানী পূর্বক এ সকল বস্তু আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার এগুনের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, তাঁর অনন্ত দয়া বিশ্বের সকল পদার্থের উপর ব্যাপক।

এ মর্মে হাদীসে কুদ্‌সিতে বর্ণিত আছে,

অর্থ ঃ আমার (আল্লাহর) অনুগ্রহ আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে। রাসুল (সঃ) এ সম্পর্কে আরো বলেন, "দুগ্ধ পোষ্য শিশুর প্রতি জননীর স্নেহ অপক্ষা বান্দার প্রতি করুণাময় আল্লাহর স্নেহ অধিক"।

মোট কথা নিজ অস্তিত্ব হতে আল্লাহর অস্তিত্ব জানা গেল এবং মানব দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখে আল্লাহর পূর্ন ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেল। আবার ঐ সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন কার্যে আশ্চার্য কৌশল এবং উহাদের উপকারিতা দর্শনে তাঁর অসীম জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গেল। যে সকল বস্তু আমাদের নিতান্ত আবশ্যক, যেগুলি আমাদের আরাম ও

[৯৫] আল্ কুরআন, সূরা লোকমান, আয়াত ঃ ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

সুখদায়ক এবং যে সমস্ত দ্রব্য আমাদের শোভা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, এ সমস্ত তিনি অযাচিত ভাবে দান করেছেন, এ সকল পর্যালোচনা করলে আল্লাহর অপার স্নেহ অপরিসীম দয়া অবগত হওয়া যায়। এ প্রকার আত্মদর্শনই আল্লাহর মা'বেফাত লাভের কুঞ্জি[৯৭]।

আল্লাহর মাহাত্ম্য সৃষ্টির রহস্য ঃ

আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলো মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সবকিছু আল্লাহ তা'আলার পবিত্র ঘোষণা করে, আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা।

"সপ্ত আকাশ ও জমিন এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সমস্ত কিছুই তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর এমন কিছু নেই যা তার প্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয়ই তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমা পরায়ন।"

আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন,

অর্থ ঃ আকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হলো। আর ফেরেশ্‌তাগণ তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং পৃথিবী বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে[৯৮]।

কুরআনের আলোকে বুঝা যাচ্ছে যে, অত্র আয়াত সমূহে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব একত্ব ও অশেষ মহিলার পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষ তার অস্তিত্ব ও অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখতে পারে তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে আল্লাহর অসীম কুদরত ও অশেষ নেয়ামত। মানুষের আবাসস্থল এ পৃথিবী এর সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে অসংখ্য কুদরত ও সৃষ্টি কুশলতার সুনিপূণ কৌশল। উঁচু উঁচু পাহাড় টিলা, বিস্তৃত মাঠ বহমান নদী, আকূল

---

[৯৭] ইমাম গাযালী, সৌভাগ্যের পরশমনি, প্রাগুক্ত।
[৯৮] আল্ কুরআন, সূরা শুসারা, আয়াত-৫।

Dhaka University Institutional Repository

সমুদ্র, গভীর অরণ্য প্রভৃতিতে তার সুস্পষ্ট কুদরতের মহিমা বিদ্যমান। অতল সমুদ্রের অজানা রহস্য। স্থলের উদ্ভিদ ও সুউচ্চ পর্বতমালার প্রতি লক্ষ্য করো। আরো লক্ষ্য করো চতুষ্পদ জন্তু। নভোচর পাখী প্রভৃতির প্রতি। নিসন্দেহে এতে দৃষ্টি বানদের জন্য রয়েছে উপদেশ ও শিক্ষনীয় বিষয়। এসব অসংখ্য সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটন করা আর তার কার্যকারিতা ও উপকারিতা বিশ্লেষণ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

সুবিশাল মহাকাশের তুলনায় এ পৃথিবী একটি বিন্দুর ন্যায়, আর এ মহাকাশে রয়েছে অসংখ্য নক্ষত্র। আকাশের অগনিত নক্ষত্রের মধ্যে সূর্য একটি উজ্জল ও উত্তপ্ত নক্ষত্র, গবেষকদের হিসাবানুযায়ী সূর্য পৃথিবীর তুলনায় একশত ষাট গুন বড়। অধুনা গবেষকদের মতে সূর্য পৃথিবীর তুলনায় চৌদ্দলক্ষ গুনবড়। মহাকাশে এমন অসংখ্য নক্ষত্র রয়েছে যে গুলো পৃথিবীর তুলনায় শত সহস্র গুন বড়।

রাত্রে আকাশের দিকে তাকালে অসংখ্য নক্ষত্র সমুহ এমন ভাবে সুবিন্যস্ত, যেন মনে হয় গোটা আকাশটা আলোক-মালায় পরিপূর্ণ। আকাশে বিদ্যমান এসব তারকার সংখ্যা কোটি কোটি। আবার পৃথিবীর বুক থেকে এসব নক্ষত্রকে অতিকাছাকাছি মনে হলে ও বাস্তবে একটি নক্ষত্র থেকে আরেকটি নক্ষত্রের দূরত্ব লক্ষ কোটি মাইল। এতে মহাকাশের বিশালর সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। পৃথিবী থেকে খালী দৃষ্টিতে নক্ষত্রগুলোকে অতি ক্ষুদ্র ও অনুজ্জ্বল প্রদীপের মত মনে হয়। অথচ নক্ষত্রগুলো পৃথিবী থেকে লক্ষ লক্ষ গুণ বড়। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, এসব নক্ষত্র পৃথিবী থেকে কোটি কোটি মাইল উর্ধ্বে ও দূরে কেননা বস্তুর দূরত্ব যত বৃদ্ধি পায় দৃষ্টিতে তার ক্ষুদ্রতা ও তত বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ ঘোষণা করেন,

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ ঃ "তার কুরসী আসমান ও ভূমন্ডলকে পরিবেশিষ্টত করে রেখেছে[৯৯]।

ইমাম গাযালী (রঃ) বলেন, সৃষ্টির এ বিশালতা, নিপুণ কুশলতা, সুবিশাল মহাকাশ বিস্তৃত ভূমি, অকূল সমূদ্র, গভীর অরণ্য, সর্বত্র মনোযোগী ও মননশীল দৃষ্টি নিয়ে তাকাও, ভাবো। চিন্তা করো, এ সবের একক সৃষ্টিকর্তার কথা, দেখবে ক্রমশঃ অনুভব ও অনুভূতির বন্ধ দ্বারগুলো যাবে। সেই উন্মুক্ত দ্বারের মসৃন পথ ধরেই তুমি লাভ করতে পারবে নিরংকুশ শক্তির অধিকারী এক ও অদ্বিতীয় লা-শারীক আল্লাহর বিশুদ্ধ পরিচয়[১০০]।

গাযালী (রঃ) এর মতে, আত্মা ও সৃষ্টির রহস্য এবং আল্লাহর অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্কে মীমাংসা করার বিষয় নয়, বরং এরূপ একটা চেষ্টা করা ও অন্যায়। আল্লাহর অস্তিত্ব ও সৃষ্টির রহস্য অনুভূতির বিষয়। পরম সত্য ও অনন্তকে যুক্তি দিয়ে বুঝার কোন অবকাশ নেই। তার মতে যুক্তি দিয়ে আপেক্ষিকতা বুঝা যায় মাত্র। তিনি সকল প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন কুরআন, হাদীস ও তারই ভিত্তিতে নিজের বিবেক বুদ্ধির সাহায্যে[১০১]।

---

[৯৯] আল্ কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ১৫৫, (অংশ বিশেষ)

[১০০] ইমাম গাযালী, সৃষ্টির রহস্য, অনুবাদক বশির মেসবাহ, প্রাগুক্ত।

[১০১] ফজলুর রহমান আশরাফী, বিশ্বের মুসলিম মনীষীদের কথা, ঢাকাঃ আর, আই, এস পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭, পৃঃ ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ঈমান

আল্লাহর মা'রেফাত ও তাঁর তওহীদ বা একত্ব সম্বন্ধে অভিহিত থাকা সত্ত্বেও যা আল্লাহর পথের পথিক হওয়ার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় উহা হলো ঈমান না থাকা অথবা ঈমানের অসম্পূর্ণতা অথবা ঈমানের দূর্বলতা। যতদিন পর্যন্ত মানুষ উক্ত মা'রেফাত এবং তাওহীদের প্রতি প্রকৃত পক্ষে ঈমান গ্রহণ না করে ততদিন পর্যন্ত তার এ জাতীয় জ্ঞান কোন উপকারেই আসবে না। যথার্থ এবং পরিপূর্ণ ঈমানের অভাব থাকলে মানুষের কোন আমলেই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না।

এ জাতীয় লোকের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন।

"হে বিশ্বাসীগণ! (সরলান্তকরণে) ঈমান গ্রহণ কর আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের উপর এবং সে কিতাবের প্রতি যা রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন"।

আরো এরশাদ করেন,

গ্রাম্য আরববাসীরা বলে, আমরা (আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের প্রতি) ঈমান এসেছি। আপনি তাদিগকে বলে দিন। তোমরা ঈমান আন নাই বরং বল যে, আমরা মৌখিকভাবে মেনে নিয়েছি। এখনও তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করে নাই।

কারণ, মানুষ যখন অন্তরের সাথে ঈমান গ্রহণ করে, তখন তাদের অন্তঃকরণ ঈমানের নুরে আলোকিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ঈমানের সংজ্ঞা ঃ

ঈমান (আমানুন) শব্দ থেকে ঈমান এসেছে, অর্থ আত্মার প্রশান্তি ও মুক্তি লাভ। এখান থেকে "আমানত" শব্দের উৎপত্তি, যার মধ্যে খেয়ানতের কোন সম্ভবনা নাই। ঈমান থেকে "আমিন" শব্দ এসেছে অর্থ বিশ্বাস।

ঈমান মূলত মানুষের মনের ভিতরে কতিপয় কথা বা চিন্তা যা গভীর প্রত্যয় ও দৃঢ়ভাবে মেনে নিতে হয়। তাই ঈমান, চরিত্র ও মানসিক ভিত্তিকে ঈমান বলে। বিভ্রান্তি মুক্তচিন্তা ও দৃঢ়তাই মূলত মানুষের চরিত্রকে গঠন করতে পারে। এটাকে ঈমান বলে। ফকীদের মতে ঃ গোপন বিশ্বাসকে ঈমান বলে। শাব্দিক অর্থ ঃ প্রত্যয় বা দৃঢ় বিশ্বাস, কালাম শাস্ত্রের পরিভাষায় ঈমানকে আকিদা বলে। যার অর্থ এবাত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা।

অভিধান মতে, ঈমানের অর্থ কোন কিছুকে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করা এবং যে সম্বন্ধে দৃঢ়তার সাথে প্রত্যয় রাখা[১০২]।

ঈমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পবিত্র কুরআন দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। একটি ঈমান অন্যটি গায়ব। শব্দ দু'টির অর্থ যথাযত ভাবে অনুধাবন করলেই ঈমানের পুরোপুরি তাৎপর্য ও সংজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে।

ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, কারো কথাকে তার বিশ্বস্ততার নিরিখে মনে প্রাণে মেনে নেয়া, এজন্যই অনুভূতিগ্রাহ্য ও দৃশ্যমান কোন বস্তুতে কারো কথায় বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান নয়।

---

[১০২] এসলাহে নফস, প্রাগুক্ত, পৃ-৮।

Dhaka University Institutional Repository

শরীয়তের পরিভাষা ঃ রাসুল (সঃ) এর কোন সংবাদ কেবলমাত্র রাসুলের উপর বিশ্বাস বড়ঃ মেনে নেয়াকেই শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলে[১০৩]।

তাফসীরকরকগনের মতে, মুখে স্বীকৃতি, অন্তরে বিশ্বাস এবং বাস্তবে কার্যকরী হওয়া কে ঈমান বলে। অন্যান্য তাফসীর কারকগণের মতে কর্মের একাত্রকরণই হচ্ছে ঈমান।

ঈমান বিল গায়ের ঃ

ঈমান বিল গায়ের দ্বারা সে সমস্ত বিষয়কেই বুঝানো হয়েছে সেগুলোর সংবাদ রাসুল (সঃ) দিয়েছেন এবং মানুষ যে সমস্ত বিষয়ে স্বীয় বুদ্ধি বলে ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান লাভে সম্পূর্ণ অক্ষম।

অদৃশ্য শব্দ দ্বারা ঈমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব ও সত্তা সিফাত বা গুনাবলী এবং তাদীর সম্পর্কিত বিষয় সমূহ, বেহেশত দোযখের অবস্থা, কিয়ামত এবং কেয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘটনা সমূহ, ফেরেশতাকুল সমস্ত আসমানী কিতাব, পুর্ববর্তী সকল নবী ও রাসুলগণের বিস্তারিত বিষয় অন্তর্ভূক্ত। ঈমান বিল গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাসের অর্থ এ দাঁড়ায় যে, রাসুল (সঃ) যে হেদায়াত এবং শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, সে সব গুলোকে আন্তরিক ভাবে মেনে নেয়া। তবে শর্ত হচ্ছে যে, সে গুলো রাসুলের (সঃ) শিক্ষা হিসেবে অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হতে হবে।

আকায়েদে তাহাবী ও আকায়েদে নফসী'তে ইহাকে ঈমানের সংজ্ঞা হিসাবে অভিহিত করেছেন। এতে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যে, শুধু জানার নামই ঈমান নয়। কেননা খোদ ইবলিস এবং অনেক কাফের ও

---

[103] তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, পৃ-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

রাসুল (সঃ) এর নবুওয়াত যে সত্য তা আন্তরিক ভাবে জানতো, কিন্তু না জানার কারণে তারা ঈমানদারের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে নি।

ঈমাম শা'ফেয়ী, ঈমান মালেক, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল প্রমুখ মনীষীদের মতে ঈমান অর্থ মুখে স্বীকার করা, অন্তরে বিশ্বাস করা এবং সে মতে আ'মলকরা ইমান আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম ইউসুফ, দাউদ তায়ী, সূফী ইব্রাহিম ইবন আদহাম প্রমুখ এর মতে মুখে স্বীকার করা অন্তরে বিশ্বাস রাখার নাম ঈমান।

যদি কারো ও অন্তরে আল্লার প্রেম প্রবিষ্ট হয় এবং তার অন্তরচক্ষু আল্লাহকে দেখে, তবে সে কোন মতেই আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অমান্য করে অবাধ্য হতে পারে না। পক্ষান্তরে যার অন্তর আল্লাহর আদেশ-নিষেধের প্রতি বেপরোয়া এবং অমনোযোগী সে বাহিরে যতই আল্লাহর মা'বেফাত এর দাবী করুক না কেন, সে তো নিতান্তই মিথ্যাবাদী। সে অন্তরে আল্লাহর পরিচয় লাভ করেছে সে অন্তরেই আল্লাহর মহব্বত বদ্ধমূল হয়েছে। সে অন্তরই আল্লাহর আদেশ নিষেধ সসম্মানে পালনের জন্য বদ্ধপর করা হয়েছে।

আল্লাহকে যথার্থ ভাবে ভালবাসা হলো অন্তরকে তাওহীদের আলোকে আলোকিত করা, চক্ষু দ্বারা যে দিক তাকায় সেদিকেই আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে দেখে উপদেশ গ্রহণ করা, কান দ্বারা তারাই অমিয় বাণী শ্রবন করা, মুখের দ্বারা তারই প্রশংসায় নিয়োজিত *রাখা। এমন ব্যক্তি যখন* কা বলে সত্য বলে, হারাম বস্তু দ্বারা উদর পূর্তি করে না এবং সারা দেহ-মন আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু হতে বিচ্ছিন্ন ও বিমুখ করে আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তার অবাধ্যতা হতে সরে থাকে। যেখানে ঈমানের নূর আছে সেখানে কোন প্রকার নাফসানিয়াত বা রিপু থাকতে পারে না[১০৪]।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি যে, বান্দার যাবতীয় পাপ-পূণ্য ও ভাল-মন্দ কাজের সৃষ্টি কর্তা আল্লাহ। কিন্তু ইহার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ আমাদিগকে অসৎ কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। পাপ-পূণ্য সৃষ্টির সাথে সাথে তিনি তাকদীরের স্রষ্টা। মানুষের ভাগ্য লিপির কোন প্রকার পরিবর্তন হবে না। আগামী কালের জন্য আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন উহা আজ কোন মতেই তোমার অধিকারে আসবে, এসব গুলো বিশ্বাস করার নাম ঈমান[১০৪]।

ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য ঃ

কোন বস্তুতে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন ঈমান এবং কারো অনুগত হওয়াকে ইসলাম বলে। ইসলামের আধার হলো অন্তর, ইসলামের আধার অন্তরসহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কিন্তু শরীয়াতে ঈমান ব্যতীত ইসলাম এবং ইসলাম ব্যতীত ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাও তাঁর রাসুল (সঃ) এর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ যোগ্য নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিশ্বাসের মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে কর্মের দ্বারা আনুগত্য ও তা'বেদারী প্রকাশ করা হয় না।

আভিধানিক অর্থে ঈমান ও ইসলাম স্বতন্ত্র অর্থবোধক বিষয়বস্তুর অন্তর্গত পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন-হাদীসে ঈমান ও ইসলামবিহীন ঈমান অনুমোদন করেনা[১০৫]।

ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পন করা; ইসলাম শব্দের ব্যাখ্যা স্বরূপ আলোচনা করা হলো।

"This implies (1) Faith, (2) Doing right, being an example to others to do right, and having the power to see that the right prevails, (3) eschewing wrong, being an example to others to eschew wrong and having the power to

---

104 এসলাহে নাফস, প্রাগুক্ত, পৃ -১০।
105 এসলাহে নফস, প্রাগুক্ত, পৃ-১১।

Dhaka University Institutional Repository

see that wrong and injustice are defeated, Islam therefore lives not fore itself but for mankind."[107]

প্রকাশ্য আনুগত্যের সাথে যদি অন্তরের বিশ্বাস না থাকে, তবে কুরআনের ভাষায় একে 'নেফাক্ব' বলে। নেফাক্বকে কুফর হতে ও বড় অন্যায় সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা।

"নিশ্চয়ই মুনাফিকেরা দোযখের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থান করবে", অনুরূপ ভাবে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে যদি মৌখিক স্বীকৃতি এবং আনুগত্য না থাকে, কুরআনের ভাষায় একে কুফরী বলা হয়।

আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা।

তারা আমার নিদর্শন বা আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে, অথচ তাদের অন্তরে এর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। তাদের এ আচরণ কেবল অন্যায় ও অহংকার প্রসূত।

ঈমান ও ইসলাম এর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। দু'টাই এক, তার প্রমাণ স্বরূপ অত্র আয়াত পেশ করা হলো।

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদেরকে দয়াময় আল্লাহ তা'আলা ভালবাসা দিবেন, (মারইয়াম ৯৬)

শুধু ঈমানের অধিকারী হলে সে আল্লাহর ভালবাসা পাবে না আবার শুধু ইসলামের অধিকারী হলে আল্লাহর ভালবাসা পাবে না। অত্র আয়াতে সৎকর্ম সম্পাদন দ্বারা ঈসলামকে বুঝানো হয়েছে।

---

[106]. তাফসীরুল মা'আরেফুল কুরআন, পৃ-১৪।

[107]. The Holy Quran-English translation of the meanings and Commentary Under the auspices of the Ministry of Hajj and Endowments. The Kingdom of Saudi Arabia, page-173.

Dhaka University Institutional Repository

ঈমান ও ইসলামের ক্ষেত্র এক হলে ও আরম্ভ ও শেষের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। অর্থাৎ ঈমান যেমন অন্তর থেকে শুরু হয় এবং প্রকাশ্য আ'মলে পৌছে পূর্ণতা লাভ করে, তদ্রুপ ইসলাম ও প্রকাশ্য আ'মল থেকে আরম্ভ হয় এবং অন্তরে পৌছে পূর্ণতা লাভ করে। অন্তরের বিশ্বাস প্রকাশ্য আ'মল পর্যন্ত না পৌছালে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। অনুরূপ ভাবে প্রকাশ্য আনুগত্য ও তাবেদারী আন্তরিক বিশ্বাসে না পৌছালে গ্রহণ যোগ্য হয় না। ইমাম গযালী এবং ইমাম সুরকী ও এ মত পোষণ করেছেন।

'আকিদা' এবং 'রায়' এর মধ্যে পার্থক্য ঃ

'আকিদা' আরবী শব্দ, অর্থাৎ একত্ব বাদে বিশ্বাস স্থাপন করা, আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং তার পবিত্র নাম ও সিফাতের প্রতি ঈমান পোষণ করার নাম 'আকিদা, তিনি এক বা একক তার কাজে কোন অংশিদারিত্ব নাই। তিনি যখন যা ইচ্ছা তা করেন, তিনি 'কুন' (হও) শব্দ দ্বারা গোটা আসমান-জমিন ও তার মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান রয়েছে সব কিছু ক্ষণিকে সৃষ্টি করেছেন। এ দুনিয়াই শেষ নয়, কবর থেকে শুরু পরকালের সূচনা, একথায় দুনিয়ার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে অবশেষে 'আদালত এলাহী' বা আল্লাহর বিচারালয়ে উপস্থিত হতে হবে। যেখানে তিনি ঘোষণা দিবেন "আজকের দিনের বাদশাহী কার জন্য" গোটা হাশরের ময়দান নিস্তব্ধ থাকবে, কোন উত্তর আসবেন না, অতঃপর আল্লাহ তা'আলার আবার গোস্বার সাথে ঘোষণা করবেন।

এসব গুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নাম "আকিদা" বা বিশ্বাস। রায় ঃ "শব্দটি" আরবী অর্থ মানুষের মনের চিন্তা, বা মানুষের চিন্তার বেলার জিনিস। রায়কে মতবাদ বলে। মতবাদ সৃষ্টির জন্য শর্ত হলো বর্তমান, অতীত ভবিষ্যত সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা থাকা, আর ইহা আল্লাহ ছাড়া কেহ জানে না। অতঃপর মতবাদ সৃষ্টি করা কোন মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। যারা বিভিন্ন মতবাদের প্রবক্তা হিসেবে নিজেদের পরিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছেন, তারা মানবতার মুক্তির জন্য আজ পর্যন্ত এমনকোন মতবাদ পেশ করতে পারে নাই। যা সকল যুগে গ্রহণীয় হতে পারে। দেখা যায় তাদের মতবাদ কোন যুগের গ্রহনীয় হলে, অন্য যুগে এসে ইহা নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আবার তাদের এ মতবাদে বিরুদ্ধে অন্যান্য প্রবক্তারা কলম ধরে। তার ভূল গুলো মানব সমাজে উত্থাপন করে। পক্ষান্তরে আল্লাহর তা'আলার মনোনীত ধর্ম ইসলাম যা গোটা মানব জাতির পাথেয়। ইহা এমন মতবাদ যা পৃথিবীর সৃষ্টি হতে আজ পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় সকল কাল ও যুগের সময়পযোগী জীবন ব্যবস্থা। আজ পর্যন্ত কোন যুগ কালের বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ধর্মীয় প্রবক্তা ইহাতে ভূল খুজে পায় নেই। কারণ ইসলাম ধর্মের প্রবক্তা আল্লাহ তা'আলা বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যত সম্পর্কে অভিহিত।

কোন বিষয় ঈমান থাকতে হবে ঃ

আল্লাহর রাসুল, আখেরাতের ফেরেশতা ও কিতাবের প্রতি ঈমান থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নাম ও গুণাবলী প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) পর্যন্ত যত নবী ও রাসুলের আগমন হয়েছে, সবার প্রতি বিশ্বাস এবং তাদের উপর অবতীর্ণ কিতাব সমূহে ঈমান আনা, ফেরেশতারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। তাদেরকে মানুষের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে দেয়া হয়েছে। তাঁরা নুরের তৈরী, তাদের প্রতি ও ঈমান থাকতে হবে। এক কথায় তাওহীদ, রেসালাত, আখেরাত ও ইসলাম এর প্রতি ঈমান থাকতে হবে।

আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা।

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পূণ্য নাই, কিন্তু পূণ্য আছে কেহ আল্লাহ পরকাল, ফিরিশতা গণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগনে ঈমান আনায়ন করলে[১০৮]।

---

[১০৮] তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, পৃ-১৪৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

তাওহীদ ঃ

তাওহীদ শব্দটি আরবী, অর্থ একত্ববাদ থেকে তাওহীদের উৎপত্তি, (ওহাদুন) শব্দের অর্থ এক থেকে (ওয়াহেদুন), (আহদুন) এবং (ওয়াহেদুন) উভয় শব্দের অর্থ এক।

আল্লাহ তা'আলা এক তার মধ্যে একাধিকত্বের কোন সম্ভাবনা নেই এবং তার কোন তুল্য নাই। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। অর্থাৎ একত্ববাদের বিশ্বাসকে তাওহীদ বলে।

"বলুন, তিনি আল্লাহ এক, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয় নি, এবং তার সমতুল্য কেউ নেই। (ইসলাম-১-৪)।

তাওহীদের মূল উৎস ঃ

কালেমা,

আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রাসুল কালেমায় দু'টি অংশ, একটি একত্ববাদের ঘোষণা অন্যটি রেসালতের ঘোষণা, আল্লাহ তা'আলার কোন অংশিধারিত্ব নেই, তিনি একক সত্তার অধিকারী। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) শেষ নবী, তারপর আর কোন নবী বা রাসুলের আগমন হবে না। প্রথম অংশে দু'টি শব্দ এলাহ ও আল্লাহ, আল্লাহ শব্দটি এমন এক সত্তার নাম যিনি চিরকাল আছেন এবং চির কাল থাকবেন। তিনি সর্বগুনের আধার ও সর্বদোষ থেকে মুক্ত। আল্লাহ শব্দটি ও এলাহ শব্দ থেকে উৎপত্তি, এলাহ শব্দটির ব্যাখ্যা করা হলো।

১. এলাহ শব্দের অর্থ পৃষ্ঠপোষক, যাবতীয় প্রয়োজন পূরণকারী, বিপদ দূরকারী যাবতীয় কাজ সম্পাদন কারী।

২. আশ্রয়দানকারী, সাহায্য ও সংরক্ষণকারী, ফরিয়াদ শ্রবন ও গ্রহণকারী।

Dhaka University Institutional Repository

৩. শান্তি ও স্বস্তিদানকারী, লাভ ও ক্ষতির মালিক, যার উপর ভরসা করার যায়

৪. উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী, সকল ক্ষমতার অধিকারী, সকল ব্যবস্থাপনার একক প্রভাব প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার অধিকারী।

৫. শ্রদ্ধা পাবার অধিকারী।

৬. তাঁর সত্ত্বা রহস্যাবৃত্ত হওয়া।

৭. তাঁর প্রতি মানুষ আজ্ঞাংকিত হওয়া।

৮. রাজাধীরাজ, আদেশ নিষেধদাতা, আইনদাতা।

৯. গাইরুল্লাহর সার্বভোমত্বের আনুগত্যকে অস্বীকার করা।

কালেমা তুয়েবার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এমন শব্দ প্রয়োগ করেছেন, যার ব্যাখ্যা করে শেষ করা যাবে না, এখানে শুরু "এলাহ" শব্দটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

ঈমান বিনাশের কারণ ও তার প্রতিকার ঃ

বিভিন্ন দার্শনিকেরা নবীর প্রতি মৌলিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করে ধর্মকে দর্শনের সাথে মিশিয়ে তার বিশুদ্ধতা নষ্টকরে থাকে, তারা আসলে অনুপ্রেরণার অস্তিত্বেই বিশ্বাসী, কারণ, তাদের মতে নবী হচ্ছে শুধু একজন মনীষী, কোন মহত্তর ভাগ্যবিধাতা যাকে পাঠিয়েছেন মানুষদের সৎ পথে চালিত করার জন্য। আর এ মতবাদ নবুয়াতের আসল অর্থটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে[১০৯]। এতে করে তাদের ঈমান বিনাশ হয়ে যায়। আবার স্বাভাবিক আচার আচারণে ও শেরেকী হয়ে যায়। যেমন, যখন মানুষ কোন বাস দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায়, তখন বলে, গাড়ী চালক অভিজ্ঞসম্পন্ন হওয়ার কারণে দূর্ঘটনা থেকে বাঁচা গেল, অথচ এখানে সরাসরী আল্লাহ তা'আলা রহমত করেছেন। মানুষের এ ধারনার কারণে ঈমান বিনাশ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সত্যকার জ্ঞানী ব্যক্তি কেবল সাবধানতার অভাবেই পাপ করে থাকেন। যদি তারা আরো সচেতন হতো এবং ভালভাবে চিন্তা করতো তাহলে ঈমান বিনাশ হওয়া রক্ষা পেত।

রিসালত ঃ

পথহারা মানবতার হেদায়াত এর জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী বা রাসুল প্রেরণ করেছেন। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে অধিক ভালবাসেন, সেহেতু তাদের মুক্তির জন্য তাঁর নির্বাচিত বান্দা প্রেরণ করেন। আর এ নবী-রাসুলদের দায়িত্ব ছিল মানবজাতিকে আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করা। তাদের জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব সম্পর্কে সতর্ক করা জান্নাতের সু-সংবাদ সম্পর্কে জানানো। আর নবী রাসুলগণ মানব জাতির হাদী বা পথ প্রদর্শক। মানবতার মুক্তির জন্য দু'ধরনের গাইড, একটি পূনাঙ্গ, অন্যটি অপূনাঙ্গ। আল্লাহর নবী-রাসুল হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ গাইড, আর আকল (বুদ্ধি) হচ্ছে অপূনাঙ্গ গাইড।

অপূনাঙ্গ গাইড ঃ

(আকল) মানুষের অপূনাঙ্গ গাইড বা পরিচালক। আকল বা বুদ্ধি মানুষকে পরিচালনা করে বটে তবে পূর্ণাঙ্গ ভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম। বুদ্ধি সঠিক ভাবে পরিচালন করলে আর নবী-রাসুলদের আগমনের প্রয়োজন হতো না। বুদ্ধি মানুষকে অসৎ পথেও পরিচালনা করে, যেমন আবু লাহাব তৎকালিন সময় মক্কায় শ্রেষ্ঠ বুদ্ধির অধিকারী ছিল। তার থেকে মক্কাবাসী বুদ্ধি নিত, তাকে সে সময়কার বুদ্ধিজীবি হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো, তার উপনাম ছিল আবুল হাকাম, অর্থাৎ জ্ঞানীর পিতা, অথচ তার আকল তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়। যার কারণে তাকে জাহান্নামে এর অধিবাসী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

[illegible]. সত্যের সন্ধান, প্রাগুক্ত, পৃ-৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

আবার হযরত ইব্রাহিম (আঃ) তাঁর বুদ্ধির আলোকে আল্লাহর পরিচয় খুঁজে পান। তিনি প্রথমে তারকারাজীকে প্রভূ হিসেবে ঘোষণা করেন। অতঃপর যখন তারকারাজী বিলুপ্ত হয় তখন তিনি চাঁদ দেখে মনে করলেন ইহাই প্রভূ। চাঁদ যখন বিলুপ্ত হল তখন তিনি উজ্জল মুখী সূর্য দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে যেহেতু ইহা সবচেয়ে বড়, ইহাই প্রভূ। যখন ইহাও বিলুপ্ত হলো, তখন তিনি চিন্তাশুরু করেন দেন, ঐ মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে "আকল" বা বুদ্ধি তাকে সঠিক পথে সন্ধান দেয়। অতঃপর তিনি ঘোষণা করেন।

আমি একনিষ্ঠ ভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি, যিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নহে। (আন'য়াম-৭৯)। এতে করে বুঝা গেল, 'আকল' অপূনাঙ্গ গাইড। যদি পূনাঙ্গ গাইড বা পরিচালক হতো তা হলে আবুলাহাব ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হতো না।

রাসুল (সঃ) ঘোষণা করেন, আল্লাহ প্রথমেই যা সৃষ্টি করেছেন, তা বুদ্ধি। তিনি বুদ্ধিকে বলেন, নিকটে এসো উহা নিকটে আসলো, তারপর তিনি উহাকে বললেন, পশ্চাতে চলে যাও, উহা পশ্চাতে চলে গেল, তারপর মহান আল্লাহ বললেন, আমার গৌরবের ও সম্মানের শপথ! আমি তোমার চেয়ে আমার নিকট অতি সম্মানিত আর কিছুই সৃষ্টি করি নাই। তোমার কারণে আমি গ্রহণ করিম, তোমার কারণে আমি দান করি, তোমার কারণে আমি পুরস্কার দেই এবং তোমার কারণে আমি শাস্তি দেই। (আল হাদীস)

পূর্ণাঙ্গ গাইড ঃ

নবী রাসুলগণ হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ গাইড। যেখানে বুদ্ধি কাজ করে না সেখানে অহীর প্রয়োজন। যেখানে আকল নিস্ক্রিয় হয়ে যায় সেখানে কুরআন প্রদীপের ন্যায় কাজ করে। আর কুরআনের বাহন হচ্ছে নবী-

Dhaka University Institutional Repository

রাসুল। মানুষ যখন বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দেয়, জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। বিপথে চলা শুরু করে দেয়, অন্যায়কে অন্যায় বলে বুঝার শক্তি হারায় ফেলে দয়া মায়া বিলুপ্ত হয়ে যায়। নির্যাতনের পর অনুশোচনা শক্তি বিকল হয়ে যায়, যে মুহূর্তে জ্ঞান শক্তি ও বিবেকবুদ্ধি কোন কাজে আসে, সে মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বাহন নবী বা রাসুল প্রেরণ করেন। যারা জ্ঞান শূন্য মানুষকে জ্ঞান দান করেন। বুদ্ধিহীন মানুষকে বুদ্ধি দেন। বিপথগামী মানুষকে সু-পথ দেখান। নবী-রাসুল এর আগমনের উদ্দেশ্য হলো পথহারা মানুষকে সঠিক পথের অনুসারী করে তোলা।

আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা

"আমি আমার রাসুল গণকে সুস্পষ্ট নিদর্শন সহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে, অন্যত্রে তিনি ঘোষণা করেন।

"সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে। যেন রাসুল পাঠাবার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে লোকদের যুক্তি না থাকে। আর আল্লাহ তো সর্বাবস্থায়ই পরাক্রমশালী ও কুশলী" (নেসঃ ১৬৫)

আল্লাহ তা'আলার বিধান মেনে চলার জন্য নবী-রাসুলদের আগমন, সরাসরী মানুষের নিকট তাঁর বিধান প্রেরণ করা যায় না। তাই তিনি মানুষদের মধ্যে কিছু লোক নির্বাচন করেছেন। তারাই আল্লাহর প্রেরিত পুরুষগণ আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা।

তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের যে নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যার উপদেশ তিনি নূহ (আঃ) কে দিয়েছেন। আর আমি তোমার প্রতি অহীর মাধ্যমে যা পাঠায়েছি, যার নির্দেশ আমি ইব্রাহীম (আঃ) মুসা ও ঈসাকে দিয়েছিলাম। তা হচ্ছে, তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং এতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ো না। (শুরা ঃ ১৩)।

Dhaka University Institutional Repository

রেসালতের মূল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর জমিনে তার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করা যাতে করে গোটা দুনিয়া বাসী তার আনুগত্য স্বীকার করার সুযোগ পায়। দুনিয়াতে থেকে সকল প্রকার অশান্তি দূর হয়ে শান্তি আসতে পারে। মানুষ সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য যা যেন সফল হতে পারে।

আখেরাত ঃ

"আখেরাত" আরবী শব্দ, যার অর্থ পরকাল, আখেরাত বলতে পরকালের সে আবাসস্থলের কথা বলা হয়েছে। যার শুরু আছে শেষ নাই। তাকে কুরআন পাকে "দারুল ক্বারার' স্থায়ী আবাসস্থল নামে উল্লেখ করেছেন। সমগ্র কুরআন তার আলোচনা ও তার ভয়াবহতার বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

আখেরাতের দু'টি অবস্থা

ক) মৃত্যুর সাথে সাথে সারম্ভ, রাসুল (সঃ) ঘোষণা করেন।

"যখন মানুষ মারা যায়, তখনই তার জন্য কিয়ামত শুরু হয়"।

খ) শিংড়া ফুঁ দিয়ে আখেরাতে চূড়ান্ত অবস্থা।

যে সব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য সেগুলোর মধ্যে এ বিষয়টি মধ্যাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া ঈমান অনুযায়ী 'আমল করার প্রকৃত প্রেষণা ও এখান থেকে সৃষ্টি হয়। ইসলামী আকায়েদগুলোর মধ্যে আখেরাতে প্রতি ঈমান আনা একটা বৈপ্লবিক বিশ্বাস, যাদুনিয়ার রূপ পাল্টে দিয়েছে। এ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়েই ওহীর অনুসারীগণ প্রথমে নৈতিকতা ও কর্মে এবং পরবর্তীতে ব্যক্তিগত, সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পর্যন্ত দুনিয়ার অন্যান্য সকল জাতির মোকাবেলায় একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয়েছে। যেসব লোক জীবন ও এর ভোগ বিলাসকেই জীবনের চরমলক্ষবলে গণ্য করে, জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে যে উক্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, সে তিক্ততাকেই সর্বাপেক্ষা কষ্ট বলে মনে করে, আখেরাতের জীবন, যেখানকার হিসাব নিকাশ, শাস্তি ও পুরস্কার প্রভৃতি সম্পর্কে যাদের এতটুকু ও আস্থা নেই তারা যখন সত্য

Dhaka University Institutional Repository

মিথ্যা কিংবা হালাল হারামের মধ্যে পার্থক্য করাকের তাদের জীবনের সহজ স্বচ্ছন্দ্যের পথে বাধা রূপে দেখতে পায়, তখন সামান্য একটু সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের বিনিময় সকল মূল্য বোধকে বিসর্জন দিতে এতটুকু ও কুণ্ঠাবোধ করেনা এমতাবস্থায় এ সমস্ত লোককে যে কোন দুষ্কর থেকে বিরত রাখার মত আর কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

আখোতের প্রতি ঈমানই এমন এক কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বিধি, যা মানুষকে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সর্বত্রই যে কোন গর্হিত আচরণ থেকে যে কোন অত্যন্ত কার্যকরভাবে বিরতরাখে। আর অন্তরে এমন এক প্রত্যয়ের অম্লান শিখা আবিরাম সমুজ্জ্ব করে দেয় যে, মানুষ যে কোন অবস্থায় থাকুন না কেন, তার সকল আচরণ, সকল অভিব্যক্তি, এমনকি অন্তরে লুক্কায়িত প্রতিটি আকাঙ্খা পর্যন্ত সর্বত্র বিরাজ মনে এ মহান স্বত্তার সামনে রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা,

"যখন কেয়ামতের ঘটনা ঘটবে। সার বাস্তবতার কোন সংশয় নেই। এটা নিচু করে দিবে, সমুন্নত করে দিবে। যখন প্রবল ভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। অতঃপর তা হয়ে যাে উৎক্ষিপ্ত ধুলিকণা (আল ওয়াক্বিয়াঃ ১-৬)।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ আত্মার পরিচয়

আত্মার জ্ঞানই আল্লাহর জ্ঞানের কুঞ্জি। আত্মার পরিচয়ের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় লাভ করা যায়। এ সম্পর্কে জ'নেক মনীষীর বাণী।

অর্থ ঃ "যিনি নিজকে চিনেছেন তিনি আল্লাহকে চিনেছেন"।

ইমাম গাযালী (রঃ) আত্মার পরিচয়ের উপর স্বীয় গ্রন্থ "সৌভাগ্যের পরশমনি" তে আত্মদর্শন একটি অধ্যায় উপস্থাপন করেন। তাঁর চিন্তার আলোকে নিম্নে আত্মার পরিচয়ের উপর আলোকপাত করা হলো।

আত্মা কি জিনিস এবং উহার স্বাভাবিক গুন কি, বর্ণনা করবার অনুমতি শরীয়তে নেই। এজন্য রাসুল (সঃ) আত্মার ব্যাখ্যা করেন নি। আত্মা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন।

"আর লোকেরা আপনাকে আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞাস করতেছে, (হে রাসুল) আপনি বলুন, আত্মা আমার প্রভূর হুকুম"[১১০]।

শরীরের আভ্যন্তরীন মূল বস্তুকে "দিল" বা আত্মা বলা হয়, 'দিল' কে কখন 'রূহ' আবার কখন 'নফ্স' ও বলা হয়। মানুষের বক্ষস্থলের ভিতরে বাম পার্শে যে এক টুকরা গোশ্ত আছে। এ আলোচনায় "দিল" শব্দে তাকে লক্ষ্য করা হবে না। এ গোশ্তখন্ডের মূল্যই বা কি ? ইহা তো পশুদের ও আছে এবং মানবদেহে ও থাকে। এ গোশ্ত খন্ডকে হৃদপিন্ড বলা হয়। বুকের মধ্যে যা ধুপধুপ করছে, ইহা আত্মা নয়, আত্মা ভিন্নবস্তু, হৃদপিন্ডের সহিত আত্মার কোন সম্পর্ক নেই, হৃদপিন্ডটি একটি গোশ্ত পিন্ড মাত্র। শরীর ধ্বংস হয়, আত্মা ধ্বংস হয় না। মৃত্যুর পরও

---

[১১০] আল্ কুরআন হারুনুর রশিদ, মুসলিম মনীষীদের ছোট বেলা, ঢাকাঃ এম. এইচ পাবলিকেশন্স, পৃ-৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

আত্মা জীবিত থাকে[১১১]। মানুষের মূল বস্তু দিল বা আত্মা এ চর্মচক্ষে দেখা যায় না। যা চর্মচক্ষে দেখা যায় তা জড়জগতের অন্তর্গত। আত্মা জড়জগতের পদার্থ নহে, তবে এ জগতে মুসফিরের ন্যায় এসেছে। ঐ গোশ্‌স খন্ড বা হৃদপিন্ড আত্মার বাহন বা হাতিয়ার এবং শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইহার লস্কর এবং ইহা সমস্ত শরীরের অপ্রতিহত বাদশাদ[১১২] বিবেক আত্মার প্রধান মন্ত্রী।

আল্লাহর সা'রিফাত লাভ ও তার অতুলনীয় সৌন্দর্যদর্শনই এ আত্মার স্বভাব। ইহার উপরই ইবাদতের দায়িত্বভার রয়েছে। ইহাকে লক্ষ্য করে আদেশ নিষেধ প্রচারিত হয়েছে। আর এ জন্যই ইহাকে স্বর্গীয় আদেশ বলা হয়। পাপ-পুন্যের ফল ইহাকে ভোগ করতে হবে। ইহার অদৃষ্টেই সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য নির্ধারিত আছে। এ সকল বিষয়ে শরীর আত্মার অধীন। আত্মার স্বরূপ ও হাকিকত জানাই আল্লাহর মা'রিফাতের কুঞ্জি। আত্মা একটি উৎকৃষ্টরত্ন এবং এ রত্ন ফেরেশতা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ দরবার ইহার উৎপত্তি স্থান। ইহা আল্লাহর দরবারে ফিরে যাবে। আত্মা আল্লাহর সৃষ্টি এবং আলমে আমরের অন্তর্ভূক্ত। আলমে আমর বলতে বুঝায়, যে বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা এবং সংখ্যা নেই। আত্মার ও আকার বা পরিমান নেই এবং এজন্যেই ইহাকে ভাগ করা যায় না। আত্মা সৃষ্ট পদার্থ-আল্লাহ ইহাকে সৃজন করেছেন আত্মা অনাদি নহে। যারা ইহাকে অনাদি বলে দাবী করেন তারা ভূল পথে রয়েছে। আবার যারা আত্মাকে গুন পদার্থ বলেন তারা ও ভ্রমে পড়েছেন।

কারণ গুণ পদার্থ স্বয়ং বিদ্যমান থাকতে পারে না, আত্মা যখন মানুষের আসল জিনিস এবং সমস্ত দেহ ইহার অধীন তখন আত্মা কিরূপ গুণ পদার্থ হতে পারে? আবার যারা আত্মাকে শরীরী বস্তু বলে দাবী

---

[১১১] সৌভাগ্যের পরশমনি, প্রাগুক্ত।

[১১২] আলহাজ খান বাহার আহছান উল্যাহ, সুফী ঃ ঢাকা ঃ ইফা, ১৯৮০, পৃঃ ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তারাও ভুল চিন্তা করেন, কেননা, শরীরের অংশ হতে পারে কিন্তু আত্মা বিভক্ত হতে পারে না। এ সকল ধারণা হতে আত্মার পরিচয় ভিন্ন।

মানুষের আভ্যন্তরিক বস্তুই হচ্ছে আত্মা, এ সম্পর্কে Rastogi বলেন "The spirit being only essence". অর্থ আত্মাই একমাত্র সারবস্তু[১১৩]। ইহা ব্যতীত আর যত কিছু ইহার সহিত আছে তৎসমুদয়ই ইহার অধীন। আত্মা অমর। প্লাটো, এ্যারোস্টেটল সহ প্রাচ্যের অধিকাংশ দার্শনিকগণ আত্মার অমরত্ব এবং মৃত দেহের পুনরুত্থানের বিরোধী ছিলেন, গাযালী (রঃ) তাদের এ বক্তব্যের চরম সমালোচনা করেছেন।

Ghazali found foult with the philosophers who regarded the spirit as immartol and rising of the dead on Resurreetion as contary to reasoning, Ghazali believed what the holy book sets forth.

অর্থ ঃ যে সমস্ত দার্শনিক আত্মার অমরত্ব এবং মৃত দেহের পুনরুত্থান যুক্তি বিরোধী মনে করতো, গাযালী (রঃ) তাদের ভুল খুজে পেয়েছেন। পবিত্র কিতাবে যা বলা হয়েছে। গাযালী (রঃ) তা বিশ্বাস করতেন[১১৪]।

আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে সামনে আলোচনা করা হবে।

---

[113]. Rastogi, Moslim world, Islam breaks fresh ground. P.
[114]. Rostogi, প্রাগুক্ত পৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

আত্মার প্রয়োজনীয়তা ঃ

মানব, আত্মা ও দেহের সমষ্টি, আত্মা স্বর্গীয় দেহ পার্থিব, একটি স্থায়ী, অপরটি অস্থায়ী, মৃত্যুর সহিত দেহের অবসান, মৃত্যুর পর ও আত্মা স্থিতি। মানব প্রবৃত্তির দাস, আত্মা প্রবৃত্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করে। উদাহরণ স্বরূপ, যেমন রাডার বহিঃশত্রুর আক্রমনকে নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি আত্মা ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানবতার জীব প্রবৃত্তির দ্বারাই পরিচালিত হয়। প্রবৃত্তি তাকে যেদিকে ধাবিত করে, সে সেই দিকে চালিত হয়। আবার নিয়ন্ত্রণ না থাকলে পাপা ও পূণ্যের পার্থক্য লুপ্ত হতো। স্বর্গ ও নরক অর্থহীন হতো, প্রলয় ও পুনরুত্থান অনাবশ্যক হতো, কেবল স্থায়িত্ব বিরাজ করতো। যার জোর তারই মুল্লুক হতো। প্রবৃত্তির সু-পরিচালনার জন্যই আত্মর প্রয়োজন[১১৫]।

মানব আগমনের উদ্দেশ্য ঃ

মানব পৃথিবীর আসবার উদ্দেশ্য হলো এ যে, আত্মা এখান হতে সৌভাগ্যের বীজ গুলো সংগ্রহ করে লইবে অর্থাৎ উৎকৃষ্ট গুণ গুলি অর্জন করে লইবে[১১৬]। সৌভাগ্যের বীজ গুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীজ হচ্ছে ইবাদত। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা।

আমি জ্বীন এবং মানুষকে আমারই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।

জীবাত্মা বা পরমাত্মা ঃ

উপরে যে রূহ বা আত্মার পরিচয় দেওয়া গেল তদ্ভিন্ন মানুষের মধ্যে অপর একটি রূহ আছে। ইহাকে জীবন বলে। ইহা বিভক্ত হতে পারে এবং ইহা পশু-পক্ষীর ও থাকে। কিন্তু আমরা যাকে রূহ বা আত্মা বললাম তাই আল্লাহর মা'রেফাতের স্থান। পশু-পক্ষীর দেহে ইহা বিদ্যমান নেই। ইহা দেহ বিশিষ্ট নহে, গুন পদার্থ ও নহে, বরং ইহা

---

[১১৫]. আলহাজ খান বাজার আহছান উল্যাহ "সুফী" ঢাকাঃ ইফা, ১৯৮০ পৃ-৩-৪।
[১১৬]. "সুফী" প্রাগুক্ত, পৃ-২৭।

Dhaka University Institutional Repository

ফেরেশতাগনের সমজাতীয় এক মৌলিক পদার্থ। ইহার হাকিকত অবগত হওয়া বড় কঠিন।

আত্মার হাকীকত জানবার প্রারম্ভের কর্তব্য ঃ

আত্মার ব্যাখ্যা করা এবং যারা সবেমাত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। আত্মার হাকিকত জানবার তাদের কোন প্রয়োজন ও নেই। কারণ, ধর্ম-পথ-যাত্রীর প্রথম কর্তব্য হলো রিয়াযত-মুজাহাদা (কাঠার সাধনা) এবং যে ব্যক্তি যথারীতি রিয়াযত-মুজাহাদা করবে তার নিকট আপনা আপনিই আত্মার স্বরূপ খুলে যাবে। আত্মার পরিচয় লাভের পথ আল্লাহই তার সম্মুখে খুলে দিয়ে থাকেন, যেমন তিনি বলেন।

"আর যারা আমার জন্য কঠোর সাধনা করেছে আমি অবশ্যই তাদিগকে আমার রাস্তা দেখাইব, আল্লাহ তা'আলা নেককার লোকদের সাথে রয়েছে।[১১৭] (আনকাবুত ঃ ৭ রুকু)

তাই আল্লাম ইকবাল বলেন,

অনুবাদ ঃ গোটা জাতীর বাদশাহী এক আত্মার বাদশাহীর সমতুল্য। যে ব্যক্তির গুণ এমন হবে না, সে তো জাতী নয় বরং মৃত।

আত্মার প্রকার ভেদ ঃ

আত্মার দু'প্রকার সৈন্য আছে। প্রথমত-প্রকাশ্য সৈন্য, যেমন, হাত, পা, দাত, মুখ, পাকস্থলী ইত্যাদি, দ্বিতীয়ত আভ্যন্তরিক সৈন্য, যেমন-পানাহার, ইচ্ছা, আবেগ ইত্যাদি আবার আত্মা পাঁচ প্রকার[১১৮]।

---

[১১৭] আবুস যোহা নুর আহমদ, অগ্নী পুরুষ জামাল উদ্দীন আফগানী, পৃঃ ২৮৯, ১৯৯২ সন।

[১১৮] আবদুল মান্নান ও কুরবান আলী ইসলামিক স্টাডিজ, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৮৮ সন, পৃ-২৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

১। পশুর আত্মা ঃ যে আত্মা দ্বারা মানুষের মধ্যে পশুর স্বভাব পরিলক্ষিত হয়, যেমন খাওয়া, শয়ন করা, কাম, রিপু চরিতার্থ করা ইত্যাদি প্রবৃত্তির উদয় হয়।

২। হিংস্র জন্তুর আত্মা ঃ যে আত্মার দ্বারা মানুষের মধ্যে হিংস্র প্রাণীর স্বভাব ফুটে উঠে। যেমন, হিংসা, ক্রোধ, মারামারি, কাটাকাটি, ইত্যাদি।

৩। শয়তানের আত্মা ঃ যে আত্মা দ্বারা মানুষের মধ্যে শয়তানের কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়, যেমন-পাপাচার, অহংকার, মিথ্যা, সুক্ষ্ম কুট-কৌশলের দ্বারা মানুষকে ধোঁকা দেওয়া ইত্যাদি প্রবৃত্তির উদয় হওয়া।

৪। ফেরেশতার আত্মা ঃ যে আত্মার দ্বারা ন্যায় পরায়নতা, সততা, সভ্যতা, পরোপকারিতা, আল্লাহর বশ্যতা স্বীকার করা ইত্যাদি আগ্রহ জন্মিয়ে থাকে। যে আত্মাকে শয়তানের বশ্যতা স্বীকার করাতে পারে না।

৫। মানুষের আত্মা ঃ যার কর্তব্য হলো, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আত্মাকে বশ করতঃ উহাদিগকে কু-প্রবৃত্তির দিক হতে ফিরিয়ে দিয়ে ফেরেশতার আত্মার সৎগুনাবলীতে রূপান্তরিত করে আল্লাহর মারেফাত ও ভালবাসা অর্জন করা।

উল্লেখযোগ্য যে, আত্মার যেমন বিভিন্ন সৈন্য রয়েছে, আবার সৈন্যদের প্রধান হচ্ছে বিবেক, বিবেক দ্বারা আত্মার সন্তুষ্টি আচে। আত্মা হলে একটি প্রদীপ স্বরূপ, আর বিবেক হচ্ছে প্রদীপের আলো, বিবেক সম্পন্ন লোক কখনও তার হাত, পা, চক্ষু, জবান দ্বারা এমন কাজ করে না, যদ্বারা সে সমাজে ঘৃনিত হতে হয়, সে বিবেক নামক আলো দ্বারা সৎ পথে পরিচালিত হয়। শয়তান তাকে আক্রমন করতে পারে না, রাসুল (সঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ মানুষকে বিবেক অপেক্ষা উত্তম কিছু দান করেন নেই। বিবেকবানের নিদ্রা মুখের ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

Dhaka University Institutional Repository

মুমিনের আত্মা আল্লাহর আরশ ঃ

মুমিনের আত্মা বা অন্তঃকরণ আল্লাহর আরস্ রাসুল (সঃ) এরশাদ করেছেন। মুমিনের অন্তঃকরণ আল্লাহর আরশ, আল্লাহ তা'আরা যেহেতু মুমিনাদেরকে ভালবাসেন, সেহেতু তিনি মুমিনের অন্তরে সারাক্ষণ অবস্থান করেন, মুমিনেরা ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থাকেন। কবি বলেন-

অর্থ ঃ আমার (আল্লাহর) আসমান-জমিনে স্থান হয় না, একমাত্র মুমিনের অন্তরে আমার স্থান হয়।

আত্মার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ঃ

আত্মা-জগতের আশ্চার্য সমূহের শেষ নেই। সৃষ্টজগতে আত্মা সর্বাপেক্ষা অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, এ জন্যই ইহার শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু বহু লোকে ইহা জানে না। আত্মার শ্রেষ্ঠত্বের দু'টি কারণ আছে। যথা (১) জ্ঞান (২) শক্তি। আত্মার জ্ঞান জনিত শ্রেষ্ঠত্ব আবার দুই প্রকার, ইহার একটি সকলেরই বুঝতে পারে এবং অপরটি নিতান্ত গুপ্ত এবং অতি উত্তম। শেষোক্তাই অতি দুর্লভ। আত্তার কোন জনিত প্রকাশ্য শ্রেষ্ঠত্ব হলো সকল বিদ্যা ও যাবতীয় শিল্পকৌশল জানবার ক্ষমতা। এ ক্ষমতা বলে আত্মা সকল শিল্প কৌশল শিক্ষা করতে পারে এবং ইহার বলেই মানুষ লিখিত বিষয় পাঠ করতে পারে ও শিখতে পারে। অংক শাস্ত্র, চিকিৎসা বিদ্যা জৌতিষ ও ধর্মনীতি এ ক্ষমতাবলেই আয়ত্ত হয়। এ ক্ষমতার প্রভাবেই আত্মা এমন পদার্থ যে, ইহা বিভক্ত হতে পারে না, অথচ ইহাতে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাবেশ হতে পারে।

এমন কি, মরুভূমির মধ্যে সামান্য বালুকনা যেমন লুকায়ে যায় তদ্রুপ সমস্ত জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আত্মার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। চিন্তাবলে আত্মা এক মুহূর্তে পৃথিবী হতে আকাশে এবং বিশ্বের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে বিচরণ করতে পারে। ভূতলে থাকলে ও ইহা আকাশ

Dhaka University Institutional Repository

মন্ডল জরিপ করতে পারে, এক গ্রহ হতে গ্রহের দূরত্ব নির্ণয় করতে পারে, সাগরতল হতে মৎস্যকে কৌশলে উত্তোলন করতে পারে। আকাশ বিহারী পক্ষীকে কৌশলে ভূতলে নামাতে পারে এবং উট, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি অতি শক্তিশালী প্রাণীকে বশীভূত করতে পারে। বিশ্বের আশ্চর্য আশ্চর্য জ্ঞান ইহার ব্যবসায়। পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আত্মা এ জ্ঞান আহরণ করে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, আত্মার দিকে সকল ইন্দ্রিয়ের এক একটি পথ খোলা রয়েছে। বড় বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, জড়-জগতের দিকে পঞ্চইন্দ্রিয় যেমন হৃদয়-এর পাঁচটি দ্বার, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক জগতের দিকে ও হৃদয়ের একটি প্রশস্ত দ্বারা খোলা আছে। অধিকাংশ লোকেই কেবল জড়-জগতকেই অনুভূমির বিষয় এবং বাহ্য ইন্দ্রিয় সমূহকেই জ্ঞানের দ্বারা বলে মনে করে। কিন্তু এ ধারণা সংকীর্ণতা-প্রসূত ও অমূলক।

জ্ঞানের দিকে হৃদয়ের যে বহু দ্বার খোলা রয়েছে ইহার দু'টি প্রমাণ আছে। প্রথম, স্বপ্ন, নিদ্রিত অবস্থায় প্রকাশ্য ইন্দ্রিয়ের কার্য বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু হৃদয়ের আভ্যন্তরিক জ্ঞানদ্বার খুলে পড়ে। তখন আলম আরওয়াহ ও লওহে মাহফুযের অজ্ঞাত বিষয় সমূহ দৃষ্টিগোচর হতে থাকে, ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা কখনও পরিস্কার ভাবে স্পষ্ট দেখা যায়, আবার কখনোও সাদৃশ্যে উপমাস্বরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। যখন সাদৃশ্যে দেখা যায় তখন স্বপ্নের অর্থ করে বুঝতে হয়। লোকে মনে করে জাগরিত ব্যক্তি অধিক পরিমানে জ্ঞান লাভে সমর্থ অথচ জাগ্রত অবস্থায় গায়েবের কোন বিষয়ই নয়ন গোচর হয়না। স্বপ্নতত্ত্বের বিস্তারিত বিবরণ তেমন আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

স্বপ্নতত্ত্ব ঃ

আত্মা দর্পণতুল্য এবং লওহে মাহফুয ও একখানা দর্পন স্বরূপ, ইহাতে বিশ্বের যাবতীয় বস্তু ও ঘটনার ছবি অংকিত আছে। একটি স্বচ্ছ আয়নাকে চিত্রিত আয়নার সম্মুখে ধরলে স্বচ্ছ আয়নাতে যেমন চিত্রিত আয়নার ছবি প্রতিফলিত হয়। তদ্রূপ নির্মল আত্মা লওহে মাহফুযের সম্মুখীন হলে ইহাতে অংকিত সমস্ত বস্তু ও ঘটনার ছবি নির্মল আত্মার মধ্যে পরিস্কার রূপে দেখা যায়। তবে লওহে মাহফুযের ছবি আত্মায় প্রতিফলিত হওয়ার উপযোগী করতে হলে ইহাকে পাপের মলিণতা হতে সম্পুর্নরূপে নর্মিল রাখতে হয় এবং জড়জগতের সহিত ইহার সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করত ইহাকে লওহে মাহফুযের সম্মুখীন করতে হয়।

আত্মা যতক্ষণ জড়জগতের সহিত লিপ্ত থাকে ততক্ষণ আত্মা ও লওহে মাহফুযের মধ্যে এক আবরণ বিদ্যমান থাকে। নিদ্রার সময়ে আত্মার সহিত জড়জগতের সম্বন্ধ একবারে বিছিন্ন হয় বলে আপনা আপনিই আধ্যাত্মিক জগত নয়নগোচর হয়। কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় ইন্দ্রিয় সমূহের কার্য স্থগিত থাকলে ও খেয়াল বাকী থাকে। এ জন্যই আধ্যাত্মিক জগতের বিষয়সমূহ পরিস্কার রূপে দেখা না গিয়ে সাদৃশ্যে উপমাস্বরূপ দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে।

মানুষ মরে গেলে খেয়াল বা ইন্দ্রিয় কোনটাই থাকে না, তখন সকল আবরণ বিদূরিত হয় এবং বিশ্বজগতের সকল বিষয় পরিস্কাররূপে আত্মার দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা-

অর্থ ঃ অনন্তর তোমা হতে তোমার পর্দা তুলে লয়েছি। অতঃপর তোমার দৃষ্টিতীক্ষ্ন হলো। (আল কুরআন)

উত্তর আত্মা বলবে,

Dhaka University Institutional Repository

"হে আমাদের রব, আমরা দেখলাম ও শুনলাম, আমাদিগকে পুনরায় পাঠাও, আমরা সৎ কাজ করবো। নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাসী আছি।"

আধ্যাত্মিক জগতের দিকে আত্মার জ্ঞানদার যে খোলা আছে তার দ্বিতীয় প্রমাণ এ দুনিয়াতে এমন কোন লোক নেই যার হৃদয়ে 'ইলহামের' মধ্যস্থতায় অন্তদৃষ্টি ও শুভ প্রেরণা জাগরিত না হয়। এ সকল ইন্দ্রিয় পথে আসে না, বরং হৃদয়েই উৎপন্ন হয়। উহা কোথা হতে আসে লোকে জানে না। ইহাতে বুঝা গেল যে, সকল জ্ঞান শুধু বাহ্যজগত হতে হয় না বরং আত্মা এ জড়জগতের নহে, বরং আধ্যাত্মিক জগগতের অন্তর্গত, ইন্দ্রিয়সমূহ জড়জগতের জন্য সৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং আধ্যাত্মিক জগত দর্শনে উহারা স্বভাবতই বাধা সৃষ্টি করে থাকে। অতএব মানুষ যতদিন জড়জগতের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন না করলে ততদিন আধ্যাত্মিক জগতের দিকে পথ পাবে না।

জাগ্রত অবস্থা ঃ

কোন ব্যক্তি যদি প্রকৃত চেষ্টা-সাধণা করে নিজকে সকল অসৎগুনাবলী পাপাচার থেকে বাঁচিয়ে রাখে, মন্দ স্বভাব হতে নিজকে পবিত্র রাখে, আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজকে সকল বস্তু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর সাথে সু-সম্পর্ক গভীর করে তুলে তবে জাগ্রত অবস্থায় ও তার অন্তদ্বার খোলা থাকবে। লোকে স্বপ্নে যা দেখতে পায় এ ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থাতেই তা দেখতে পাবে। এ অবস্থা সৃষ্টি হওয়াকে আধ্যাত্মিক জগত বলে। এ সম্পর্কে রাসুল (সঃ) বলেছেন, আমাকে সমস্ত দেকানো হয়েছে। অনন্তর আমি বিশ্বের পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত দেখেছি।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা করেন,

Dhaka University Institutional Repository

"আর আমি তদ্রুপ ইব্রাহীম (আঃ) কে আসমান ও জমিনের রাজ্য দেখায়েছি" (আর কুরআন) ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা যায়। আল্লাহ তা'আলা যেভাবে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে বিশ্বের পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত সব কিছু দেখায়েছিলেন, তেমনি ভাবে ইতিপূর্বে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে আসমান ও জমিনের রাজ্য দেকায়েছেন। কুরআনের আয়াতে তদ্রুপ শব্দটি দ্বারা রাসুল (সঃ) এর পূর্বে আগত অন্যান্য নবী ও রাসুলের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

আত্মার উন্নতিতে পরিশ্রম আবশ্যক ঃ

আল্লাহ মানুষকে যে অতি উত্তম পদার্থ দান করেছেন এবং ইহা মানুষ হতে গোপন রেখেছেন। পরিশ্রমের সহিত আত্মার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। দুনিয়া হতে একেবারে নির্লিপ্ত করে ইহাকে গৌরবের উচ্চতম সিংহাসনে আরোহন করা দরকার। তা হলে পরকালে অবিমিশ্র, অবিনশ্বর জীবন, অপ্রতিহত ক্ষমতা, সন্দেহশূন্য মা'রেফাত লাভ ও নির্মল সৌন্দর্য দর্শনের সৌভাগ্য অর্জন করবে। আত্মা যতি পরকালে প্রকৃত সম্মান ও গৌরব লাভের উপযোগী হয় তবে ইহকালে ও ইহার শ্রেষ্ঠত্ব থাকে। অন্যথায় মানবের ন্যায় অসহায় ও অসম্পূর্ণ আর কেহই নেই।

আত্মার অঙ্গ সমূহ ঃ

মানুষের শারীরিক গঠনে যেমন হস্তপদ প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গ আছে, আত্মা গঠনে ও তেমনি চারটি অঙ্গ বিদ্যমান, আছে, (১) জ্ঞানশক্তি (২) ক্রোধশক্তি (৩) কাম-শক্তি (৪) বিচার শক্তি। অতএব, আত্মার এ অঙ্গ-চতুষ্টয় সুন্দর ও সুগঠিত না হওয়া পর্যন্ত চরিতকে সুন্দর বলা ঠিক না, নিম্নে আলোচনা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞান শক্তি ঃ

জ্ঞান শক্তির সৌন্দর্য এ যে, মানুষ ইহা দ্বারা সত্য কথাও মিথ্যা কথা চিনতে পারে; ধর্ম বিশ্বাস ব্যাপারে হক-না হক বুঝতে পারে এবং ভাল কাজ ও মন্দ কাজের প্রভেদ ও হৃদঙ্গ'ম করতে সক্ষম হয়, জ্ঞানের মধ্যে এ প্রকার শক্তি সঞ্চিত হলেই ইহার সুফল ফলতে আরম্ভ হবে। "যাকে হেকমত বা জ্ঞানশক্তি দান করা হয়েছে, তাকে অগনিত কল্যাণ দান করা হয়েছে।", (আল্ কুরআন)

কাম ও ক্রোধ ঃ

বিবেক-বুদ্ধি শরীয়তের ইঙ্গিত মত চলাই কাম ও ক্রোধের সামঞ্জস্য এবং সৌন্দর্য, শিকারী কুকুর যেমন প্রভূর ইঙ্গিতমত পরিচালিত হয়ে থাকে, কাম ও ক্রোধকে তেমনি সেদিকে শরীয়ত ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের ইশারা হয়, ইতস্ততঃ না করে সেদিকেই ধাবিত করা বাঞ্চনীয়।

বিচার শক্তি ঃ

বিচার শক্তি সৌন্দর্য হয়েছে, কাম-ক্রোধকে নিজের অনুগত রেখে বিবেক বুদ্ধির ইঙ্গিতমত পরিচালিত করা, বিবেক-বুদ্ধি আত্মা-রাজ্যের বাদশাহ, 'আদল' বা বিচার শক্তি তার কোতোয়াল, যেদিকে জ্ঞানের আদেশ, বিচার শক্তি সেদিকেই ধাবিতই ধাবিত হয়, জ্ঞান যে হুকুম দেয়, বিচার শক্তি তাহাইজারি করে[১১৯]।

আত্মার অমরত্ব ঃ

অধিকাংশ ধর্মই আত্মার অমরত্বকে বিশ্বাস করে, কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক দর্শন ও বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি ও আশ্চার্যজনক সাফল্য লাভের ফলে অনেকেই আত্মার অমরত্ব পরম সত্তার অস্তিত্ব এবং পরকালে বিশ্বাস করে না। আত্মা যে অমর একথা হাতেনাতে প্রমাণ করা যায় না, বা দৈহিক

---

[১১৯] ইমাম গাযালী (রঃ), "তাবলীগে-দীন" ঢাকা ঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা, পৃঃ১২১-১২২।

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুর পর কেউ আশরীরে এ জগতে ফিরে এসেছে বলা শুনা যায় নাই, তাই মৃত্যুর পর বাস্তবিক পক্ষে কি ঘটবে, তা কেউ বলতে পারে না, আবার অনেকে এটা ও বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পর পরকাল বলে একটা স্থান আছে যেখানে ইহকালের অন্যায়, অত্যাচার বৈষম্য, দুর্দশা ইত্যাদির অবসান ঘটবে এবং ন্যায়ের পুরস্কার ও অন্যায়ের শাস্তি হবে[১২০]।

গাযালী (রঃ) এর মত ঃ

আত্মা কখনো ধ্বংস হয় না কিন্তু দেহ ধ্বংস হয়। আত্মা মৃত্যুর পর জীবিত থাকে। হৃদপিন্ডের সাথে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই। হৃদপিন্ড একটি মাংসপিন্ড মাত্র। মৃত্যুর পরও দেহের অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু আত্মা মৃত দেহে অবশিষ্ট থাকে না। মৃত্যুর পর আত্মার পরিপূর্ণ উৎকর্ষ ও মুক্তি সম্ভব পর হয়ে থাকে[১২১]।

দার্শনিকদের মতে, আত্মাই কেবল অমর, দেহ ও আত্মা দুই-ই অমর। জন্মের সময় যেমন দেহ ও আত্মার সংযোগ হয়, তেমনি ইহাও সম্ভব যে, শেষ বিচারের দিন আত্মা ও নূতন দেহের মিলন ঘটিবে। প্রত্যেক আত্মাই ইহার উপযোগী দেহ লাভ করবে। আত্মাই মানুষের অস্তিত্ব, পৃথিবীর সকল বস্তু হতে ইহা স্বতন্ত্র। গাযারী (রঃ) বিশ্বাস করতেন, মানুষের আত্মার সহিত আল্লাহর অস্তিত্ব অভিন্ন। আল্লাহ যেমন বিশ্বকে শাসন করেন, মানুষের আত্মা ও তেমনি দেহকে শাসন করেন[১২২]।

গাযালী (রঃ) আরো বলেন,

Al-Ghazali "is the reunios of the soul with the body at the time of resurrution more wonderfull than the first union of the soul with the body[123]

---

[120] মুহাম্মদ আবদুল বারী, দর্শনের কথা, ঢাকা ঃ হাসান বুক হাউজ, পৃষ্ঠা নং ২৬৮।
[121] নাজির আহমদ, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, ঢাকা ঃ আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৮১, পৃঃ ৩৬৪।
[122] ফজলুর রহমান, আশরাফী, বিশ্বের মুসলিম মনীষীদের কথা, প্রাগুক্ত, ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

যে সকল দার্শনিকগণ আত্মার অমরত্ব বিশ্বাস করে না, তিনি তাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন যে, "দেহ এবং আত্মার প্রথম মিলনের ছেড়ে কি পুনঃরুত্থানের দেহ এবং আত্মার পুনঃমিলন অধিকতর আশ্চার্যজনক ?

বিভিন্ন দার্শনিকদের মতামত ঃ

প্লেটো তার Apology নামক সংলাগে সক্রেটিসের ধারণা সম্পর্কে বর্ণনা দেন, সক্রেটিস মৃত্যু সম্পর্কে বলেন যে, মৃত্যুর পর আত্মা অন্য জগতে প্রস্থান করে। সে পর জগতে প্রশ্ন উপস্থাপন করার জন্য কাউকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয় না। এদিক থেকে মনে করা হয় যে, সক্রেটিস আত্মার অমরত্ব এর বিশ্বাস করেন।

প্লেটো বলেন, আত্মা একটা অধ্যাত্মিক দ্রব্য, দেকার্তের মতে, আত্মা একটা আধ্যাত্মিক দ্রব্য, চেতনা আত্মার প্রধান ধর্ম, আত্মা যেহেতু একটা দ্রব্য, সেহেতু আত্মা অমর।

বার্কলি মতে ঃ

আত্মা আবিভাজ্য, অবিমিশ্র ও বিদ্রোহী এবং তার বিস্তৃতি নেই। আত্মা যেহেতু আধ্যাত্মিক দ্রব্য, সেহেতু এ অবিনশ্বর ও অমর।

হেগেলের মতে ঃ

সমীম আত্মার এ বিশ্বজগতে নির্দিষ্ট স্থান ও কর্তব্য রয়েছে, কিন্তু এ সসীম এ স্বল্পস্থায়ীজগতে পুরোপুরিভাবে এর কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে না হিসেবে মৃত্যুর পর ও নিজের অস্তিত্বকে বজায় রেখে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে।

---

[123] . MOhammad Sharif Khan, Muslim Philosophy and Philosopher, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কান্টের মত ঃ

তিনি আত্মার অমরত্বকে সত্য হিসেবে স্বীকার করেন, তার মতে নৈতিক জীবনের কোনই মূল্য থাকে না, যদি না আত্মা অমর হয়, ইহার উপর ভিত্তি করেই ইশ্বরের অস্তিত্বের প্রমান করেন।

জেমস সেথ এর মতে, আত্মার অমর ম্যার্টিনিউ, তিনি তার * গ্রন্থে আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে বলেন, "পূণ্যবানের জন্য সুখ ও পাপীদের জন্য শাস্তির ব্যাপারে যে পরকালের উপর বিশ্বাস করা হয়, সেই পরকালের বিচারের জন্য একজন বিচারকের প্রয়োজন।

আত্মার সংশোধন ঃ

সফলতার চাবিকাটি হচ্ছে আত্মার সংশোধন, আত্মার সংশোধন ছাড়া সফলতা অর্জন করা যায় না, আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা,

"যে ব্যক্তি নিজের আত্মার সংশোধন করেছে, সে ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছে" (আল আ'লা ঃ ১৩)

রাসুল (রঃ) বলেছেন, "পবিত্রতা ঈমানের অধাংশ"।

ঈমানের দুটি অংশ, (১) আত্মার ময়লা পরিস্কার করা অর্থাৎ আল্লাহর অপছন্দনীয় খাসলত গুলো বর্জন করতঃ আত্মশুদ্ধি অর্জন করা (২) আল্লাহর পছন্দনীয় গুনাবলী দ্বারা আত্মার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা।

আত্মার সংশোধন ঈমানের এক অংশ এবং ইবাদত-বন্দেগী ও সদগুনাবলী দ্বারা আত্মার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা অপর অংশ, আল্লাহ আমাদের অন্ত করণে আকাংখা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, আমাদের অন্তঃকরণে ক্রোধ ও পয়দা করেছেন। আল্লাহর তৃতীয় সৃষ্টি বুদ্ধি বিবেক, ক্রোধকে 'কুকুর' আকাংখাকে 'ঘোড়া' এবং বিবেক বুদ্ধিকে 'বাদশাহ' বলে অবধাণ করতে পারা যায়। যদি আমরা ক্রোধ নামক কুকুরকে সুশাসনে রেখে এবং আকাংখারূপ ঘোড়াকে সুশিক্ষা দান করে বিবেক

Dhaka University Institutional Repository

রূপ বাদশাহর অনুগত হতে পারি, তবেই সাফল্য পাব এবং অভিষ্ট কাংখিত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারব।

আত্মার মোট দশটি ময়লা ঃ

লোভ, অধিক কথা বলার আগ্রহ, ক্রোধ, পরশী কাতরতা, কার্পন্য বা বখিলী, সম্মান কামনা ও প্রভূত্ব প্রিয়তা, দুনিয়ার মহব্বত, তাকাব্বুর বা অহংকার, নিজকে নিজে ভাল মনে করে, রিয়াকারী বা লোক দেখানো ভাব।

প্রথম ময়লা লোভ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো, লোভ আত্মার জঘন্য ময়লা, অতিভোজন লোভের কারণই হয়ে থাকে। লোভ অনেক পাপের মূল, তা থেকে অনেক কাম-রিপু পয়দা হয়। লোভের বশবর্তী হয়ে কামনা-বাসনা পূর্ণ করার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। অর্থ সংগ্রহে নানা অসদুপায়ের আশ্রয় নিতে শয়তান প্ররোচনা দেয়। এ ছাড়াও অর্থ সংগ্রহ করতে মুখ্যাতির প্রয়োজন হয়, অর্থ লিপ্সা ও যশলিপ্সা এ দু'প্রকারের লিপ্সা হতে সাধারণতঃ অহংকার, শত্রুতা, কপটতা, পরশী-কাতরতা, প্রভৃতি আপদ গুলো ক্রমশ আত্ম প্রকাশ করে ধর্মের বিনাশ সাধন করে থাকে। রাসুল (সঃ) বলেছেন, "মানুষের মধ্যে যতগুলো পাত্র আছে, তন্মোধ্যে উদর (পেট) সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পাত্র"। উদরের এক তৃতীয়াংশ খাদ্য দ্বারা, এক তৃতীয়াংশ পানি দ্বারা এবং বাকী অংশ শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য খালী রাখতে হবে।

ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগের উপকারিতা ঃ ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্যকরার মধ্যে বহু উপকারিতা রয়েছে-

প্রথম উপকারিতা ঃ

ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগের দ্বারা আত্মার পরিচ্ছন্নতা এবং বুদ্ধির তৃক্ষ্মতা বৃদ্ধি পায়। উদর পূর্ণ থাকলে বুদ্ধিহীনতা উৎপন্ন হয় এবং আত্মার

Dhaka University Institutional Repository

বন্ধগুলো বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং বুদ্ধির প্রখরতা না থাকায় হৃদয়ে আল্লাহর মা'রেফাত ও লাভ করা কঠিন।

দ্বিতীয় উপকারিতা ঃ

ক্ষুধার কষ্টে মন নরম হয় এবং মুনাজাতের সময় ক্রন্দনভাব অনুভূত হয়ে থাকে। উদর খালি থাকলে অন্তরে খোদার ভয়ও বিনয় ভাবের উদ্রেক হয়ে থাকে আল্লাহর ভয়ও নম্রতাই-মা'রিফাতের চাবি বলে বুঝতে হবে।

তৃতীয় উপকারিতা ঃ

ক্ষুধার দ্বারা অবাধ্য নফস পদদলিত ও অনুগত হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা রাসুল (সঃ) কে পার্থিব ধন-দৌলত দিতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি তা গ্রহণ না করে সবিনয়ে বলেছেন, পরওয়ারদেগার! আমি চাই যে, একদিন পেট ভরে খেতে পেয়ে আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, অন্য দিন অনাহারে থেকে ধৈর্য্য ধারণ করি।

চতুর্থ উপকারিতা ঃ

ক্ষুধার যন্ত্রণায় আজাবের কিছু নমুনা ইহ জীবনে দেখার সুযোগ লাভ হয়। যাতে নফ্স সাবধান হতে পারে এবং প্রকৃতই আজাবের ভয় জাগ্রত হতে পারে। ক্ষুধারূপ কঠিন আমার ভোগ করে নফ্স যখন ভীত হবে, তখন কুপথে পা দিতে সহজে সাহস পাবে না।

পঞ্চম উপকারিতা ঃ

ক্ষুধার প্রভাবে সব রকম ভোগ বাসনা দুর্বল হয়ে দুনিয়ার মহব্বত অন্তর হতে লোপ পেতে থাকে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত রাসুল (সঃ) এরপর সর্ব প্রথম যে বেদা'আতের সৃষ্টি হয়েছে, তা হচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

উদর পূর্ণ করে খাওয়া, যখন মুসলমানগণ পেট পুরে খাওয়া আরম্ভ করেছেন, তখন হতেই তাদের মন দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট হতে চলছে।

ষষ্ঠ উপকারিতা ঃ

ক্ষুধায় নিদ্রা কম হয়, পেট পুরে খেলে নিদ্রা বৃদ্ধি পায় এবং নিদ্রা আধিক্যের কারণ বন্দেগী করতে পারা যায় না। অথচ জীবনের উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর বন্দেগী করা, সুতরাং জীবনের যে অংশটি নিদ্রায় কেটে যায়, তাকে হায়াতের মধ্যে গন্য করা যায় না।

হযরত আবু সুলাইমান দারানী (রাঃ) বলেন, উদর পূর্ন করে খেলে তদরূপ ৬টি দোষ উৎপন্ন হয়।

১. বন্দেগীতে স্বাদ পাওয়া যায় না।

২. জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রখরতা বিনষ্ট হয় এবং তজ্জন্য আল্লাহর মা'রেফাত অন্তরে স্থান পায় না।

৩. সৃষ্ট জীবের দুঃখ দৈন্যে সমবেদনা থাকে না। সকলকেই নিজের মত "পে ভরা" বলে মনে হয়।

৪. পাকস্থলী ভারী হয়ে যায় এবং তদরুপ এক প্রকার অবসাদ ও শিথিলতা আসে।

৫. ভোগ-বিলাসের আকাংখা বৃদ্ধি পায়।

৬. পেট খালী রেখে সবর করার অভ্যাস করা যায়। হযরত ইব্রাহীম আদহাম (রঃ) কে যদি বলা হত যে, অমুন জিনিসের মূল্য খুব বেড়ে গিয়েছে, তখন তিনি বলতেন, আকাংখা পরিত্যাগ করতঃ তাকে সস্তা করে নাও, এ ছাড়াও অধিক ভোজনের দ্বারা হায়াতের মধ্যে কমতি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

খাদ্যের সর্বোত্তম পরিমান ঃ

যে পরিমাণ খাদ্যে যাতে কেবল জীবন শক্তি বেঁচে থাকে এবং যা হতে কম করলে প্রাণ-হানির আশংকা হয়, ততটুকুই সিদ্দিকীগনের খাদ্যের পরিমাণ।

অন্তর ঃ পেটের এক তৃতীয়াংশ খাদ্য, এক তৃতীয়াংশ পানি ও এক তৃতীয়াংশ বায়ু দ্বারা পূর্ণ রাখা উচিত।

নফ্স

নফ্স-এর পরিচয় ঃ

নফ্স শব্দটি থেকে উদ্ভূত অর্থ মূল্যবান অতিমূল্যবান এবং উৎকৃষ্ট হওয়ার কারণে ইহাকে নফ্স বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর নফ্স শব্দটি তা'নাফফুসুন শব্দ থেকে নেয়া হয় অর্থ নিঃশ্বাস গ্রহণ, প্রতিটি প্রাণী সেহেতু প্রতিনিয়ত শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে এ জন্যই ইহাকে নফ্স বলে[১২৪]। ভিতরে যে কামনা ও বাসনা মানুষকে সর্বদা সত্য পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় যা মানুষকে ব্যক্তিত্ব বা অহংকার প্রদান করিয়া লিপ্সা করে, সে জৈব আকাংখার নাম সূফীদের ভাষায় নফ্স[১২৫]। আত্মার স্তরকে নফ্স বলে। নফ্সকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করে জিজ্ঞাসা করলেন, তোর পরিচয় কি? নফ্স বললো আমি আমি, তুমি তুমি, ইহার পর আল্লাহ তায়ালা নফ্সকে অনাহারে রেখে শাস্তি দিলেন, নফ্স ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার জিজ্ঞাসা করলেন, তোর পরিচয় কি ? নফ্স বললো, "এলাহী! তুমি আমার শক্তিশালী মালিক, আমি তোমার দুর্বল দাস।

এতে করে বুঝা গেল, নফ্স আল্লাহকে অস্বীকার করে বসলো, এ নাফরমান নফ্সকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষুধার শাস্তির মাধ্যমে তার সম্মুখে

---

[124] আল্লাহ ইবনুল কায়্যিম জাওযিয়্যাহ 'রূহ' অনুবাদক মাওলানা মুজীবুর রহমান, ঢাকা ঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৯, পৃঃ২৮৬।
[125] বিশ্বের মুসলিম মনীষীদের কথা, প্রাগুক্ত, পৃ-৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

মাথা নত করাতে বাধ্য করালেন, নফ্‌স ক্ষুধার শান্তি পাওয়া ব্যতীত আর অন্য কিছুতে মাথা নত করে না। নফ্‌সের একটি নির্দেশ পালন করে শয়তান হাজার হাজার বৎসরের সাধনা নষ্ট করে ফেললো, চির কালের জন্য অভিশপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবার হতে বের হয়ে আসলো, আর আমাদের নফ্‌স ও অবাধ্য নফ্‌সের ন্যায় গর্বিত ও মাথা উত্তোলন করে আল্লাহর নাফরমানি করে[১২৬]।

বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নফ্‌সের এভাবে পরিচয় দিয়েছেন যে, নফ্‌স সে নিশাচর গাধার ন্যায় যাকে পেট ভরালে মানুষকে লাথি মারে আর ক্ষুদার্ত রাখলে আর্তনাদ করে।

নফসের রূপ ঃ

নফ্‌স কামনার সময় পশু, গোস্বার (রাগের) সময় হিংস্র প্রাণী এবং মসীবত ও পেরেশানীতে ছোট শিশুর ন্যায় রূপ ধারণ করে, স্বাচ্ছন্দ্য ও খোশহাল অবস্থায় ফিরাউন স্বভাব, ক্ষুধার্ত অবস্থায় পাগল, তৃপ্তি হলে অহংকারী ও দাম্ভিক হয়ে পড়ে। নফ্‌সকে পরিতৃপ্তির সাথে খাওয়ানো হলে সে অহংকারী ও বিদ্রোহী হয়ে উঠে, ক্ষুধার্ত রাখলে আর্তনাদ করে ভয় পায়।

নফসের প্রকারভেদ ঃ

নফ্‌স তিন প্রকার (১) নফ্‌স আম্মারা (২) নফ্‌স লাওয়ামা (৩) নফ্‌স মুৎমাইন্না।

নফ্‌স আম্মারা ঃ

নফসে আম্মারা বলতে বুঝায়, অবাধ্য বা পাপের আসক্ত আত্মাকে, যা মানুষকে অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত করে বা পাপাচারে, অনৈতিক পথে পরিচালিত করতে চায়। নফ্‌সে আম্মাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা।

---

[১২৬]. গাযালী (রঃ), মাজলিশে গাযালী, ঢাকা ঃ রশীদ বুক হাউজ পৃঃ ৮৫, ১৯৯৫ সন।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ ঃ নফসতো সব সময় সকলকেই কেবল মন্দ কথাই বাত্‌লিয়ে (শিখিয়ে) থাকে। (সুরা ইউসুফ)

নফ্‌সে আম্মারা সাংঘাতিক রোগ, এটা সমস্ত দুশমনের মধ্যে সবচাইতে ভয়াবহ, মারাত্মক ও ধ্বংসকারী, দুশমন, নফ্‌সে আম্মারা এমন বিপজ্জনক হওয়ার কারণ দু'টি।

প্রথম, এটা হলো আভ্যন্তরীণ শত্রু, ডাকাত যখন গৃহে প্রবেশ করে তখন তার হাত থেকে পরিত্রান পাওয়া খুবই কঠিন, তেমনি নফ্‌স যখন দুশমনি করে বসে তখন তা থেকে পরিত্রান পাওয়া ও খুব কঠিন। ইহা ক্ষতি ও করতে পারে অধিকতর, যেহেতু এ দুশমন তথ নফসের বাসা হলো পাজ্ঞাবের মধ্যস্থল।

দ্বিতীয় কারণ এযে, নফ্‌স হলো প্রিয় শত্রু, একথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, মানুষ সর্বদা তার বন্ধুর দশমনি সম্পর্কে অসতর্ক ও উদাসীন থাকে। মানুষের চোখে তার বন্ধুর কোন ত্রুটি ধরা পড়ে না, অর্থাৎ সন্তুষ্টি ও শুভেচ্ছা পূর্ণ চোখে সকল প্রকারের ত্রুটিই রাতের ন্যায় অন্ধ হয়ে থাকে। আর তেমনি নফ্‌স প্রিয় শত্রু হওয়ার কারণে উহার দোষ ত্রুটি মানুষের সামনে ধরা পড়ে না। উহা বন্ধু সেজে প্রিয় শত্রুর ভূমিকা পালন করে অনিষ্ট করার অধিকতর সুযোগ পায়।

নফ্‌সে লাওয়ামা ঃ

যে নফ্‌স মানুষ খারাপ বা মন্দ কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে উহা থেকে ফিরে রাখে, অথবা মন্দ্র কাজ করে ফেললে তাকে ভাৎসনা দেয়। এ প্রকার নফ্‌স দু'মুখি চরিত্রের অধিকারী, ইহা মাঝে মধ্যে ভাল পথে পরিচালিত হয়, আবার মাঝে মধ্যে খারাপ পথে ও পরিচালিত হয়। নফ্‌স লাওয়ামা অর্থ কঠোর ভাবে অভিযুক্ত করা, নফ্‌সে লাওয়ামা বা আত্ম অভিযুক্ত আত্মা এজন্য বলা হয়েছে, কারণ ইহা মানুষকে পাপ কাজে বাধা প্রদান করে এবং প্রবল অনুভূতি পশুবৎ আকাংখাকে কঠোর ভাবে ঘৃনা করে। পক্ষান্তরে মহৎ গুনাবলী ও সৎস্বভাব সৃষ্টি করাই এর প্রবণতা।

Dhaka University Institutional Repository

নফ্‌স মুতমাইন্না ঃ

যে নফ্‌স স্থির থাকে, যাকে বলবে সালাম বা শান্তিময় আত্মা বলা হয় উহা সর্বদা স্থির গতিতে আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ যথার্থ ভাবে পালন করে।

নফ্‌স মুতমাইন্না এজন্য বলা হয়েছে যে, উহা আপন প্রভুর ইবাদত, মহব্বত, তওবা নৈকট্য, তাওয়াক্কুল, রেযা ইত্যাদি ব্যাপারে পুরোপুরি শান্ত এবং সন্তুষ্ট থাকে[১২৭]। অন্তরের প্রশান্তি ও উৎফুল্লতা, যার দ্বারা সফল প্রকার অস্থিরতা ও পেরেশানী দূর হয়ে যায়, ইহা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর যিকিরের মাধ্যমে অর্জিত হয়[১২৮]।

ইহা ও আবার দু'প্রকার, প্রথমত আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুনাবলীর উপর অটল আস্থা ও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা, দ্বিতীয়ত উহার দাবির উপর পূর্ণ আত্মিক প্রশান্তি যা পরিপূর্ণ দাসত্বের পরিচায়ক, যেমন তাকদীরের উপর পূর্ণ বিশ্বাস[১২৯]।

আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা

তিনি আরো ঘোষণা করেন

আমি তোমাদের নফ্‌সের সাথে মিশে রয়েছি। অনন্তর তোমরা আমাকে দেখছ না, (যারিয়াত) কাজেই নফ্‌সের সন্ধান করলে এবং পঞ্চ নফ্‌সাকে পূর্নভাবে বিশ্লেষণ করলে আল্লাহকে পাওয়া যায়। পঞ্চ নফ্‌স ঃ নফ্‌সে আম্মারা, নফ্‌স লাওয়ামা, নফ্‌স মুলহেমা, নফ্‌স মুতমাইন্না, নফ্‌সে রহমানি[১৩০]।

---

127. রূহ, প্রাগুক্ত, পৃ-২৮৮
128. রূহ, প্রাগুক্ত, পৃ-২৮৯
129. রূহ, প্রাগুক্ত, পৃ-২৯১
130. ফকির আবদুর রশিদ, সূফী দর্শন, ঢাকা ঃ ইফা, ১৯৮৪, পৃঃ১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ তাক্ওয়া

তাক্ওয়ার পরিচয় ঃ

আক্ওয়া আরবী শব্দ, ইহার আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা, পরহেজগারী করা, ভয় করা, আল্লাহর ভীতি, বেঁচে থাকা, আত্মশুদ্ধি লাভ করা, নিজকে কোন বিপদ ও অনিষ্ট হতে মুক্ত করা, ভীতি বলতে বুঝায় সে ভয়কে, যা বান্দা কর্তৃক কৃত কোন মন্দ থেকে ধারনার সৃষ্টি হয়[১৩১]। কষ্টদায়ক বস্তু হতে সাবধানতা অবলম্বন করা।

ইসলামী পরিভাষায় ঃ

একমাত্র আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় অন্যায় ও অসৎ কাজ হতে নিজকে বিরত রেখে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করার নাম তাকওয়া। তাকওয়ার শাব্দিক অর্থ মানবীয় সহজাত প্রবৃত্তি বা আকাঙ্খা যা মানুষকে খারাপ ও অনিষ্টকর কাজ কথা ও চিন্তা থেকে বিরত রাখে[১৩২]। পাপাচার হতে আত্মরক্ষার নাম তাকওয়া। নৈতিক দৃষ্টিতে তাকওয়ার অর্থঃ পৃথিবীতে দুটি পরস্পর বিরোধী প্রবণতা বা শক্তি পাশাপাশি সাংঘর্ষিক অবস্থানে বিদ্যমান। তা হলো ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, কল্যাণ-অকল্যাণ, আলো-অন্ধকার ইত্যাদি। এ পরস্পর বিরোধী দু'প্রবণতার মধ্যে থেকে ভাল ও কল্যাণময় প্রবণতা বেচে নিয়ে সেটাকে দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে থাকা এবং এ ধরে থাকার ফলে যত কঠিন পরক্ষা ও অবস্থারই মোকাবিলা করতে হোক না কেন, তা ধৈর্য ও সাহসের সাথে উত্তীর্ণ হওয়া এটাই প্রকৃত তাক্ওয়া।

ইমাম গাযালী (রঃ) এর মতে, দুশ্চিন্তা আহারে বিরত করে, ভয় গুনাহ্ থেকে বিরত রাখে আর রহমতের আশা আল্লাহর ইবাদতের জন্য প্রেরণা যোগায়[১৩৩]। তিনি আরো বলেন, তাকওয়া হলো এমন ভাবে

---

131. মিনহাজুল আবেদনী, প্রাগুক্ত, প্র-২৪১।
132. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ইং পৃ-৯।
133. মিনাহাজুল আবেদনী, প্রাগুক্ত, পৃ-১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যাওয়া যাতে কখনোও তেমন কোন গুনাহ প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে না হয়। তাছাড়া সে গুনাহ পরিত্যাগের ব্যাপারে ও অর্জন করতে হবে অটল দৃঢ়তা এবং তাতে সতত থাকতে হবে স্থির সংকল্প। অর্থাৎ আল্লাহ ভীতি তোমার ও গুনাহর মধ্যে যেন একটি প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়[১৩৪]। একদা হযরত ওমার (রাঃ) হযরত উবায় ইব্ন কার (রাঃ) কে তাকওয়ার ব্যাখ্যা দিতে অনুরোধ করেছিলেন তিনি উত্তরে বলেছিলেন, আপনি কি কখন ও কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করেছেন? হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ। তখন কি করেছিলেন? তিনি বললেন আমি সাবধানতা অবলম্বন করে দ্রুত গতিতে ঐ পথ অতিক্রম করেছিলাম হযরত উবায় ইব্ন কার (রাঃ) বললেন, ইহাই তাকওয়া।

মুত্তাকির সংজ্ঞা ঃ

যে ব্যক্তির মধ্যে তাক্ওয়ার সকল গুনাবলী বর্তমান আছে, তাকে মুত্তাকী বলে। যিনি আল্লাহর যাবতীয় নিষিদ্ধ জিনিস হতে বিরত থাকেন, তাঁকে মুত্তাকী বলে।

মুত্তাকী তাঁকে বলে, যিনি শিরক হতে আত্ম-রক্ষা করেছেন, যখন কোন ব্যক্তি গুনাহ পরিত্যাগ সম্পর্কে দৃঢ়সংকল্প এবং সে সংকল্পে সতত নিষ্ঠাবান থাকার ফলে তার নিজের ও গুনাহর মাঝখানে বাধার একটি কঠিন প্রাচীর গড়ে উঠবে তখনই তাকে মুত্তাকী বলে অভিহিত করা যায়[১৩৫]।

তাকওয়ার উঁচু পর্যায়ের ইবাদত এবং উত্তম সম্পদ বিশেষ, তাকওয়া অবলম্বনের ব্যাপারে যে সাফল্যমন্ডিত হবে সে লাভ করবে উত্তম নিয়ামত, অতুল সম্পদ, মহান সম্মানের চাবিকাঠি, বিপুল ঐশ্বর্য

---

[134]. মিনাহাজুল আবেদনী, প্রাগুক্ত, পৃ-৯০।
[135]. মিনাহাজুল আবেদনী, প্রাগুক্ত, পৃ-৯০।

Dhaka University Institutional Repository

ভান্ডার, বিরাট সাম্রাজ্যের আধিপত্য। মোট কথা দুনিয়া ও আখেরাতের াকল সম্পদ ও সম্মানের এটাই কোষাগার, উভয় দুনিয়ার সকল কল্যাণ ও মঙ্গল একমাত্র কোন উপায়ে হাসিল করা যদি সম্ভব হয় তবে তা তাকওয়ার' মাধ্যমেই সম্ভব।

তাকওয়ার উপকারিতা উপলব্ধির জন্য পবিত্র কুরআনের গভীর র্যালোচনা করা দরকার। তা হলেই অনুধাবন করা সম্ভব হবে যে, াকওয়ার সাথে আল্লাহ তা'আলার কত কল্যাণ ও মঙ্গল সংশ্লিষ্ট করে য়েছেন এবং তার পুরস্কার হিসেবে কত রকমের সৌভাগ্যেরই ওয়াদা রেছেন, একমাত্র তাকওয়ার মাধ্যমেই দুনিয়া ও আখেরাতের সকল ল্যাণ ও মঙ্গল হাসিল করা সম্ভব। নিম্নে তাকওয়ার কয়েকটি বৈশিষ্ট ল্লেখ করা হলো।

শংসা ও গুনকীর্তন ঃ

তাকওয়া অর্জনকারীদের প্রশংসা আল্লাহ তা'আলা সরাসরী করেন, াল্লাহর ঘোষণা,

"যদি ধৈর্য্য ধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তা াতি সাহসের কাজ হবে"। (আল ইমরান ঃ ১৮৬)

াল্লাহ রক্ষণাবেক্ষণকারী ঃ

তাকওয়ার মানদন্ডে পৌছিতে পারলে আল্লাহ তা'আলা তার ক্ষণাবেক্ষন ও তত্ত্বধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

"যদি তুমি ধৈর্য্য ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের কোন ষড়যন্ত্রই তোমার সামান্যতম ক্ষতি করতে পারবে না।" (আল ইমরান-২০)

Dhaka University Institutional Repository

সাহায্য ও সহানুভূতির আশ্বাস ঃ

যারা সৎকর্ম পরায়ন, তাদের সাহায্য ও সহানুভূতির আশ্বাস দেয়া হয়েছে।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদের সঙ্গে আছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সৎ কর্ম পরায়ন (নাহল-১২৮)

"আল্লাহ তা'আলা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের বন্ধু"

হালাল রুজিদান ঃ

যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের রুজির দায়িত্ব স্বীয় কুদরতে গ্রহণ করেন এবং সকল প্রকার দুঃখ ক্লেশ থেকে মুক্তির আশ্বাস প্রদান করেন। আল্লাহ পাকের ঘোষণা,

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ভয় রাখে, আল্লাহ তার জন্য একটা ব্যবস্থা বের করে দেবেন এবং যা তার ধারনার অতীত, এমন স্থান থেকে তার রিযিক দান করবন, (তালাক-২৩)

আমল সংরক্ষণ ঃ

যে সব লোক তাকওয়া অর্জন করে এবং সত্য কথা বলে, আল্লাহ তা'আলা তাদের আমলের দোষ-ত্রুটি সমূহ সম্পূর্ন ভাবে সংশোধন করে দিবেন, যাতে তারা সফলতার পথে কোন বাধা না পায়।

আল্লাহর ঘোষণা-

"বেঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্য কথা বলো- আল্লাহ তা'আলা তার পুরস্কার স্বরূপ তোমাদের আমল সমূহকে কবুল (সংশোধন) করবেন (আহযাব-৭০)

গুনাহ ক্ষমা ঃ

তাক্ওয়া অর্জনকারীর জন্য আল্লাহ তা'আলা পুরস্কারস্বরূপ তাঁদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন, তাক্ওয়া অর্জন করার পর্বে যে সব গুনাহ

Dhaka University Institutional Repository

সে করেছে, অর্থাৎ যে সব সগিরা গোনাহ করেছে, তাক্ওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা সেগুলো ক্ষমা করে দিবেন।

(আল্লাহ তা'আলা) তোমাদের গুনাসমূহ ক্ষমা করে দিবেন (ইমরান-৩১)

আল্লাহর ভালবাসার নিশ্চয়তা ঃ

আল্লাহ তা'আলার ভালবাসার একমাত্র পথ হচ্ছে তাকওয়া, তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে সকল প্রকার পাপাচার থেকে বাঁচা যায়, বান্দা যখনই পাপাচার থেকে মুক্ত হয়, তখনই আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা অর্জন তার জন্য সুনিশ্চিত।

আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা,

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাক্ওয়া অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন" (তাওবা-৪)

ইবাদত কবুল ঃ

তাক্ওয়া অজ্ন কারীদের ইবাদত ও নেক আমল সমূহ কবুল হওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। পুরস্কার স্বরূপ তাদের ইবাদত কবুল করা হবে এবং সৎ আমল সমূহ অতি সহজে গ্রহণ করা হবে।

আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা,

"আল্লাহ তা'আলা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের থেকে কবুল করেন। (মায়েদা ঃ আয়াত-২৭)

সম্মানীত হওয়া ঃ

তাক্ওয়ার অর্জনকারী আল্লাহ তা'আলার নিকট সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে সম্মানের উচ্চ শিখরে পৌছান। পরকালের কঠিন মুসিবতের সময় তিনি হবেন সম্মানীত ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত এ সম্পর্কে আল্লাহ আ'তালার ঘোষণা।

Dhaka University Institutional Repository

"হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছি এক মানুষ এবং এনারী হতে। পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হতে পার, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী, নিশ্চয়তই আল্লাহ সকল কিছু জানেন, সমস্ত বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। (হুজুরাত ঃ আয়াত-১৩)

মৃত্যুর শুভসংবাদ ঃ

যে ব্যক্তি তাক্ওয়া অর্জন করে থাকে সে নিজকে মুমিন হিসাবে ঘোষণা করেছে তার জন্য মৃত্যুর শুভ সংবাদ।

আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা,

যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তার জন্য দুনিয়ার জীবন ও আখেরাতের জীবন উভয় স্থানে খোশ খবরী রয়েছে। (ইউনুস ঃ ৬৩)

দোযখ থেকে মুক্তি ঃ

শুধু আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনলেই যথেষ্টই নয়। ঈমানের সাথে তাক্ওয়া না থাকলে সে পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারে না। পূর্ণাঙ্গ মুমিনই পরকালে দোযখের কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি পাবে।

আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা,

"অতঃপর আমি তা থেকে তাকওয়া অবলম্বনকারীদের বাঁচিয়ে নেবো"। তিনি আরো বলেন-

"তাক্ওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তিদের এ (দোযখ) থেকে দূরে রাখা হবে।"

বেহেশ্তের শুভ সংবাদ ঃ

তাকওয়াবান ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ তা'আলা 'জান্নাত'কে পুরস্কার স্বরূপ ঘোষণা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য (জান্নাত) তৈরী করা হয়েছে। মোট কথা, দুনিয়া আখেরাতের সৌভাগ্য ও কল্যাণের সকল বিষয় এ তাক্ওয়ার আওতাধীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এ সৌভাগ্য থেকে নিজেকে কখনো বঞ্চিত করা অনুচিত।

তাক্ওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ঃ

তাক্ওয়া মানব চরিত্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, ইহলৌকিক ও পরলৌকিক মুক্তির মূল ভিত্তি হচ্ছে তাক্ওয়া, ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠ এবং সুন্দর জীবন যাপনের চালিকা শক্তি হচ্ছে তাকওয়া। তাকওয়া হচ্ছে মানব জীবনের ব্রেক স্বরূপ। যখন মানুষ অন্যায় ও অশ্লীল কাজের দিকে ধাবিত হতে থাকে তখন তাক্ওয়া তার সামনে এসে ব্রেক স্বরূপ কাজ করে, অর্থাৎ ব্রেক গাড়ীকে যেমনি করে দাঁড়ায় দেয়, তাকওয়া ও তেমনি মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে ফিরে নিয়ে আসে।

ধর্মীয় জীবনে ঃ

আল্লাহ প্রদত্ত এবং রাসুল (সঃ) প্রদর্শিত মহান ধর্ম ইসলামে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। তাকওয়া বিহীন ধর্মীয় জীবন আল্লাহর নিকট মূল্যহীন। তাকওয়া হচ্ছে ইবাদত সমূহের সারবস্তু।

আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা,

"কুরবানীর পশুর রক্ত এবং মাংশ আল্লাহর দরবারে পৌঁছে না, বরং আল্লাহর দরবারে যা পৌঁছে তা তোমাদের (অন্তরের) খোদাভীতি বা তাকওয়া।

রাজনৈতিক জীবনে ঃ

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের ন্যায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাক্ওয়ার গুরুত্ব রয়েছে। আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের প্রায় সব কিছুই রাষ্ট্রীয় আইন কানুন দ্বারা পরিচালিত। আর রাষ্ট্র পরিচালিত হয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দ্বারা, নেতৃবৃন্দের মনে খোদাভীতি উপস্থিত থাকলে

Dhaka University Institutional Repository

ইহার প্রভাব সমগ্র রাষ্ট্রে পড়ে। এতে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। আর যদি নেতৃবৃন্দের মধ্যে খোদাভীতি অনুপস্থিত থাকলে ও ইহার প্রভাব সমগ্র রাষ্ট্রে পড়ে। এতে করে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম অন্যায় পথে পরিচালিত হয়।

অর্থনৈতিক জীবনে ঃ

অর্থনৈতিক জীবনে তাক্ওয়ার গুরুত্ব যথেষ্ঠ, অর্থ সকল অনর্থের মূল। অর্থের লোভে মানব জাতি নৈতিক চরিত্র ধ্বংসের দিকে দ্রুত ধাঞ্চি হয়। বর্তমান পৃথিবীতে অর্থ কেলেংকারীর মূল কারণ হচ্ছে তাকওয়ার অভাব। শ্রমিক কর্মচারী, অফিসার রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, শিল্পপতি যারাই অর্থের সাথে সম্পৃক্ত, তাদের অন্তরে খোদাভীতি জাগরুক না হলে জাতীয় অর্থনীতির উন্নতি সাধন হয় না। খোদাভীরু লোকদের অভাবে অর্থনৈতিক জীবনে একঝালো ছায়া নেমে আসছে।

ব্যক্তি জীবনে ঃ

ইসলামী জীবন দর্শনে তাক্ওয়া সব সদগুনের মূল। যে তাক্ওয়া অর্জনে সক্ষম হয়েছে সে যাবতীয় মানবীয় গুনাবলী অর্জনে ও সক্ষম হয়েছে। খোদাভীরু ব্যক্তি নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, পরকাল বিশ্বাস করে, এবং সর্বোপরি কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী স্বীয় জীবন পরিচালনা করে, তাকওয়া একটি মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যার মধ্যে তাকওয়া বিদ্যমান সে কোন পাপাচারে লিপ্ত হতে পারে না, কারণ সে জানে যে, অন্য সবাইকে ফাঁকি দেয়া যায়। মহান আল্লাহকে ফাঁকি দেয়া যায় না। তাক্ওয়া একটি সুদৃঢ় দুর্গ স্বরূপ। কারণ, যে মুমিনের অন্তরে তাক্ওয়া বিদামন সে কোন অবস্থাতে প্রলোভনে পড়বে না এবং নির্জন থেকে নির্জন স্থানে ও পাপ কাজে লিপ্ত হবে না। যার অন্তরে তাক্ওয়া আছে সে সর্বত্রই আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব করে, যার কারণে সে পাপ করতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

আত্মশুদ্ধির শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে তাক্ওয়া, আত্মার কু-প্রবৃদ্ধি থেকে নিজেকে রক্ষা করার সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হলো তাক্ওয়া, শয়তান অন্তরে কু-মন্ত্রণা শ্রেষ্ঠ করে আর কু-মন্ত্রণার থেকে বাঁচার উপায় হলো তাক্ওয়া। তাক্ওয়ার বদৌলতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করা যায়। ব্যক্তিজীবনে তাক্ওয়ার মাধ্যমে সম্মান অর্জন করা যায়।

সমাজন জীবনে তাক্ওয়ার গুরুত্ব ঃ

সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তাক্ওয়ার কোন বিকল্প নেই। তাক্ওয়া সমাজ শান্তি ও শৃংখলা সৃষ্টি করে এবং যাবতীয় বিশৃংখলা রোধ করে। একজন মুত্তাকী জানে যে, কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণে আন্তরিক না হল সমাজে শান্তি শৃংখলা থাকে না।

আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা,

অর্থ ঃ বিশৃংখলা হত্যার চেয়ে ও জঘন্য।

একটি সুষ্ঠ, সুন্দর সমাজ গঠনে যে সব গুন, বৈশিষ্ট ও উপাদান প্রয়োজন একজন মুত্তাকীর মধ্যে তা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। মুত্তাকী ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে না, প্রতারণা করে না এবঙ বিশৃংখলার সৃষ্টি করে না। তাই সুন্দর সমাজ গড়ে উঠে। অর্থাৎ একদল তাক্ওয়াবান ব্যক্তি ছাড়া সুষ্ঠ, সুন্দর ও সুখময় সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

তাকওয়া অবলম্বনকারী সত্যবাদী, বিশ্বস্ত, আমানতদার এবং সমাজ সেবক হয়ে থাকে। ফলে সমাজে তার মর্যাদা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর কারণে সে সবার প্রিয় পাত্ররূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। তাকে অনুসরণ করে অন্যরা ও বিভিন্ন সৎগুনাবলী সমূহ গ্রহণ করে। এতে করে তাকওয়ার প্রভাবের কারণে সমাজ সুন্দর হয়ে গড়ে উঠে। সমাজে ন্যায়-বিচার, ন্যায়নীতি ও সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাক্ওয়ার কোন বিকল্প নেই।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা,

Dhaka University Institutional Repository

"তোমরা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা কর, কারণ এটি তাক্ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী।"

একজন সুনাগরিককে রাষ্ট্রের অর্পিত সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে পালন করতে হবে। একমাত্র তাকওয়া অর্জনকারী ব্যক্তিই সুনাগরিক রূপে নিজেকে গড়তে পারে এবং রাষ্ট্র অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করতে পারে। সেহেতু সে আল্লাহকে ভয় করে। আর তার এ আল্লাহভীতি দায়িত্ব পালনে সচেতন করে তুলে। দায়িত্ব পালনে যখন অবহেলা করে বসে, তখনই তার মনে এ ভীতি-সৃষ্টি হয়। আমার প্রতি রাষ্ট্রের অর্পিত দায়িত্বের জন্য আল্লাহর দরবারে জবাবদীহি করতে হবে। আল্লাহ-ভীতির কারণে দায়িত্বের প্রতি-অধিক মনোযোগী হয়।

ঈমানের পরিপূর্ণতা ঃ

তাক্ওয়ার সঙ্গে ঈমানের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাকওয়া ব্যতীত ঈমানের পরিপূর্ণতা লাভ হয় না। মুমিনের হৃদয়ে তাকওয়া বিদ্যামন থাকলে পার্থিব কোন লোভ-লালসা ও প্রলোভনই তাকে পাপের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে না। আল্লাহভীতির অনুভূতি ঈমানদারকে সমস্ত পাপ ও অনাচার হতে বিরত রাখে।

জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ ঃ

তাক্ওয়া মানুষকে জাহান্নামের ভয়াবহ কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি দান করে, রসুল (সঃ) এ সম্পর্কে বলেন।

তিনি বলেন, "দু'টি চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না। তন্মধ্যে একটি চক্ষু যা আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে, আর অপর চক্ষুটি যা আল্লাহর রাস্তায় পাহারায় রত থেকে ক্রন্দন করে।

তিনি আরো বলেন,

"জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল হলে আল্লাহর ভয়"।

Dhaka University Institutional Repository

জান্নাতে প্রবেশ ঃ

তাকওয়াবান মানুষ নিশ্চিত ভাবে জান্নাত লাভ করবে। জান্নাতকে আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী লোকদের জন্য তৈরী করেছেন।

আর যে ব্যক্তি, স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং কু-প্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে। নিশ্চয়ই জান্নাতই হবে তার আবাসস্থল।

তাকওয়ার তিন পর্যায় ঃ

তাকওয়া আনিশ শিরক-অর্থাৎ শিরক থেকে তাকওয়া। তাক্ওয়া আনিল বিদ'আত-অর্থাৎ বিদ'আত থেকে তাক্ওয়া এবং ছোট ও ক্ষুদ গুনাহ থেকে তাক্ওয়া, আল্লাহ তা'আলা এ তিনটি পর্যায়কেই এক আয়াতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন।

এমন লোক যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করে তারা যা খায় বা পান করে তাতে কোন গুনাহ নেই। যেহেতু তারা পরহেযগারী অবলম্বন করেছে এবং ঈমান এসেছে ও নেক আমল করে। অতঃপর তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং নেক আমল করে। (মায়েদা ঃ আয়াত ঃ ৯৩)।

অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, প্রথম তাকওয়া হলো শিরক থেকে তাকওয়া অবলম্বন করা। এর মুকাবেলায় যে ঈমানের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। তা হলো তাওহীদ, আর দ্বিতীয় তাকওয়া হলো, বিদ'আত থেকে তাকওয়া অবলম্বন, এর মুকাবিলায় যে ঈমানের কথা বলা হয়েছে, তাতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রদর্শিত প্রত্যয় ও বিশ্বাসকেই ধরা যায়। তৃতীয় তাক্ওয়া হলো, ক্ষুদ্র ও ছোটগুনাহ থেকে তাকওয়া অবলম্বন। এর মুকাবিলায় ঈমানের কোন উল্লেখ নেই এ জন্য এর মুকাবিলায় ইহসানের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এ থেকে আনুগত্য ও তাতে দৃঢ়সংকল্পকেই বোঝানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আয়াতে তাকওয়ার তিনটি পর্যায়ই বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ ঈমান হিসেবে, সুন্নত হিসেবে ও আনুগত্যের স্থিতিশীলতা অর্জনে, আমাদের উলামায়ে কেরাম তাকওয়ার এ অর্থই করেছেন।

ইমাম গাযালী (রঃ) বলেন[১৩৬] আমার মতে, তাকওয়ার অর্থ অপ্রয়োজনীয় হালাল জিনিস বর্জন। যেমন রাসুল (সঃ) বলেছেন।

"যে সব জিনিসে কোন শংকা নেই। সে সব হালাল জিনিস পরিত্যাগ কারিগণকে মুত্তাকী বলা হয়"। সর্বসম্মতি মতে অর্থ এ ছাড়ায় যে, দ্বীনের ব্যাপারে কোন ক্ষতি বা আশংকার সৃষ্টি করে। এমন ধরনের বিষয় ও পরিত্যাগ করা তাকওয়ার অন্তর্গত।

এ বিষয়টির সঙ্গে একটা জ্বরাক্রান্ত রোগীর অবস্থা তুলনা করা যায়। কেননা, জ্বর হলে তার ক্ষতিকর যে কোন জিনিস গ্রহণ থেকেই তাকে বিরত থাকতে হয়, তা সে জিনিস খাদ্য পানীয় বা তার প্রিয় কোন ফলমূলই হোক না কেন। জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির এভাবে ক্ষতির আশংকাজনক সে কোন বিষয় পরিত্যাগ করাকে সে জিনিস সমূহ কে তার তাকওয়া অবলম্বন করা যায়।

দ্বীনের ব্যাপারে যে সব জিনিস বা বিষয়ে ভয় বা শংকার কারণ যাকে তাকে দু'ভাবে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত, নিছক হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয় দ্বিতীয়ত, অপ্রয়োজনীয় বা প্রযোজনাতিরিক্ত হালাল, কারণ, প্রয়োজনাতিরিক্ত হালালে লিপ্ত হয়ে তাতে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত হয়ে পড়লে, এ পরিস্থিতিই তাকে হারামে লিপ্ত হওয়ার দিকে আহবান জানায়। প্রবৃত্তির লালসা, ঐদ্ধত্যপনা, কামনা ও লজ্জাহীনতা থেকেই এমন অবাঞ্ছিত ঘটে থাকে।

সুতরাং যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীনকে ক্ষতি থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখতে চায়, হালাল বিষয় সমূহই যাতে শেষ পর্যন্ত হারামে লিপ্ত হওয়ার কারণ

---

[১৩৬] মিনহাজুল আবেদীন, প্রাগুক্ত, পৃ-৯২।

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে না দাঁড়াতে পারে, তজ্জন্য তার পক্ষে আশংকা ও শংকাপূর্ণ সবকিছু এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত হালাল বিষয় ও পরিত্যাগ করা উচিত।

রাসুল (সঃ) এর নির্দেশ-

"প্রয়োজনাতিরিক্ত হালল বিষয়কে লিপ্ত করার কারণ হয়ে পড়ার ভয় ও আশংকা পরিত্যাগ করবে।"

তাকওয়ার কামিল বা পরিপূর্ণ পর্যায় হলো ঃ দ্বীনের ব্যাপারে সামান্যতম ও ক্ষতির আশংকা বিদ্যমান, এমন প্রতিটি বস্তু ও বিষয়কে পরিত্যাগ করা, দ্বীনের ক্ষতির আশংকাপূর্ণ বিষয় ও বস্তু হারাম হালাল-উভয় স্থানে বিদ্যমান থাকে[১৩৭]।

গাযালী (রঃ) বলেন, এখন আমাদের শরীয়ত অনুযায়ী তাকওয়ার অর্থ জানা দরকার আমি পূর্বেই বলেছি যে, তাকওয়ার অর্থ হলো অন্তরকে সকল প্রকার পংকিলতা থেকে এমন ভাবে নির্মল ও নিষ্কলুষ করা যেন পূর্বে কখনো এ অন্তরে কোন প্রকার কলুষতা ছিল বলেই মনে হয় না। এ অবস্থা তখনই সৃষ্টি হতে পারে, যখন গুনাহ্ পরিত্যাগে দৃঢ় সংকল্পও তাতে মততপূর্ণ নিষ্ঠা অনুসৃত হবে। এমনকি, বান্দা ও গুনাহ্র মধ্যে এ 'তাকওয়া'ই একটি বাধা হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবে[১৩৮]।

মন্দ ও অকল্যাণকর জিনিস দু'প্রকারের প্রথমত প্রকৃতভাবেই মন্দ ও খারাপ, যা মূলতই পাপ ও অন্যায় বলে আল্লাহ তা'আলা সেগুলোকে হারাম করে দিয়েছেন। দ্বিতীয়, যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা কেবল আদব ও কোন কল্যাণ উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ করেছেন, যেমন অতিরিক্ত হালাল ও প্রবৃত্তির কামনা-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মাকরূহ বিষয়। সুতরং প্রথম শ্রেণীর ব্যাপারে 'তাকওয়া' ইখতিয়ার করা ফরজ। এ শ্রেণীর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে দোযখের অগ্নিতে নিপতিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাপারে 'তাকওয়া' অবলম্বন কেবল মাত্র কল্যাণ ও

---

137 মিনহাজুল আবেদনী, প্রাগুক্ত, পৃ-৯৩।
138 মিনহাজুল আবেদন, প্রাগুক্ত, পৃ-৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

মঙ্গলের জন্যই। এ তাক্ওয়া পরিত্যাগ করলে হিসেব-নিকেশে বিব্রত হতে হবে এবং সে জন্য অবশ্যই নিন্দনীয় ও হতে হবে।

সুতরাং যে ব্যক্তি প্রথম শ্রেণীর ব্যাপারে তাক্ওয়া অবলম্বন করলো, সে তাক্ওয়ার নিম্নশ্রেণী প্রাপ্ত হলো। এটা হলো আল্লাহর আনুগত্যের পথে নিষ্ঠাবানদের স্থান। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাপারে ও তাক্ওয়া অবলম্বন করতে সক্ষম হবে, সে তাক্ওয়ার উচ্চ শ্রেণী লাভ করবে। এটা হচ্ছে অতিরিক্ত জায়েয জিনিস পরিত্যাগে সকাম।

মোটকথা, বান্দা যখন উভয় প্রকার তাকওয়াই অবলম্বন করে অর্থাৎ প্রকার গুনাহর কাজ ও অতিরিক্ত জায়েয জিনিস থেকে ও বিরত থাকে, তখন তার মধ্যেই তাকওয়া সর্বাঙ্গে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠে। তাহলে বুঝতে হবে যে, এ ব্যক্তি তাক্ওয়ার হক পুরোপুরি আদায় করতে সমর্থ হয়েছে এবং তাক্ওয়ার মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে, তার সবকিছুর দুয়ার তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেছে।

এভাবে তাক্ওয়া অর্জনই পূর্ণাঙ্গ পরহেযগারী এবং এটাই দ্বীনের মূল ও ভিত্তি। এটাই আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উৎকৃষ্টতম পন্থা। তাকওয়া হিসেবে মুসলমানগণ, চার ভাগে বিভক্ত[১৩৯]। মুমিনীন, ছোলাহা, আত্কিয়া, সিদ্দীকীন।

মুমিনীন ঃ

শরী'আতের মুমেনগণ যে সব জিনিস হারাম হওয়ার ফতওয়া দেন। যারা সে সব হতে বেঁচে চলেন, তাদিগকে মমিনীন বলে। পক্ষান্তরে যারা ফতওয়ার হারামকৃত জিনিস ব্যবহার করে তাদিগকে

---

[139] তবলীগে-দ্বীন, প্রাগুক্ত, পৃ-২৪।

Dhaka University Institutional Repository

'ফাসেক বলা হয়। পানাহার প্রভৃতি ব্যাপারে আলেমদের ফতওয়া মেনে চলাই সাধারণ মুমিনদের তাক্ওয়া।

ছোলাহ ঃ

ইহারা আলেমদের ফতওয়া মেনে তো চলেনই, তদুপরি সন্দেহের জিনিসপত্র সমূহ হতে ও আত্ম-রক্ষা করে থাকেন। কারণ, আলেমগণ প্রকাশ্য অবস্থা দেখে যদি ও সন্দেহযুক্ত জিনিসের প্রতি হালাল হওয়ার ফতওয়া দিয়েছেন, কিন্তু তাতে সন্দেহ বিদ্যমান থাকার দরুণ ছোলাহাগণ তা ও ব্যবহার করেন না, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ঘোষণা করেন, "যে জিনিস সন্দেহ হয়, তা বর্জন কর এবং এমন জিনিস গ্রহণ কর, যাতে সন্দেহ নাই।"

আত্কিয়া ঃ

ইহারা হারাম এবং সন্দেহযুক্ত জিনিস ও ব্যবহার করেনই না, তদুপরি সন্দেহযুক্ত জিনিস ব্যবহৃত হওয়ার ভয়ে তাঁরা অনেক নিঃসন্দেহ জিনিস ও ছেড়ে দেন, রাসুল (সঃ) এরশাদ করেন।

মুসলমান সন্দেহযুক্ত জিনিসে পতিত হওয়ার ভয়ে নিঃসন্দেহ জিনিসকে পরিত্যাগ না করলে কখন ও আত্কিয়াদের পদ পাবে না। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, "হারামের ভয়ের আমরা হালালের ও দশ ভাগের নয় ভাগ পরিত্যাগ করে থাকি।" এজন্যই মুত্তাকী অন্যের নিকট হতে নিজের প্রাপ্য আদায় করার সময় কিছু কম গ্রহণ করেন এবং অন্যের প্রাপ্য দিবার সময় কিছু বেশী দিয়ে থাকেন। হযরত ওমর ইব্ন আবদুল আজীজের ঘটনা বর্ণিত আছে, যখন তার নিকট বায়তুল মালের মৃগনাভি আমার নিজের নহে, সুতরাং ইহার সুগন্ধ উপভোগ করা আমার পক্ষে বিধেয় নহে। সুস্বাদু হালাল খাদ্য ব্যবহার করা হতে ও তাঁরা এজন্যই বিরত থাকেন। কারণ, আজ মজাদার হালাল খাদ্য খেয়ে লোভ বাড়ায়ে তুললে হয়ত কাল হারাম জিনিসের প্রতি ও লোভ হবে।

Dhaka University Institutional Repository

এজন্যই কোনআন শরীফের স্থানে স্থানে কাফেরদের ধনসম্পত্তি ও সাজসজ্জার প্রতি দুকপাত করতে ও নিষেধ করা হয়েছে। বাস্তবিকই দুনিয়ার মালদৌলতের মহব্বত অন্তরে স্থান পেলে ক্রমশঃ আত্মা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ঈমানের মহব্বত কমতে থাকে।

সিদ্দীকীন ঃ

ইহারা উপরের তিন পর্যায় অর্জন করার পর এমন খাদ্য ও গ্রহণ করেন না, যাতে ইবাদত বন্দেগীর কোন সাহায্য হয় না, তা পরিত্যাগ করা, অর্থাৎ উপল্লেখিত তিন প্রকার তাক্ওয়া আয়ত্ব করার পর ইবাদতে সহায়তা করে না এরূপ হালাল কাজ ত্যাগ করা, রাসুল (সঃ) এরশাদ করেন,

"হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত। রাসুল (রঃ) বলেনঃ হে আয়েশা! ছোট খাট গুনাহর ব্যাপারে ও সতর্ক হও, কেননা এজন্য ও আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহি করতে হবে[১৪০]। কবিরা গুনাহ যেমন কোন মুসলমানের মুক্তি লাভকে বিপদগ্রস্ত করে দেয়। অনুরূপ ভাবে ছোটখাট গুনাহর ব্যাপারটি ও কম বিপদজনক নয়। ছোট খাট গুনাহ বাহ্যত ইলিকা এবং তুচ্ছ মনে হলেও তা বারবার করার কারণে অন্তরাত্মায় মরিচা ধরে যায় এবং কবিরা গুনাহর প্রতি ঘৃনাবোধ নিঃশেষ হয়ে যায়। হাফেজ ইবনুল কাইয়্যেম (রঃ) লিখেছেন, গুনাহ কত ছোট তা দেখ না, বরং সে মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বকে সামনে রাখ যার অবাধ্যাচরণ করার দুঃসাহস দেখানো হচ্ছে। বিচার দিনের মালিকের মহানত্ব এবং তার ভয়ংকর শাস্তির কথা স্মরণ থাকলে মানুষ ক্ষুদ্র থেএক ক্ষুদ্রতর গুনাহ করতে ও দুঃসাহসী হতে পারে না।

---

[১৪০] ইনতেখাবে, হাদীস, আবদুল গাফ্ফার হাসান, রহমানী নদভী, (ইবনে মাজা), পৃ-৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

উপায়-উপকরণের পবিত্রতা ঃ

"হযরত ইব্‌ন মাসুউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল (সঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহর নির্ধারিত রিযিক পুর্ণমাত্রায় লাভ না করা পর্যন্ত কোন লোকই মারা যাবে না। সাবধান! আল্লাহকে ভয় কর এবং বৈধ পন্থায় আয় উপার্জনের চেষ্টা কর, রিযিক প্রাপ্তির বিলম্ব যেন তোমাদেরকে অবৈধ পন্থা অবলম্বনে প্ররোচিত না করে। কেননা আল্লাহর কাছে যা কিছু রয়েছে তা কেবল আনুগত্যের মাধ্যমেই লাভ করা যায়[১৪১]।

কোন ব্যক্তি যদি রিযিক লাভে ব্যর্থতা অথবা বিলম্ব অনুভব করে তবে তার হতাশ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যে পরিমাণ রিযিক নির্ধারণ করে রেখেছেন তা সে বিলম্বে হোক অথবা ত্বরিতে অবশ্যই লাভ করবে।

আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা,

যমীনে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই, যার রিযিকের ব্যবস্থা আল্লাহর উপর নয় এবং যার স্থায়ী অস্থায়ী অবস্থান সম্পর্কে তিনি অবহিত নন। এসব কিছুই এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (হুদ ঃ আয়াত-৬)।

কোন কোন মানুষ আল্লাহর অবাধ্য হওয়া সত্ত্বেও বাহ্যত স্বাচ্ছন্দে ও বিলাসিতার মধ্যে জীবন যাপন করছে। কিন্তু তা মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য একটা অবকাশ মাত্র। এর পরেই তাদের উপর আল্লাহর আযান নিপতিত হয়। প্রকৃত স্বাচ্ছন্দ ও আরাম-আয়েশ তাই য-আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করার মাধ্যমে লাভ করা যায়।

আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা,

---

[১৪১] এত্তযাবে হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ-৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তাদের সাথে তামশা করেন, এবং তাদিগকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তির ন্যায় ঘুরিয়ে বেড়াইবার অবকাশ দেন। (বাকারাহ ঃ আয়াত-১৫)

তাক্ওয়ার পরিমন্ডল ঃ

তাক্ওয়ার মূল কেন্দ্র হচ্ছে অন্তর, অন্তরে যতি তাকওয়া না থাকে তা হলে বাহ্যিক তাকওয়ার কোন মূল্য নেই, এ তাকওয়া শুধু মানুষকে দেখানো ছাড়া আর কিছু নই।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সঃ) বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না, তাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করবে না এবং তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না। তিনি নিজের বুকের দিকে ইশারা করে বলেন ঃ তাকওয়া এখানে, তাক্ওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে। কোন লোকের নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্টই যে, সে তার মুসলিম বাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, প্রতিটি মুসলমানের জীবন, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান সকল মুসলমানের সম্মানের বস্তু। (মুসলিম)

মানুষের অন্তর রাজ্যে যদি তাক্ওয়ার বীজ শিরক গড়তে পারে তবে তার বাহ্যিক দিক ও সৎ কাজের পত্র পল্লবে শুশোভিত হয়ে যায়। কিন্তু অন্তরেই যদি তাক্ওয়ার নাম নিশানা না থাকে তবে তাকওয়ার বাহ্যিক বিরল রূপ না তৈনিক চরিত্রে সুন্দর পরিবর্তন আসতে পারে, আর না মানুষের আখেরাতের সাফল্য আসতে পারে।

হযরত নো'মান ইব্ন বশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন যে, রাসুল (সঃ) বাণী প্রদান করেছেন ঃ সাবধান! নিশ্চয়ই দেহের মধ্যে একখন্ড গোশত আছে, যখন ইহা সুস্থ থাকে তখন সমস্ত দেহটি সুস্থ থাকে আর যখন ইহা অসুস্থ থাকে বা দূষিত হয়, তখন সমস্ত দেহটাই অসুস্থ হয়ে পড়ে সাবধান! ইহা হচ্ছে অন্তঃকরণ।

Dhaka University Institutional Repository

অত্র হাদিস দ্বারা বুঝা গেল দেহরাজ্যে যে অন্তঃকরণ রয়েছে ইহা সুস্থ থাকলে সমস্ত দেহ সুস্থ থাকে। অর্থাৎ এ দেহ রাজ্যে তাক্ওয়ার বীজ শীকড় মজবুত থাকে। তাহলে সমস্ত দেহ সুস্থ থাকবে।

মুত্তাকীর গুনাবলী ঃ

মুত্তাকীর গুনাবলী দু'টি ভিত্তির উপর স্থাপিত। একটি ঈমান ও অন্যটি আমল। ঈমান ও আমলা মিলে তাকওয়া পুর্ণতা লাভ করে। মুমিন ও মুত্তাকী সমার্থবোধক শব্দ, আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং আমল ছাড়া যেমন মুমিন হওয়া যায় না। অনুরূপ এ তিনটি গুনের অনুপস্থিতিতে মুত্তাকী হওয়া যায় না।

১. অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন ঃ অদৃশ্যে বিশ্বাস সমূহ হলো, আল্লাহ, ফেরেশতা, বেহেশত, দোযখ, হিসাব-নিকাশ, আরশ-কুরাশ ইত্যাদি, সাধারণ মানবীয় জ্ঞানে এ সমস্ত বোধগম্য হয় না বলে এগুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। হযরত ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর মতে অদৃশ্যে বিশ্বাস বলতে বাহ্যিক দৃষ্টির অগোচরে অবস্থিত বেহেশত, দোযখ, ফিরেশতা, পুলসিরাত, মিযান ইত্যাদি বস্তুকে বুঝায়।

২. নামায প্রতিষ্ঠা ঃ যথাযথভাবে, যথানিয়মে, যথাসময়ে সমষ্টিগত সকল শর্ত পালন করে নিষ্ঠার সহিত নামায সম্পাদন করে এবং যথারীতি নামাযের ব্যবহার প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা করা।

৩. আল্লাহপথে ব্যয় ঃ আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা হতে তাঁর নির্দেশিত পথে ব্যয় করা।

৪. শেষ নবীর প্রতি বিশ্বাস ঃ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি এবং তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাবের উপরা বিশ্বাস স্থাপন করা।

৫. পূর্ববর্তী নবী ও রাসুলদের প্রতি এবং তাদের উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করা।

৬. পরকাল ঃ পরকাল সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী অর্থাৎ দুনিয়ার ক্ষনস্থায়ী জীবন থেকে আল্লাহর নির্দেশে কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং আখিরাত বা পরকালের।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ গীবত

গীবতের সংজ্ঞা ঃ

কোন মুসলমানের অনুপস্থিতিতে তার সম্বন্ধে এমন কোন কথা বলা, যা শুনলে তার মন ক্ষুন্ন হবে, ইহার নাম গীবত[১৪২]। গীবত বলা হয় অপরের এমন সমালোচনা করাকে যা সে শুনলে খারাপ মন করে[১৪৩]। রাসুল (সঃ) স্বয়ং গীবতের সংজ্ঞা এরূপ বর্ণনা করেছেন, "তিনি বলেন, তোমরা জান গীবত কাকে বলে? সাহাবায় কেরাম আরজ করলেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই বেশী জানেন। তিনি বললেন, তোমার ভাইয়ের এমন আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে।

গীবত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

"তোমরা পরস্পর পরস্পরকে গীবত বা নিন্দা করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভ্রাতা মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে ? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃনাই কর, আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তওব কবুলকারী, গরম দয়ালুন (আল হুজুরাত ঃ ১২ আয়াত)।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা গীবতকারী গলিত পাঁচ মাংস ভোজীর সাথে তুলনা করেছেন। অতএব গীবত করা যে কত বড় অপরাধ অত্র আয়াত থেকে বুঝা যায়। গীবত কারীকে শকুনের চরিত্রের সাথ তুলনা করা হয়েছে। শকুর যেমনি ভাবে পাঁচ গোশত ভোজন করে তেমনি গীবতকারী তার অজান্তে স্বীয় ভাইয়ের পঁচা গোশত ভোজন করে।

---

142. ইমাম গাযালী, তবলীগে দ্বীন, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৪।
143. সত্যের সন্ধানে, প্রাগুক্ত, পৃ-৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

গীবতের ব্যাখ্যা ঃ

অপরের দৈহিক ত্রুটি, বংশগত ত্রুটি, চারিত্রিক ত্রুটি অথবা কথা, কর্ম, ধর্ম, পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহ, সওয়াবীর দোষ সম্পর্কিত হলে ও তা গীবত কাকে ও বোকা বা বুদ্ধিহীন বলা, কারো মান যম্ভ্রম প্রভৃতি যে কোন জিনিস তার সঙ্গে সংস্রব উহার কোন দোষ প্রকাশ করা, যা শুনলে লোকটি মনে কষ্ট হবে। তাও গীবত, গীবত মুখে বলার উপর নির্ভরশীল নয় বরং যে পন্থায় কেউ অপরের দোষ জেনে নিতে পারে, তাই গীবতের মধ্যে দাখিল হবে ইঙ্গিতে হোক অথবা নকল করার মাধ্যমে হোক। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একবার এক মহিলা আগমন করল, সে যখন চলে গেল, তখন আমি হাতে ইশারা করে প্রকাশ করলাম যে, সে বেঁটে ছিল, রাসুল (সঃ) বললেন, তুমি তার গীবত করেছ। যদি কেউ খোঁড়া ব্যক্তির নকল করে তবে এটাও গীবত বরং গীবত এর চেয়ে বেশী, কেননা, এতে আসল আকার এর চেয়ে বাড়িয়ে দেখানো হয়, যদি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ কিছু লিখে কিংবা তার বাক্য পুস্তকে উদ্ধৃত করে, তবে এটাও গীবতের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু কোন কারণ অথবা ওযর লিখে দিলে গীবত হবে না। নাম নির্দিষ্ট না করে যদি "কিছু লোকে বলে" লিখা হয়, তবে গীবত হবে না। নির্দিষ্ট হয় না, এমন ভাবে বললে তাতে গীবত হবে না, রাসুল (সঃ) যখন কোন ব্যক্তির কাজ খারাপ মনে করতেন, তখন এভাবে বলতেন, মানুষের কি হল যে, তারা এমন কাজ করে?

বিস্ময় প্রকাশ করা ও গীবত ঃ

গীবত শুনার পর বিস্ময় প্রকাশ করা ও গীবত। কেননা, বিস্ময় প্রকাশ করলে গীবতকারী আনন্দিত হয় এবং আরো বেশী বলতে উদ্যত হয়, বরং চুপ চাপ শ্রবন করা ও গীবতের অন্তর্ভূক্ত, হাদীসে আছে,

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ ঃ "শ্রোতা ও গীবত কারীদের একজন।" শ্রোতার উচিত মুখে গীবত করতে নিষেধ করা। এতে সক্ষম না হলে অন্তরে খারাপ মনে করা, নিষেধ করা সম্পর্কে হাদীসে আছে।

যার নিকটে কোন মুমিনকে অপদস্থ করা হয় এবং সাহায্য করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সে সাহায্য না করে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সকলের সামনে তাকে অপদস্থ করবেন।

রাসুল (সঃ) আরো এরশাদ করেন।

"যে তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার ইযযতের উপর হামলাকে প্রতিহত করে, কিয়ামতের দিন তার ইযযতকে রক্ষা করা আল্লাহ তা'আলার জন্যে জরুরী হয়ে পড়বে"।

গীবতের সীমা ঃ

কারো যে বিষয় আলোচনা করা হয়, তা যদি তার মধ্যে থাকে, তা হলেই তাই গীবত। আর যদি সে বিষয় তার মধ্যে না থাকে তা আরো বড় অন্যায় অর্থাৎ অপবাদ সাহানা কেরাম রাসুল (সঃ) এর নিকট আরয করলেন, যে বিষয় আলোচনা করা হয়, তা যদি তার মধ্যে থাকে ? তিনি বললেন, সে বিষয় তার মধ্যে থাকলেই তো গীবত। না থাকলে তা আরো বড় অন্যায় অর্থাৎ অপবাদ হবে। হযরত আয়েশা জনৈক মহিলা সম্পর্কে মন্তব্য করলেন যে, সে বেঁটে। রাসুল (সঃ) বললেন, আয়েশা তুমি তার গীবত করেছ।

যিনার চেয়ে জগন্যতম ঃ

গীবত করা কবিরা গুনাহ, যিনা করা জগন্যতম অপরাধ, অথচ গীবত করা যিনা থেকে আরো মারাত্মক অপরাধ রাসুল (সঃ) এর বাণী।

Dhaka University Institutional Repository

"হযরত জাবের এবং আবু সা'য়ীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সঃ) এরশাদ করেন, তোমরা গীবত থেকে বেঁচে থাক। কেননা গীবত যিনার চেয়েও জঘন্যতম।"

যিনা থেকে জঘন্যতম হওয়ার, যিনা করে মানুষ তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তওবা কবুল করে, নেয়। কিন্তু গীবত কারীকে ক্ষমা করা হয় না, যার গীবত করা হয় যতক্ষণ সে ক্ষমা না করে। যদিকারী আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন, কিন্তু গীবতকারীকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না। ইহা বান্দার অধিকার আল্লাহ তা'আলা বান্দার অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করেন না। যে ব্যক্তির গীবত করা হয়েছে তিনি ক্ষমা না করা পর্যন্ত ক্ষমা করা হয় না। তবে দুনিয়ার জীবনে গীবতকারী যদি তার থেকে ক্ষমা নিতে না পারেন। তাহ হলে আল্লাহ তা'আলা গীবতকারীর নেকআমল (পূণ্য) সমূহ যার গীবত করা হয়েছে তার আমলনামায় ভরপুর করে দিবেন। এতে করে গীবতকারী পরকালে তার নেক আমল সমূহ খুঁজে পাবে না। অতঃপর গীবতকারী আল্লাহ তা'আলাকে বলবেন, হে প্রভূ" আমি অমুক অমুক নেক আমল করেছিলাম। ঐ গুলি কোথায়? আল্লাহ তা'আলা উত্তর দিবেন, তোমার সজান্তে তোমার গীবত ঐ আমল গুলি ধ্বংস করে দিয়েছে।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুল (সঃ) বলেন, মেরাজ রজনীতে আমি এমন লোকদের কাছে ও গমন করেছি, যারা আগন মুখমন্ডল নখ দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করছিল। আমি জিব্রাইল (আঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা মানুষের গীবত করতো এবং তাদের ইযযত নিয়ে কথাবার্তা বলতো।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুসা (আঃ) এর প্রতি আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে ওহী প্রেরণ করেন যে ব্যক্তি গীবত থেকে তওবা করে মরবে, সে সকলের পিছনে জান্নাতে যাবে।

গীবতের উপর ইমাম গাযালী (রঃ) গবেষণা করে মোট ১১ (এগার) টি কারণ নির্ধারণ করেন[১৪৪]। নিম্নে তার আলোচনা করা হলো।

১. মানুষ যখন কারো কোন কথায় রাগ হয়, রাগের মাথায় সে অন্যের সমালোচনা করে। এতে সে মনে করে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। এতে তার রাগ কমে।

২. এক সাথে বসে কয়েকজন লোক যদি কারো গীবত করে আর সে সময় যদি কোন কোন লোক সেখানে এসে উপস্থিত হয়, তখন সেও গীবত করে থাকে। কারণ তার চুপচাপ বসে থাকা কেউ পছন্দ করে না।

৩. পুর্ব সতর্কতার কারণে গীবত করা হয়। অর্থাৎ যখন কেউ বুঝতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি কোন বড়লোকের সামনে তার দোষ বর্ণনা করবে কিংবা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, তখন পূর্ব থেকেই সে তার দেখে বর্ণনা করতে শুরু করে হাতে তার সম্পর্কে কিছু বলা হলে তা শ্রবন্যযোগ্য না হয়।

৪. কারো প্রতি যখন মিথ্যে অপবাদ দেওয়া হয়, তখন সে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য অন্য লোককে অপবাদ দেয়।

৫. গর্ব ও আস্কালনের ইচ্ছায় গীবত করা হয়, যাতে অপরকে হেয় বলে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা যায়। যেমন কারো সম্পর্কে বলা যায় যে, সেতো মূখ্য-কিছুই বুঝে না। এর উদ্দেশ্যে এ থাকে যে, তার তুলনায় আমি বেশী জানি।

---

[১৪৪] হারুনুর রশিদ, মুসলিম মনীষীদের ছেলে বেলা, ঢাকা ঃ এম, এইচ পাবলিকেশন্স, পৃ-৫২।

Dhaka University Institutional Repository

৬. পরশ্রী লোক তার সম-সাময়িক কোন লোকের সুনাম সহ্য করতে পারে না। অবশেষে কোন উপায় না দেখে গীবত করে যাতে লোকের কাছে সুনাম নষ্ট না হয়।

৭. হাসি-তামসার জন্য অনেক সময় খেয়াল খুশি মতো একে অন্যের গীবত করে থাকে।

৮. কারো প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রুপ এবং উপহাস করার উদ্দেশ্যে অনেক সময় গীবত করা হয়।

তিনটি ধর্ম পরায়ন লোকের মধ্যে বিদ্যমান

৯. কারো দ্বীনদারীর ত্রুটি অবগত হয়ে বিস্মিত হওয়া এবং এরূপ বলা হয় যে, অমুকের ব্যাপারে আমার কাছে বিস্ময়কর ঠেকেছে। খদি ও ধার্মিক ব্যক্তির ত্রুটি অবগত বিস্ময়ের কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু অপর ব্যক্তির উচিত ছিল তার নাম নাবলা এখানে নাম বলা গীবত।

১০. কারো ত্রুটি দেখে দয়া পরবশ হওয়া এবং দুঃখ করা।

১১. আল্লাহর জন্য কারো প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা অর্থাৎ কাউকে খারাপ কাজ করতে দেখার পর ধর্মের কারণে ক্রোধ দেখা দেয়। এতে তার নাম উচ্চারণ করা গীবত হবে।

গীবত থেকে আত্মরক্ষার উপায় ঃ

সচ্চরিত্রতার চিকিৎসা এলেম ও আমলের ঔষধ দ্বারা হয়ে থাকে। গীবত থেকে জিহবাকে সংসদ রাখার উপায় দু'টি একটি সংক্ষিপ্ত ও অপরটি বিস্তারিত, সংক্ষিপ্ত উপায় এসে, মানুষ এ কথা বিশ্বাস করে নিবে যে, সে গীবতের কারণে আল্লাহর গযবে পতিত হবে। আরো বিশ্বাস করবে যে, কিয়ামতের দিন গীবতকারীর কাছে পূর্ণ না থাকলে বদল স্বরূপ অপর ব্যক্তির গোনাহ তার আমল নামায় লিখে দেওয়া হবে। ফলে যে দোযখীই হবে। মোট কথা, মানুষ গীবত সম্পর্কিত হাদীস সমূহ গবেষণা করলে, ভয়ে গীবত করা থেকে আত্ম রক্ষা করার উপায় খুজে পাবে। যখন গীবত করার খেয়াল হয়, তখন মনে মনে ভাববে যে

Dhaka University Institutional Repository

নিজের মধ্যে কোন দোষ আছ কি না? এ চিন্তা করলে ও গীবত করা থেকে বাঁচা যায়। রাসুল (সঃ) এরশাদ করেন, "সে ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যার নিজের দোষ তাকে অপরের দোষ থেকে ফিরে রাখে।"

অত হাদিসের আলোকে বুঝা যায়, মানুষ স্বীয় অন্যায় অপরাধের চিন্তা করলে অন্যের গীবত করা থেকে বেঁচে থাকার সুযোগ পায়।

গীবত জায়েয হওয়ার কারণাদি ঃ

অপরের গীবত করার পিছনে যদি কোন বিশুদ্ধ ও শরীয়ত সম্মত উদ্দেশ্য থাকে, তবে সে গীবতে গোনাহ হয় না।

প্রথম ঃ জুলুমের বিচার প্রাপ্তির জন্য গীবত করা, উদাহরণ স্বরূপ, নির্যাতিত ব্যক্তি যদি উচ্চতম শাসনকর্তাকে বলে যে, অমুক নিম্ন পর্যায়ের শাসক আমার উপর জুলুম (নির্যাতন) করেছে, খিয়ানত করেছেন, অথবা আমার কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণ করেছে, তবে এটা গীবতের অন্তর্ভূক্ত নয়। কেননা এটা না করলে বিচার পাওয়া যাবে না। কিন্তু নির্যাতিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ এরূপ বললে গীবত হবে। নির্যাতিত ব্যক্তির জন্য জালেমের নিন্দা বা গীবত করা দুরস্ত আছে।

দ্বিতীয় ঃ মন্দ বিষয় দূর করা অথবা গোনাহগারের সৎ পথে আসার জন্য গীবত করা, যেমন একবার হযরত ওমর (রাঃ) যখন হযরত ওসমান (রাঃ) কিংবা তালহা (রাঃ) এর কাছ দিয়ে গমন করে এবং তাকে "আস্সালামু আলাইকুম বলেন, তখন তিনি উত্তর দিলেন না, হযরত ওমর (রাঃ) এ বিষয়ে হযরত আবুবকরের কাছে অভিযোগ করলে তিনি নিজে তাদের কাছে গিয়ে উভয়ের সন্দি করে দেন। এ অভিযোগ সাহাবায়ে কেরামতের মতে গীবত ছিল না। কেননা, এর উদ্দেশ্য ছিল সন্ধি স্থাপন করা।

তৃতীয় ঃ শরীয়তের মাস'আলা জানার জন্য গীবত করা জায়েজ, উদাহরণ স্বরূপ, কোন আলেমের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে যে, আমার পিতা, ভ্রাতা অথবা পত্নী আমার উপর নির্যাতন করেছে, এখন শরীয়ত

Dhaka University Institutional Repository

এর আইন অনুযায়ী আমার করণীয় কি ? শরীয়তের মাসআলা জানার জন্য এ ধরনের করা ইসলামে অনুমোদিত।

চতুর্থ ঃ কোন মুসলমানকে অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য গীবত করা, যেমন, কোন ব্যক্তি কাউকে চাকর রাখতে চায় কিন্তু তার কোন দোষ সম্পর্কে সে অবগত নয়। তার কোন বন্ধু এ চাকরের দোষ সম্পর্কে অবগত। এমতাবস্থায় বন্ধুর জন্য জায়েয যে, সে চাকরের দোষ মুনির বন্ধুকে বলে দিবে। এতে যদিও চাকরের ক্ষতি কিন্তু বন্ধু উপকারের প্রতি প্রথমে লক্ষ্য রাখতে হবে। এমনি ভাবে বিবাহের ব্যাপারে যদি কেউ কারো অবস্থা জিজ্ঞেস করে, তবে যে রূপ জানে, সে রূপই বলে দেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে দোষ প্রকাশ করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাছাড়া ও চার ব্যক্তির গীবত প্রকাশ করা দোষ নয়। জালেম শাসেক, বিদ আতী, ফাসেক ও প্রকাশ্য পাপাচারী।

পঞ্চম ঃ যে ব্যক্তি এমন পদবীতে খ্যাত হয়ে গেছে, যার মধ্যে কোন দোষ আছে যেমন খোঁড়া, অন্ধ, টেকু ইত্যাদি, এসব পদবী বললে গীবত হয় না।

ষষ্ঠ ঃ যার দোষ প্রকাশ করা হয়, সে প্রকাশ্য পাপাচারী হলে গীবত হয় না। অর্থাৎ, যে সর্বসমক্ষে পাপাচার করে এবং তার পাপাচার কারো কাছে গোপন নয়; যেমন মদ্যপায়ী, নারী বৎ পুরুষ ইত্যাদি, হাদীসে আছে।

"যে ব্যক্তি লজ্জা-শরমের মুখোশ দূরে নিক্ষেপ করে, তার গীবত, গীবত নয়"। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি খোলাখুলি পাপাচার করে তার কোন ইযযত হুরমত নেই, অর্থাৎ তার দোষ প্রকাশ করলে মানহানী ও গীবত হবে না। কিন্তু যে গোপন করে, তার ইযযতের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

গীবতের কাফ্ফারা ঃ গীবতকারীর অবশ্যই কর্তব্য হচ্ছে গীবত থেকে তওবা করা অর্থাৎ স্বীয় কর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া অতঃপর যার গীবত করা হয়, তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। এতে আল্লাহর হক

Dhaka University Institutional Repository

ও বান্দার হক থেকে মুক্ত পাওয়া যায়। হযরত হাসান (রঃ) বলেন, যে ব্যক্তির গীবত করা হয়, তার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করাই যথেষ্ট। মাফ চাওয়া প্রয়োজন নেই এর প্রমাণ হযরত আমান (রাঃ) বর্ণিত, রাসুল (রঃ) এরশাদ করেন।

"তুমি যার গীবত করেছ তার কাফফারা এসে, তুমি তার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করবে।"

মুজাহিদ (রঃ) বলেন-কারো মাংস খাওয়ার কাফফারা এটাই যে, তার প্রশংসা করতে এবং তার জন্য উত্তম দোয়া করবে। আতা ইবনে আবী রাবাহকে জিজ্ঞেস করা হলো। গীবত থেকে তওবা কিভাবে হয়? তিনি বললেন-যার গীবত করা হয় তার কাছে গিয়ে বলবে, আমি যা বলেছি প্রলাপোক্তি ছিল আপনার উপর জুলুম ও বাড়াবাড়ী হয়েছে। এখন আমি উপস্থিত ইচ্ছা করলে প্রতিশোধ নিতে পারেন। নতুবা মাফ করে দিন। তবে সর্বসম্মতি মতে এ উক্তিটা সঠিক। আর যারা বলে ইযযতের কোন বদল নেই, এর জন্য ক্ষমা চাওয়া ওয়াজেব নয়। তাদের উক্তি ঠিক নয়। কেননা উযযত নষ্ট হয় এমন গালি দিয়ে তজ্জন্য শাস্তি দেওয়া হয়। জনৈক মহিলা অন্য এক মহিলাকে "লম্বা আঁচল ওয়ালী" বললে হযরত আয়েশা তাকে বলেছিলেন তুমি তার গীবত করেছ, এখন তার কাছে ক্ষমা চাও। এ থেকে বুঝা গেল যে, যদি সম্ভবপর হয় ক্ষমা করে নেওয়া দরকার। কিন্তু যদি সে ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হয় অথবা মৃত হয়। তবে অবশ্যই উত্তম দোয়া করবে এবং পূণ্য কাজের সওয়াব বখ্‌শে দিবে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ অহংকার, হিংসা, ক্রোধ, রিয়া

অহংকারের সংজ্ঞা ঃ

সদগু নাবলীতে অন্যের তুলনায় নিজেকে শ্রেষ্ট মনে করাকেই অহংকার বলে। আরবীতে ইহার নাম তাকাববুর। যে কোন ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর কোন মাখলুকের তুলনায় উত্তম মনে করবে, সে অহংকারী।শ্রেষ্টত্ব আল্লাহ তা'আলার ভূষন এবং অহংকার তাঁর আবরন। যে ব্যক্তি এ দুটা নিয়ে টানা-হেঁচড়া করেছে, ইহা তাকে ধ্বংস কচ্ছে। অন্তঃকরনে নিজেকে উচ্চ এবং বড় ধারণা করা থেকে অহংকারের উদয় হয়। মানুষের মনে এমন ভাবের উদয় হলে স্বভাবতঃ আত্মশ্লাঘা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং নফ্স ফুলে উঠে এবং পদে পদে অহংকারের নিদর্শন প্রকাশ পেতে থাকে। যেমন, পথ চলার সময় সকলের আগে চলতে আগ্রহ করা, সভার কেন্দ্রস্থলে বসতে প্রয়াসী হওয়া,কেহ উপদেশ দিলে ভ্রুকুঞ্চিত করে অবহেলা করা,অন্যকে অবজ্ঞার চুক্ষে দেখা,অন্যে সালাম না করলে ক্রোধান্বিত হওয়া এবং অন্যে সালাম পাওয়ার আশায় থাকা, সাধারণ লোককে ইতরজীবের মত মনে করা ইত্যাদি।

অহংকার মারাত্মক রোগ ঃ

অহংকার একটি দুরারোগ্য ও ধ্বংসকারী ব্যাধিন। আল্লাহর নিকট ইহা অত্যন্ত ঘৃনিত ও ক্রোধের বস্ত। এ ব্যাধি পারস্য সম্রাটের মেরুদন্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে এবং রোম সম্রাটের গর্বকে খর্ব করে দিয়েছে। শয়তান অহংকার করে বলেছিল।

আমি তাঁর (আদম) চেয়ে ভাল । আমাকে তুমি আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছ, আর তাঁকে সৃষ্টি করেছ মাটি দিয়ে। (আরাফ ঃ ১২) 'শয়তান' যাকে আযাজিল নামে ডাকা হতো। সে নিজেকে হযরত আদম (আঃ) এর চেয়ে শ্রেষ্টত্ব মনে করেছি। অথচ শ্রেষ্টত্ব আল্লাহ তা'আলার ভূষণ, তার এ অহংকারী মনভাবের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে চির অভিশপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে ঘোষনা করেন, যেহেতু সে আল্লাহ তা'আলার আবররণ নিয়ে টানাটানি করেছিল। সে ফেরেশতাদের শিক্ষক ছিল। তার অহংকারী মনভাবের কারণে তাকে উক্ত সম্মানজনক পদ থেকে ও বহিষ্কার করা হয়েছিল, এতে বুঝা গেল অহংকার পতনের মূল ।

আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা,

অহংকারী লোকের পরিনাম নিতান্ত শোচনীয় হবে।

তিনি আরো ঘোষণা,

বড়ত্ব আমার একার অধিকার,যারা ইহার বৃথা দাবীদার হবে

আমি তাদিগকে ধ্বংস করবো।

রাসুল (সঃ) ঘোষ ণা করেন।

যার অন্তরে অনু পরিমাণ ও অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম)

যারা ধন ও সম্মানের অধিকারী হয়েও লোকের সংগে নম্র ব্যবহার করেন, তাঁরা আল্লার নিকট উচ্চ পদের অধিকারী। দুনিয়াতেও তারা সম্মান পাবে, আখেরাতেও তারা সম্মানিত হবে।

রাসুল। (সঃ) এরশাদ করেন,

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নম্রতা অবলম্বন করে, সে নিজের কাছে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু মানুষের চোক্ষে মহান,আর যে ব্যক্তি অহংকার করে আল্লাহ তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে, ফলে সে মানুষের কাছে হয় তুচ্ছ।

অহংকার দু প্রকার, সাধারণ অহংকার-প্রত্যেক ব্যাপারে যে নিজেকে অধিক উপরে উঠিয়ে ধরে এবং অধিক কিছুর আকাঙ্ক্ষা করে। বিশেষ অহংকার ঃ যে সত্য থেকে নিজেকে উর্ধ্বে মনে কনে বা এড়িয়ে চলে,একটা বড় গুনাহ।

Dhaka University Institutional Repository

অহংকারের অপকারিতা ঃ

প্রথমন অপকারিতা ঃ বড়ত্ব খোদা তা'আ লার বিশিষ্ট গুন। এ গুন কেবল আল্লাহর জন্য শোভা পায়।মানুষ সব কাজেই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। অন্যের উপর মানুষের অধিকার থাকাত দূরের কথা,নিজের উপর ও তার অধিকার নাই। সুতরাং তার পক্ষে আল্লাহ তাআ'লার এ বিশিষ্ট গুনের দাবী করা কিরূপে শোভনীয় হতে পারে? মানুষের দুর্বলতা ও মুখাপেক্ষতা সত্ত্বেও উক্ত বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার সংগে লড়াই বাধাতে গেলে তাতে নিতান্ত বোকামি প্রকাশ পাবে কি?

দ্বিতীয় অপকারিতা ঃ অনেক সময় অহংকারের দরুন সত্যের বিরুদ্ধে অভিযান করতে হয়। তদরুপ **ধর্ম বিষয়ে** অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে। আর অহংকারীন খোদার সৃষ্ট জীবকে অবজ্ঞার চোক্ষে দেখে থাকে। আল্লাহ তাআলার নিকট ইহা খুবই অপছন্দনীয়।

তৃতীয় অপকারিতা ঃ অহংকার মানুষকে কোন প্রকার সদগুন অর্জন করতে দেয় নাহ।ইহাতে মানুষ নম্রতাহারা হয়ে থাকে। অহংকারীগণ হিংসা ও ক্রোধ দমন করতে সক্ষম হয়। তাদের দ্বারা কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি কোন প্রকার সহানু ভূতি প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নহে। অহংকারী ব্যক্তি নিজের আত্মগরিমার নিশায় মত্ত থাকার দরুন কারো উপদেশ গ্রহন করতে চায় না।স্বীয় আত্মার সংশোধন ও তার পক্ষে কষ্টকর হয়।

মোট কথা, অহংকার রূপ বিষ অন্তরে থাকতে কোন প্রকার উন্নতিরই আশা করা যায় না। এ জন্য এ রোগের আশু চিকিৎসা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অহংকারের চিকিৎসা ঃ

অহংকার যেমন বিভিন্ন প্রকারের উহার চিকিৎসা ও তদুপ বিভিন্ন প্রকারের। নিম্নে আলোচনা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যাজনিত অহংকার ও উহার চিকিৎসাঃ আলেম ও বিদ্যানগন খুব কমই অহংকার বিমুক্ত হয়ে থাকেন। ইলমের মর্যাদা সকল জিনিসের চেয়ে বেশী।ইহা আয়ত্তে আসলে স্বভাবতঃই মানুষের মাথায় দুটি খেয়াল চাপিয়ে থাকে। প্রথমতঃ এ খেয়াল হয় যে আল্লাহ তাআলার নিকট আমার সমান মর্যাদা কারো নাই। দ্বিতীয় ঃ খেয়াল হয় আমাকে সম্মান করা সকলের কর্তব্য। অনন্তর কেহ তার সম্মান না করলে তার খু ব আশ্চার্য বোধ হয়ে থাকে। যে সমস্ত আলেমের মনে এ রকম ভাবের উদ য় হয়, তারা প্রকৃত পক্ষে জাহেল।হাদিসে বর্নিত আছে, হাশরের দিন এক শ্রেণীর আলেমকে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তার নাড়ীভুঁড়ি বাহির হয়ে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। যে লোকেরা তার চতুর্দিকে ঘুরতে থাকবে,তারা তার এ দুর্দশা দেখে জিজ্ঞেস করবে হুজুরের এমন অবস্থা কিরুপে হলো? তদুত্তরে সে বলবে, আমি ইলামের উপর আমল করি নাই। অন্যকে উপদেশ দিতাম, নিজে উপদেশ গ্রহন করতাম না। এ জন্যই আমার এ শোচনীয় অবস্থা হয়েছে।

এ ঘটনা হৃদয়ে অংকিত করে রাখলে নিশ্চয়ই আলেমগন এ অহংকার হতে মুক্ত হতে পারে। আর যদি হইাতে ও অহংকার বিনষ্ট না হয় তবে বুঝতে হবে যে তোমার প্রকৃতিই দূষনীয়; আর না হয় তর্কশাস্ত্র , বিজ্ঞান শাস্ত্র দর্শনশাস্ত্র প্রভৃনি অত্যধিক আলোচনায় অন্তরের কালিমা লিপ্ত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এ গুলো বর্জন করতে হবে।

ধর্মপরায়নতা জনিত অহংকার এবং উহা চিকিৎসা ঃ

অহংকারের দ্বিতীয় কারণ ধর্মপরায়ণতা। এ জন্য যারা ইবাদত-বন্দেগী, তাকওয়া, পরহেয়গারী বেশী করে, তাদিগকে অনেক সময় অহংকার করতে দেখা যায়। তারা নিজেদের আল্লাহর প্রিয় বান্দা মনে করে অন্যদেরকে কোন মূল্য দেয় না। যখন এ অহংকার মনে সৃষ্টি হয় তখন মনে করতে হবে আমার থেকে ও অনেক পরহেযগার আছে যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার আশায় নিমগ্ন থাকে, যার ইবাদত ও বন্দেগী সম্পর্কে কেউ জানে না। তারা শত গুনে শ্রেষ্ঠ।

Dhaka University Institutional Repository

অহংকারের শোচণীয় পরিনাম ঃ

বনি ইসরায়ীলদের মধ্যে এক দরবেশ দিবারাত্রি আল্লাহর বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকতেন। একদা ঘটনাক্রমে কোন এক গুনাহগার ব্যক্তি দরবেশের সংস্রবে উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্য তার নিকট গিয়ে বসলো। গুনাহগার ব্যক্তিকে নিকটে বসতে দেখে দরবেশ মনে মনে ভাবল এ নরাধম কেন এখানে আসলো? আমার সাথে তারকোনই সংস্রব নেই। অতঃপর তিনি লোকটিকে বললেন, ও হে ! তুমি এখানে কেন? যাও,দূরে সরে যাও? সে কালের পয়গম্বরের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে উক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে ওহী আসলোঃ অমুক দরবেশকে বলে দাও,তার সমস্ত ইবাদত-বন্দেগী বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর অমুক গুনাহগারকেও বল, তার সমস্ত গুনাহ ও ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।

আর এক দরবেশ নামাজ পড়তেছিল। এমন সময় একটি দুষ্ট লোক এসে সজদার সময় তার ঘাড়ে চাপে বসলো। দরবেশ রাগান্বিত হয়ে বললেন, দূও হও পাপিষ্ঠ ! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কখনও ক্ষমা করবেন না। তৎক্ষনাৎ আল্লাহর প্রত্যাদেশ আসলো, হে অহংকারী দরবেশ ! আমার ক্ষমা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করার অধিকার তোমার কি আছে? আমার বান্দাকে আমার রহমত হতে নিরাশ করার মত অনধিকার চর্চা তুমি কোন সাহসে করছে? যাও আমার দরবারে তোমার অহংকারের ক্ষমা নাই।

হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা ঃ

হিংসা একটি মারাত্মক রোগ, হিংসাকে আরবীতে "হাসাদ"বলে। অন্যের সুখ-সম্পদ দেখে মনে কষ্ট অনুভব করা এবং অন্যের সুখ-সম্পদ দূর হওয়ার কামনা করাকে হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা ।হিংসা করা হারাম[১৪৫]। হিংসা মুসলমান ভ্রাতার এমন কোন নিয়ামক থেকে থেকে বঞ্চিত হওয়ার আকাঙ্খা করা, যে নিয়ামত সে পাওয়ার যোগ্য এবং

[১৪৫] তাবলীগে দ্বীন, প্রাগুক্ত, পৃ-৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

যোগ্যতা বিদ্যমান। যদি অপরের বঞ্চিতের কামনা না হয়ে কেবল নিজের জন্য অনুরুপ কামনা করা হয় তাহলে এটি জায়েজ। হিংসার বিপরীত হলো কল্যাণ, অর্থাৎ নিজের অপরের ভ্রাতার জন্য আল্লাহ ও নেয়ামত কামনা এবং নিয়ামত আছে ও অব্যাহত থাকার আকাঙ্খা পোষণ করা- যে নিয়ামতের সে যোগ্য। যদি কোন মুসলমান ভ্রাতা থেকে এ মন কোন নিয়ামত বিলুপ্তির আকাঙ্খা করা হয়, যে নিয়ামতের যে যোগ্য বা উপযুক্ত নয় তবে তা হিংসা নং বরং গরিমা[১৪৬]।

হিংসা ও বিদ্বেষ এমন এক জঘন্য বস্তু, উহাতে কেহ ধ্বংস হয় আবার কেহ হয় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ। হিংসাকারী নিজেই বঞ্চিত হয়, তার হিংসার কারণে আল্লাহ তা'লা তার প্রাপ্য অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করে। যার হিংসা করা হয় আল্লাহ তায়ালা তাকে তাঁর নিয়ামত আরো বৃদ্ধি করে দেন।

রাসুল (সঃ) ঘোষনা করেন,হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত,নবী করিম (সঃ) বলেনঃ তোমরা হিংসা -বিদ্বেষ থেকে দূরে থাক। কেননা হিংসা মানুষের ভাল গুনাগুন গুলো এমনিভাবে ধ্বংস করে দেয়া- যেমনিভাবে আগুন শুকনা কাঠ জালিয়ে ভস্ম করে দেয়।

হিংসার উৎপত্তি ঃ

হিংসার উৎপত্তি হয় কৃপনতা এবং হীন লিপ্সা থেকে।কেননা কৃপন ব্যক্তি নিজের অধিকৃত সম্পদ অন্যের জন্যে খরচ করতে কুণ্ঠিত হয় আর হিংসুক ব্যক্তি আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত ও অনুগ্রহরে ব্যাপারে কার্পণ্য করে। অথ চ এস বে তার নিজের কোন অধিকার নাই, সম্পূর্ণ আল্লাহর ক্ষমতার ভান্ডার এর জিনিষ। সুতরাং হিংসুকের লালসা নিশ্চিতভাবে মারাত্মক[১৪৭]।

---

[146] মিনহাজুল আবেদীন প্রাগুক্ত পৃ-১২৮

[147] বিদায়তুল হিদায়াহ, প্রাগুক্ত পৃ-৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

হিংসুকের প্রবৃত্তি ঃ

হিংসুক ব্যক্তির প্রবৃত্তি হচ্ছে, আল্লাহ তাঁর অপুরান্ত ভাণ্ডার থেকে যখন কোন বান্দাকে জ্ঞান, সম্পদ মর্যাদা বা অন্যতর কোন নিয়ামত দান করেন,তখন সে ব্যথিত হয় এবং এসব নিয়ামতের অপনারণ কামনা করে, যদি ও সে এসব নিয়ামতের কোন অংশ লাভ করতে পারবে না। এটা চরম পর্যায়ের হীনতা ও ভ্রাষ্টতা।

হিংসুক ব্যক্তি প্রতি মুহুর্তেই অন্তর্জালাতনের শাস্তি ভোগ করতে থাকে এবং তার প্রতি কেউ করুনার দৃষ্টি করেন। কেননা এই পৃথিবীতে তার পরিচিত এবং সমকালীনদের মধ্যে বহুলোক এমন রয়েছে যাদের আল্লাহ পাক তার অনুগ্রহের ভান্ডার থেকে জ্ঞান, সম্পদ বা প্রভাব প্রতিপত্তি দান করেছেন, এদেরকে দেখে সে প্রতিনিয়ত অর্ন্তজ্বালা ও মনকষ্ট ভোগ করছে। এভাবে মরণ পর্যন্ত তার এ শাস্তি অব্যাহত থাকছে। অতঃ পর আখেরাতের শাস্তি তো আছেই। যা আরো মারাত্মক ও মর্মন্তদ।

হিংসার কারণ ঃ

হিংসার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথম কারণ- শত্রুতা। ইহা বতীত কোন কোন লোক মনের কার্পণ্য ও সংকীর্ণতার দরুণ ও পরশ্রীকাতর হয়ে থাকে। এ ধরনে ও লোকের কৃপণতা হেতু অন্যকে তো কিছু দিতে চাহে না, আরো ও চায় আল্লাহর ও যেন কেহ না পায়।

হিংসা দুর করার উপায় ঃ

হিংসা আত্মার রোগ। ইহার চিকিৎসা পদ্ধতি দু'টি।মানসিক ও বাহ্যিক। মানসিক চিকিৎসা হলো এই যে, মনে পরশ্রীকাতরতা উৎপন্ন হয়ে চিন্তা করবে, অন্যের সম্পদ দেখে মনে কষ্ট পাওয়া। ইহাতে ক্ষতি হচ্ছে কার? নিশ্চয় ইহাতে ক্ষতি হচ্ছে নিজের। যার প্রতি বৈরীভাব পোষণ করা হচ্ছে তার তো কোন ক্ষতি নাই, বরং ইহাতে তার

Dhaka University Institutional Repository

উপকারই হচ্ছে। কারণ নেকীগুলো অনর্থক তার আমল নামায় যাচ্ছে;অথচ হিংসাকারী ইহলৌকিক ও পরলৌকিক উভয় দিক দিয়ে ক্ষতিই হচ্ছে।কারণ সে আল্লাহর অফুরান্ত নিয়ামতের মধ্যে বৃথা কার্পণ্য ভ াব পোষণ করে চাচ্ছিল যেন আল্লাহর প্রদত্ত ভোগ বস্তুর অংশ অন্য কেহ না পায়। ইহলৌকিক ক্ষতি এই যে, পরশ্রীকাতর ব্যক্তি নিজের মনের আগুনে নিজেই জ্বলে পুড়ে মরে। সর্বদাই কেবল এ চিন্তা-"অমুক ব্যক্তির ধন-সম্পদ, যদি বিনষ্ট হতো, তার সম্মান-প্রতিপত্তি যদি নিবাশ প্রাপ্ত হতো ইত্যাদি ইত্যাদি"। একবার ভেবে দেখা উচিত, পরশ্রীকাতরতায় অপরের কি ক্ষতি হয়? কিছুই নহে, বরং হিংসাকারী অন্যের অনিষ্টের চিন্তা করে সর্বদা কষ্ট পাচ্ছেও নেকীগুলো সে যার হিংসা করছে সে, অনায়াসে লাভ করছে। আশ্চর্য্যের বিষয় পরের অনিষ্ট করতে গিয়ে নিজেই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তা বুঝতে পারছে না। পরের জন্য কুপ খুদে নিজেই তাতে পড়ছে।

বিশেষরূপে কোন আলেমে অথবা ধর্মনিষ্ট ব্যক্তির উপর যদি হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করা হয় এবং তার ইলম ও পরহেযগারী দূর হওয়ার কামনা করা হয় তবে তা আরো, বেশী মারাত্মক কথা। ইহার পরিনাম তো নিতান্তই মারাত্মক।

হিংসার বাহ্যিক চিকিৎসা ঃ

মনের বিপরীত আচরণ করা। মন অন্যের ছিদ্রান্বেষণ এবং অনিষ্ট কামনা করছে। জোরপূর্বক মনের বিরুদ্ধে উক্ত ব্যক্তির গুণ ও প্রশংসা বর্ণনা করা। তার সম্মান করা এবং তার সুখ-শান্তি ও সম্পদ দেখে আনন্দ প্রকাশ করা। কিছুদিন এরূপ আচরণ করা হলে, পরে নিশ্চয়ই অন্তরে ক্রমশঃ তার প্রতি অনুরাগ ও ভালবাসার উদ্রেক হবে । এ উপায়ে অন্তরের হিংসা দুরহয়ে যায়[১৪৮]।

[১৪৮] তাবলীগে দ্বীন, প্রাগুক্ত, পৃ-৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

হিংসা থেকে রক্ষার উপায় ঃ

হিংসা করা থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং অপরের কল্যাণ কামনার মনোভাব জাগ্রত করার উপায় হলো, মুসলমানদের প্রতি অপরের সহানুভূতি প্রদর্শনের যে নির্দেশ রয়েছে। তা স্মরণ করা । এর চেয়ে আরো উচ্চ পর্যায়ে নিজেকে উন্নীত করার উপায় হলো, মুমিনের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে সব কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্ধারিত করে দিয়েছেন,তা আলোচনা করা এবং এসব পালনের ফলে মু'মিনের যে মর্যাদা ও স ম্মান লাভ হয় তা স্মরণ করা এবং এসব করা যে সব উচ্চ মর্যাদা ও মহিমার কথা, যা আখেরাতে মু'মিনের জান্য নির্ধারিত রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে সব উপকার কল্যাণ, প্রসূ বিষয় সমূহের কথা স্মরণ করতে হবে, ঈদের নামায, জামায়াত, জুম্মা প্রভৃতিতে অপর মু'মিনের সাহচার্য ও সহযোগীতায় যা লাভ করা হয় এবং তার থেকে আখেরাতের যে সুপারিশের আশা আছে। এসব বিষয় স্মরণ ও আলোচনা প্রত্যেকটি মুসলমানের কল্যাণ কামনায় আগ্রহী করে তোলে এবং আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত কোন নিয়ামতের জন্য হিংসার উদ্রেক থেকে করেন মুক্ত[১৮৯] ।

বৈধ হিসেবে হিংসা ঃ

শরীয়তের বিধান অনুযায়ী হিংসা একটি গুরুতর পাপের কাজ এবং তা অবৈধ বলে ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু দু'টি ক্ষেত্রে হিংসাকে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

অনুবাদ ঃ হযরত (আবদুল্লাহ) ইবন মাস'উদ (রাঃ) বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন দু'ব্যক্তির ব্যাপারে ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে হিংসা যায় না।

ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন এবং তিনি ঐ সম্পদ সৎ পথে ব্যয় করার ক্ষমতা দান করেছেন।

---

[১৮৯]. মিনহাজুল আবেদীন, পৃ- ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

ঐ ব্যক্তি যাকে যাকে আল্লাহ্ পাক জ্ঞান দান করেছেন, অতঃপর সে ব্যক্তি ঔ জ্ঞান দ্বারা ন্যায় বিচার করে এবং ঐ জ্ঞান অপরকে শিক্ষা দেয় (বুখারী)।

অত্র হাদিস দ্বারা ও প্রমানিত হলো, দু'টি ক্ষেত্রে হিংসা করা বৈধ এদু'ক্ষেত্র ছাড়া হিংসা করা যাবে না। অর্থাৎ হিংসা করা অবৈধ ও হারাম যদি কোন লোককে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দান করেন এবং সৎপথে খরচ করার তৌফিক দান করেন, তবে এ ক্ষেত্রে তার সাথে হিংসা করা বৈধ। কারণ ইহা সত্যিকার অর্থে হিংসা নয়, বরং কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতা হিংসার মাধ্যমে কোন পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতিযোগতা নয়, বরং পার্থিব ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রতিযোগিতা।

যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন, অতঃপর যে ব্যক্তি উক্ত বুদ্ধি দ্বারা মানুষের প্রতি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং যে জ্ঞান অন্য কে শিক্ষা দেয়, তবে এ ক্ষেত্রে তার জ্ঞানের সাথে হিংসা বা প্রতিযোগিতা বৈধ। কারণ এ প্রতিযোগিতা ও কোন জাগতিক ধন-সম্পদের প্রতিযোগিতা নয়। এ প্রতিযোগিতা জ্ঞানের আলো মানুষের মধ্যে বিতরণের প্রতিযোগিতা। কাজেই এ দু'ক্ষেত্রে মানুষের সাথে হিংসা করায় কোন অপরাধ নেই।

বলা বাহুল্য, যারা আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নিয়ামত বা মাল-দৌলত ও ধন-সম্পদকে অত্যাচার ও অনাচারে ব্যয় করে, এ রকম লোকদের সম্পদ দূর হওয়ার কামণা করায় পাপ নাই। কারণ, এ স্থলে প্রকৃত পক্ষে সম্পদ দূর হওয়ার কামনা করা হয় না, এবং উক্ত পাপ কর্ম দুর হওয়ারই কামনা করা হয়। তবে এরূপ স্থলে অন্তর পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, সে ব্যক্তি সুপথে এসে সম্পদ ভোগ করলে, তাতে মনে কোন শত্রুতা আসে কি না? যদি সে সুপথে আসার পরও মনে কোন শত্রুতা আসে, তাহলে বুঝতে হবে, মন পবিত্র হয়নি। আর যদি

Dhaka University Institutional Repository

সৎপথে আসার পর মনে কোন আপত্তি না থাকে,তাহলে বুঝতে হবে মন পবিত্র[১৫০]।

অবশ্য অন্যের সুখ সম্পদ, সম্মান ও উন্নতি দেখে নিজেও তদরুপ সম্পদ লাভের কামনা করা এবং এরুপ আকঙ্খা করা সে, তার সম্পদ তার থাকুক, আমাকে ও আল্লাহ তা'আলা তাদের মত সম্পদ সম্মান ও উন্নতি দান করুক, এতে কোন দোষ নাই। ইহাকে আরবী ভাষায়"গেঞ্চা" এবং ফারসী ভাষায় "রশক" বলে।

ক্রোধ

ক্রোধ ঃ 'ক্রোধ অগ্নিশিখার মত, সুতরাং ইহাকে দমন কর্তব্য, নতুবা যে কোন সময় উহা তোমাকে আগুনের মত জ্বালিয়ে পোড়ায়ে ভস্ম করে ফেলবে। রাসুল (সঃ) এ সম্পর্কে এরশাদ করেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসুল (সঃ) এরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তি শক্তিশালী নয়, সে খুব কুস্তিতে লড়তে পারে, বরং শক্তিশালী হচ্ছে এ ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজকে আয়ত্ত রাখতে পারে (বুখারী)।

তিক্ত নিম ফলের সংমিশ্রনে যেমন মধুও তিক্ত হয়ে যায়, তেমনি ক্রোধের সংমিশ্রনে ঈমান কলুষিত হয়ে থাকে। ক্রোধ নিতান্ত অনিষ্টকর জিনিস বিদায় মানুষ গালি-গালাজ, খুন,-খারাপি প্রভৃতি পাপে লিপ্ত হয়ে থাকে। ক্রোধ হতে শত্রুতা উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং একে অন্যের মঙ্গল দেখতে পারে না। এ ধরণের অনেক অনিষ্টই ক্রোধ হতে উৎপন্ন হয়। এ জন্য ক্রোধ আয়ত্ব করা সকলের প্রয়োজন।

---

[১৫০] তাবলীগে দ্বীন, প্রাগুক্ত, পৃ-৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

রাসুল (সঃ) এমন এক ব্যক্তিকে বললেন, "যে ব্যক্তি তাঁকে বলেছিল আমাকে কিছু নছিহত করুন! তিনি (রাসুল) তাকে বললেন,তুমি ক্রোধের বশবর্তী হইও না। লোকটি কয়েকবার এরূপ প্রশ্ন করলে তিনি ও তাকে প্রতিবার বললেন ঃ তুমি ক্রোধের বশবর্তী হইও না।"

অত্র হাদিস দ্বারা বুঝা গেল, ক্রোধ সংবরণ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। রাগ বা ক্রোধ দমন করতে না পারলে ক্রোধের কারণে যে কোন অনাকাঙ্খিত ঘটন ঘটে যেতে পারে। একজন মানুষ ক্রোধের বশব র্তী হয়ে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে খুন-খারাপিসহ যে কোন ধরনের জঘন্য ঘটন ঘটিয়ে দিতে পারে। তাই ও রাসুল (সঃ) ক্রোধ ক্রোধকে সংবরণ করার জন্য গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি উক্ত ব্যক্তিকে নছীহত করতে গিয়ে তার বার বার প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, তুমি ক্রোধ এর বশবর্তী হইও না। তিনি ক্রোধকে কুস্তিগীরের সাথে তুলনা করেছেন। একজন কুস্তিগীরি শারীরিক শক্তিও কৌশলের মাধ্যমে প্রতিপক্ষ শত্রুকে পরাজিত করে থাকে। একজন ক্রোধ দমনকারী তার গোটা সত্তা দিয়ে ক্রোধ নামক শত্রুকে করে থাকে।

রাসুল (সঃ) ঘোষনা করেন "যদি তোমাদের কারও দাঁড়ান অবস্থায় রাগ আসে তবে যে যেন বসে পড়ে। যদি হহাতে ক্রোধ প্রশ মিত হয় (তবে তা উত্তম) অন্যথায় সে যেন অবশ্যই শুয়ে পড়ে।"

ক্রোধে ও প্রকারভেদ ঃ

ক্রোধের মধ্যবর্তী অবস্থাকে বীরত্ব বলা হয়।আল্লাহর নিকট ইহাই পছন্দনীয়। ক্রোধ অতিরিক্ত হওয়াও দুষণীয়, কম হওয়া দূষনীয়। ক্রোধের আধিক্যকে দুঃসাহস এবং স্বল্পতাকে কাপুরুষতা বলে। বলা বাহুল্য-এ দুই'টি অবস্থায় নিন্দনীয়, ক্রোধে ও আধিক্যকে দুঃসাহস এবং স্বল্পতাকে -নম্রতা, দয়া, নির্ভীকতা, তেজক্রিয়তা, ধৈর্য্য, স্থিরতা, ক্রোধ দমনে সক্ষমতা, কাজে দূরদর্শিতা এবং গাম্ভীর্যের উদয় হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রোধে ও আধিক্য-অদূরদর্শিতা, ক্রোধান্ধিতা, অহংকার, আত্মপ্রশংসা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ক্রোধাল্পতার দরুণ কাপুরুষতা, ভীরুতা, সম্মান জ্ঞানহীনতা এবং নীচাশজ্ঞার যাবতীয় নিদর্শন প্রকাশ পায়।

ক্রোধ দমনের উপায় ঃ

প্রথম উপায়- কঠোর সাধনার দ্বারা ক্রোধকে দমন করতে হবে। অসৎ ক্রোধের সময় স্বেচ্ছাকৃত ধৈর্য্যকে প্রবল করে কর্মধারাকে সোজা পথে চালিত করতে হবে। যখনই কোন ক্রোধ উদ্দীপক ঘটনা ঘটে, তখনই বল পূর্বক ক্রোধকে দমন করে রাখিত। ইহাই হচ্ছে ক্রোধ দমনের কঠোর সাধনা। কিছুকাল এরুপ চেষ্টা করলে দেখবে, ক্রোধ তোমার বশীভূত হয়েছে। একথা ও জানা উচিত যে, ক্রোধ দমন করার অর্থ অন্তর হতে ক্রোধের মূল উৎপাটন করা নহে, বরং ক্রোধকে শায়েস্তা করা এবং বিবেক ও শরীয়তের অনুগত করা। শিকারী কুকুর যেমন পূর্ণরুপে শিকারীর অনুগত হয়ে থাকে এবং তার ইঙ্গিতমত চালিত হয়ে থাকে, তোমরা ক্রোধ ও তদ্রুপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অবাধ্য ক্রোধই ক্ষ তির কারণ, নতুন ক্রোধ ও উপকারী জিনিস,যদি তোমার ক্রোধই না থাকে, তবে খোদার দুশমনদের সাথে কিরূপে জিহাদ করবে? সুতরাং ক্রোধকে বশীভূত ও শরীয়তের অনুগত করে ইহা দ্বারা উপযুক্ত কাজ আদায় করাই তোমার কার্তব্য।

দ্বিতীয় উপায়ঃ-যখন ক্রোধকে উদ্রেক হয়, ধীরভাবে চিন্তা করবে যে, ক্রোধ কেন হয়? নিশ্চয়ই কোন কাজ হইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়েছে। এজন্য ক্রোধ হয়েছে।

একথাও অনিবার্য যে, উক্ত কাজটি খোদার ইচ্ছায় হয়েছে। অর্থ এ দাঁড়ায়, কাজটি তোমার ইচ্ছামত না হয়ে খোদার ইচ্ছামত তোমার ক্রোধের কারণ ইহা নিতান্তই বোকামি নয় কি?

Dhaka University Institutional Repository

যখন ক্রোধ উপস্থিত হয় তখন পড়বে। ক্রোধ শয়তানের প্ররোচনায় হয়ে থাকে। সুতরাং শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করলে নিশ্চয় সুফল ফলবে। সঙ্গে সঙ্গে তোমার অবস্থার পরিব র্তন কর, দাঁড়ান থাকলে বসে পড়, বসা থাকলে শুয়ে পড়, ইহাতেও ক্রোধের উপশম না হলে তৎক্ষনাৎ ঠান্ডা পানি দ্বারা অযু কর এবং মাটিতে মাথা রেখে আল্লাহর দরবারে নিজের ক্ষদ্রতা দেখাও। ইহাতে নিশ্চয়ই, " সাপের মাথায় ধুলা পড়ার মত তোমার ক্রোধ দমে যাবে। হাদিসে বর্ণিত আছে,

"কোন মুসলমানের যদি নিজের অধিনস্ত লোকের উপর ক্রোধ হয় এবং প্রতিশোধ গ্রহনের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ধর্য্য অবলম্বন করে,আল্লাহ তা'আরা তার অন্তঃস্থল শান্তি ও ঈমান দারা পরিপূর্ণ করে দিবেন।" ধৈর্যগুলোর দ্বারা মুসলমান রাত্রি জাগরনকারী, রোযাদার এবং আবেদ-যাহেদের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

রিয়া- প্রদর্শনেচ্ছা

রিয়া ঃ

লোক দেখানো ভাব, বা প্রদর্শনেচ্ছা, যে ইবাদত লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে হয় উহাকে রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা বলা হয়। আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে রিয়া রাখা মহাপাপ। উহা আল্লাহর সাথে শিরক করার তূল্য ঘৃনিত ও গর্হিত। আবেদের মনে রিয়া ভিন্ন অন্য কোন প্রকার কঠিন পাপ বাসা বাঁধতে পারে না। ইবাদত বন্দীগীর সময় মনে যদি এ ধারণা উদ্রেক হয় যে, লোকে আমার ইবাদত দেখে আমাকে দরবেশ বলুক এবং বুযুর্গ মনে করে আমাকে সালাম করুক, তবেই বুঝতে হেব, রিয়া নামক ধ্বংসাত্মক ব্যাধিতে তার হৃদয় আক্রান্ত হয়েছে। ইবাদতের মধ্যে বিন্দু পরিমান অন্যের শ্রদ্ধা ও আকর্ষনের ক্ষীন আশা থাকলে ও

Dhaka University Institutional Repository

উহা আল্লাহর ইবাদত বলে গন্য হবে না। বরং উহা মানব পুজায় পরিনত হবে[১৫১]।

আবার উহাতে আল্লাহর ইবাদত এবং লোকের ভক্তি আকর্ষন করার উদ্দেশ্যে থাকলে উহা ভাগাভাগি হয়ে কিছুটা আল্লাহর জ্য এবং কিছুটা মানুষের জন্য হয়ে শিরকে পরিনত হয়। এ সম্পর্কে আলআহ তা'য়ালা বলেন,

"যে ব্যক্তি নিজের প্রভূর সাক্ষাৎপ্রার্থী সে যেন সৎকাজ করে এবং তার প্রভুর ইবাদত করে শরীক না করে। (আল কুরআন)

লোক দেখানোর ইবাদতকারীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন,

"এমন নামাযীদের প্রতি ধিক্কার যারা নামাযের প্রতি মন লাগায় না এবং লোক দেখানো মনোভাবে ইদবাতও করে থাকে। (মাউন-৪-৫)

ইবাদতের নিয়ত ঠিক করা এবং ইবাদতকে রিয়াকারী হতে বিমুক্ত করা প্রত্যেক মুসলমানদের কর্তব্য। রিয়াকারীকে শিররকে আগর" বা ছোট শিরকবাদ বলা হয়। "আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নাই" ইহাই তৌহিদ বা একাত্মবাদের মূলমন্ত্র। রিয়াকার উপাসক স্বীয় উপাসনার মধ্যে আল্লাহ ভিন্ন অন্যের মন সন্তুষ্টি ও ইচ্ছা করে। সুতরাং ইহা প্রকারান্তরে অংশীবাদের মধ্যেই গন্য হয়।

হাশরের দিন যখন আল্লাহ তাআলা নেক ও বদের হিসাব নিবেন এবং প্রত্যেককে উপযুক্ত রকমের সাজা বা পুরুস্কার প্রদান করবেন, তখন রিয়াকারগনও নিজেদের এবাদতের পরিতোষিক পাবার আশায় বুক বেঁধে দরবারে হাজির হবে। হুকুম হবেঃ তোমরা যাদের সন্তুষ্টির বিধানের জন্য ইবাদত করতে,পুরস্কারের জন্য তাদের নিকটহ যাও। আমি তোমাদিগকে এক কপর্দক ও দান করবো না। এক দী হাদিসে বর্ণিত আছে।

---

[151]. ইমাম গাযালী (রঃ), এসলাহে নফস, অনুবাদক-আবদুল জলীল, ঢাকাঃ ১৯৯৫, রশিদ বুক হাউজ, পৃ-৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

হাশরের দিন, ধর্ম-যোদ্ধা দাতা, আলেম ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ই আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ কাজের পরিতোষিক চাইবে। আল্লাহর দরবার হতে ঘোষণা হবে।তোমরা আমার সন্তুষ্টি ও জন্য কোন সৎকর্মই কর নাই, কেবল এজন্য করেছ যে, লোকেরা তোমাদিগকে গাজী বলবে, আলীম বলবে, অথবা দাতা বলে সুনাম করবে। তোমাদের যা উদ্দেশ্য ছিল, তা তোমরা তোমারা দুনিয়াতেই পেয়েছে,দুনিয়াতে তোমাদের যথেষ্ট সুনাম হয়েছে, এখন আর আমার নিকট তোমাদের কোন প্রাপ্য নাই। সুতরাং যাও, তোমাদের স্থান জাহান্নাম।

রাসুল (সঃ) বলেন, কোন কাজে সামান্য রকমের রিয়া থাকলে ও তা আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন না।

একদা এক ব্যক্তি মাথা ঝুঁকায়ে বসেছিল। লোকটির উদ্দেশ্য ছিল খোদার ধ্যানের ভান করে নিজের দ্বীনদারী প্রকাশ করা, হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তাকে এরুপাবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেনঃ ওহে ' মাথা তুলে বসো। গ্রীবা বক্র করলেই কি ধার্মিক হওয়া যায় ? ধর্মত আত্মার সংগে সম্বন্ধ রাখে। আত্মাকে শুদ্ধও নিয়ত ঠিক না করে লোক-দেখানো উদ্দেশ্য এবাদতের ভান করায় কি ফল?

রিয়াকারীর মর্মার্থ ঃ

রিয়াকারীর অর্থ-স্বীয় ইবাদত দ্বারা অন্যের মনে প্রভূত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করার আশা করা। ইহা ইবাদতের আসল উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। এবাদতের আসল উদ্দেশ্য হলো-একমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভ করা। এ স্থলে কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির সংগে সংগে মানুষের সন্তুষ্টির ও কামনা করা হচ্ছে ।

হযরত আলী (রাঃ) রিয়াকারের মধ্যে অবশ্যই তিনটি নিদর্শন থাকবে, রিয়াকার নির্জনে অলস থাকে এবং লোক সমাবেশে কর্মঠ হয়ে উঠে। কেহ তার নিন্দা করলে সে কাজ করা হতে বিরত থাকে এবং লোকের প্রশংসা পাওয়ার জন্য অধিক পরিশ্রম করে।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, লোকের প্রশংসা এবং সম্মান পাওয়ার আশায় ইবাদ ত বন্দেগী করলে আল্লাহ বলেন, দেখ, আমার বান্দা আমার সাথে কেমন ঠাট্টা করতেছে।

রিয়াকারীর শ্রেণী বিভাগ ঃ রিয়াকারী ছয় প্রকারের হয়ে থাকে।

প্রথম প্রকার ঃ অংগে সংক্রান্ত রিয়া, নিজকে অন্যের সামনে রোজ দারের ভাব দেখানো। রাত-জাগরনকারী ভাব দেখায়ে প্রকাশ কর সে একজন উত্তম ইবাদতকারী।

দ্বিতীয় প্রকারঃ নিজকে দরবেশ রূপে প্রকাশ করার উদ্দেশ্য মাথা ঝুকিয়ে থাকা, গোঁফ মুড়াইয়া ফেলে, এবং নানা রকম ভংগিমা ও বিচিত্র হাবভাব প্রকাশ করা। যাতে লোকে ভাবে, লোকটি খোদার প্রেমের আতিশয্যে জ্ঞান হয়ে গিয়েছে।

তৃতীয় প্রকারঃ আকৃতি ও বেশ ভূষা সংক্রান্ত রিয়া। যথা- মোটা কাপড় পরিধান করা, খুব উঁচু করে পায়জামা পরা, ময়লা যুক্ত কাপড় ব্যবহার করা, দর্শকগণ মনে করে লোকটি খুব ওলী দরবেশ।

চতর্থ প্রকার ঃ কথাবার্তা সংক্রান্ত রিয়াকারী। তোমরা হয়ত দেখেতে থাকবে যে, ব্যবসায়ী বক্তা ও ওয়ায়েযগন নানা রকম ভংগিমা ও অংগ চালনা সহকারে বক্তৃ তা করে থাকনে। লোকেরা অবস্থা দেখে মনে করে, লোকটি বড় আলেম, সূফী। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তার মনে বিদ্যা বুদ্ধি অথবা সাধু তার নাম নিশানও নাই।

পঞ্চম প্রকার ঃ ইবাদতের মধ্যে রিয়াকারী করা। যথা- নামায়ের মধ্যে অধিকক্ষণ কিয়াম করা রুকু ও সজদায় গৌন করা,ইত্যাদি।

ষষ্ঠ প্রকার ঃ নিজের শিষ্য ও মুরীদের আধিক্য এবং নিজের ওস্তাদ -পীরের বেশী রকম আলোচনা করার মধ্যে রিয়াকারী নিহিত থাকে।

বিভিন্ন এবাদতে রিয়াকারীর অবস্থা ঃ

যে সমস্ত এবাদতে রিয়াকারী হয়, সে গুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত; সুতরাং তৎসংক্রান্ত রিয়াগুলিও বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে, যথা- রিয়ার প্রথম অবস্থাঃ ঈমানের মধ্যে রিয়াকারী করা।অর্থ্যাৎ কেবল

Dhaka University Institutional Repository

লোক দেখানো ভাবে মুসলমান হওয়া এবং অন্তরে কুফরী ভাব পোষন করা। এ রকম লোককে মুনাফিক বলা হয়। ইহারা দুনিয়ার স্বার্থের জন্য ঈমান আনার ভান করে, কিন্তু তাদের হৃদয়ে ঈমানের নিশানা ও থাকে না। মুরতাদগন ও এ শ্রেণী অন্তর্ভূক্ত । ইহারা ইসলাম ধর্ম হতে আ স্থাহারা হয়ে বেদ্বীন কাফের হয়ে থাকে, কিন্তু স্বার্থের কারনে লোক-সমাজে নিজেদের ধর্মদ্রোহিতা প্রকাশ করে না। এ শ্রেণীর রিয়াকারী সর্ব াপেক্ষা বেশী মারাত্মক।

রিয়ার দ্বিতীয় অবস্থা ঃ মূল এবাদত সমূহ রিয়া করা। যথা লোকদিগকে দেখাবার উদ্দেশ্য নামায পড়া, থাকাত দেয়া ইত্যাদি। এ শ্রেণীর লোকেরা নামাযের সময় অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যগত এবাদতের সময় নির্জন স্থানে অবস্থান করলে এবাদতের নাম ও মুখে আনে না। এ রিয়ার পদ প্রথমোক্ত রিয়ার নিম্নে হলেও ইহা অতীব ক্ষতিকর এবং নিম্ন শ্রেণীর শিরকের মধ্যে গন্য।

রিয়ার তৃতীয় অবস্থাঃ ইহাকে রিয়ার সর্বনিম্ন অবস্থা বলা হয়। এ অবস্থা ফরজ এবাদতের মধ্যে রিয়া হয় না সত্য, কিন্তু নফল ইবাদতের মধ্যে রিয়া হয়ে থাকে।যথা, লোক উপস্থিত থাকলে বেশী পরিমান নফল পড়া হয়; ফরয গুলোকে ও খুব ভাল ভাবে পড়া হয়। কিন্তু নির্জনে নফল পড়াত দূরের কথা। ফরযও ঠিকভাবে পড়া হয় না।এরুপ রিয়াকারীর গোনাহ ঈমান ও মূল ফরয এবাদতের মধ্যে রিয়াকারীর চেয়ে অবশ্য হালকা।

প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রিয়া ঃ

রিয়া দুপ্রকার। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশা। জন সমাগমের সময় রিয়াকারীর নিদর্শন প্রস্ফুটিত হলে ইহাকে প্রকাশ্য রিয়া বলে। যেমন জনসমাগমের সময় যে রকম ইবাদত করা হয় নির্জনে তেমন হয় না। এ অবস্থায় রিয়াকারীর নিদর্শন প্রকাশিত হয়ে পড়ায় ইহাকে প্রকাশ্য রিয়া বলে। গুপ্ত রিয়াকে অপ্রকাশ্য রিয়া বলে। যেমন, একন ব্যক্তি সর্বদা

Dhaka University Institutional Repository

তাহাজ্জুদ এর নামায় পড়ে, কিন্তু কোন দিন বাড়ীতে অতিথি থাকলে সে দিন তাহাজ্জুদ পড়তে খুবই আনন্দ হয়।এরুপ অবস্থায় রিয়া অন্তরে লুকায়িত থাকার দরুন ইহাকে অপ্রকাশ্য রিয়া নাম দেয়া হয়।

রিয়াকারীর চিকিৎসা ঃ

রিয়া অতিশয় ভয়ানক রোগ,তাই খুব সাবধানতার সহিত ইহার চিকিৎসা করা দরকার। রিয়ার চিকিৎসা করতে হলে প্রথমেই উহা মুল কারন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। রিয়ার উৎপত্তির কারণ সাধারণতঃ প্রশংসা কামনা,অপবাদের ভয় ও ধর্ম সম্পদের লালসা, নিম্নে চিকিৎসা পদ্ধতি বিশদ ভাবে বর্ণনা করতেছি।

প্রশংসা-কামনাজনিত চিকিৎসা ঃ

এক ব্যক্তি রনক্ষেত্রে বীরত্ব প্রকাশ করছে। উদ্দেশ্য,যাতে তার সুনাম হয়। লোকে বীর ও বাহাদুর বলে তার গুন-কীর্তন করে। ইহাকে প্রশংসা কামনা বলে। চিকিৎসার উপায়, সে মনে চিন্তা করবে, যে বীরত্ব ও ইবাদত দ্বারা আজ আমার সুনাম হচ্ছে। হাশরের দিন তাই লোক সমাজে আমাকে অপমানিত ও লজ্জিত করবে,আমাকেব পাপী ও রিয়াকার বলে সম্বোধন করা হবে। তদু পরি আমার আজীবনের সমস্ত ইবাদত বন্দেগী রিয়াকারীর কারণে বরবাদ হয়ে যাবে। ক্ষনস্থায়ী সৃষ্ট জীবরে নিকট ইহা জীবনে নগন্য প্রশংসা লাভের জন্য আল্লাহর ক্রোধভাজন হওয়া এবং হাশর মাঠের অপমান অর্জন করা নিশ্চয়ই নিতান্ত বোমাকী।

আর ও ভাববে আমি যে সমস্ত লোকের সন্তুষ্টি ও প্রশংসা কামনা করছি। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে তাদের দ্বারা আমার কুৎসা ও করাতে পারনে। এ হিসাবেও ক্ষনস্থায়ী প্রশংসার বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে বিক্রয় করা কখনও বিধেয় হতে পারে না।

অপরাধের ভয় ঃ

Dhaka University Institutional Repository

অনেক সময় লোক অপবাদের ভয়ে ইবাদত করা হয় ইহাও রিয়াকারীর অন্তর্গত। ইহা দৃও করতেন ইচ্ছা করলে মনে মনে চিন্তা করবে। যদি আল্লাহ তাআলা নিকট পছন্দনীয় হয়। লোকের অপবাদ কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। অতএব, লোক অপবাদের ভয় করার কি কারণ আছে?

ধন-সম্পদ লালসাজনিত রিয়ার চিকিৎসাঃন রিয়ার তৃতীয় কারন-ধন লিপ্সা। এ রিয়ার চিকিৎসা করতে চাহিলে ভাববে- যে বস্তুর লোভে রিয়াকারী করা হয়েছে। তা লাভ হতেও পারে নাও হতে পারে; কিন্তর রিয়ার দরুন আল্লাহর অসন্তুষ্টি লাভ হওয়া অনিবার্য। একটি অনিশ্চিত বস্তুও চেষ্টা করতে গিয়ে আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হওয়াকে পছন্দ করবে? লোভ করতে গিয়ে লোক সমাজে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে। আর নির্লোভি হতে পারা যায়। আল্লাহ তাআলা পদে পদে সহায়তা করবে এবং সমস্ত লোক আপনা হতে অনুগত হয়ে পড়বে।

সত্য কথাগুলো অন্তরে গেঁথে রাখলে রিয়াকারীর নাম-নিশানা পর্যন্ত হৃদয় পট হতে মুছে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ আল-গাযালী মুসলিম সমাজে যে পরিবর্তন সাধন করেছেন তা ইতিহাসে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। গোটা মুসলিম জাতি গ্রীক দর্শনের প্রভাবে ইসলামী আকিদা থেকে দূরে সরে যাবার সময় তিনি ইসলামী দর্শন দ্বারা গ্রীকদের মতবাদকে অকার্যকর হিসেবে প্রমাণ করে দেখান। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার মতবাদের সংমিশ্রনে মুসলিম সমাজে যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় গাযালী (রঃ) বিচক্ষণতার মাধ্যমে তার অবসান ঘটান। মুতাকাল্লিম, বাতেনিয়া এবং সূফীবাদের মনগড়া চিন্তা এবং ধারণাও তিনি মূলৎপাটন করেন। আর এ ভূমিকা পালন করতে গিয়ে তিনি ইসলামে যে অবদান রেখে যান তার সামান্যই এখানে আলোক পাত করা হলো। ইসলামী শিক্ষার প্রত্যেকটি দিকের উপর তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণ গ্রন্থ রচনা করেন। এসবের অধিকাংশ আরবী ভাষায় রচিত। মূলত এসব গ্রন্থে আল্লাহর পরিচয়, আত্মার পরিচয়, ঈমান, তাক্ওয়া, গীবত, অহংকার, হিংসা, ক্রোধ, রিয়া ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

বলা যেতে পারে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান একই সূত্রে গ্রথিত।

Dhaka University Institutional Repository

আল-গাযালী (১০৫৮-১১১১ খ্রী.)

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

ইমাম গাযালী, *মিনহাজুল আবেদীন*, মজিবুর রহমান অনু. (ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৯৬৯)।

ইমাম গাযালী, *সৌভাগ্যের পরশমনি*, আবদুল খালেক অনু. (ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৯৯৩)।

হাসান আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস ও বাংলাদেশ* (ঢাকা : আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৯৫)।

কে আলী, *ইসলামের ইতিহাস* (ঢাকা : আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৯৩)।

মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *বিশ্বের মুসলিম মনীষীদের কথা* (ঢাকা : আর, আই, এম, পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭)।

মুহাঃ সাখাওয়াত উল্যাহ, *হায়াতে ইমাম গাযালী (রহঃ)* (ঢাকা : তাবলীগ কুতুব খানা, ১৯৯৩)।

আল-গাযালী, *মেশকাতুল আনোয়ার*, আবদুল জলিল অনু., (ঢাকা : বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ)।

ইমাম গাযালী, *সত্যের সন্ধান*, আনিস চৌধুরী অনু., (ঢাকা : হাফিজিয়া কুতুবখানা, ১৯৯৭)।

শাহ হাকিম মুহাঃ আখতার, *মা'আরেকে মাছনবী* (ঢাকা : খানকাহ এমদাদিয়া আশরাফিয়া, ১৯৯৭)।

সায়্যিদ আবুল হাসান নদভী, *কাবুল থেকে আম্মান*, আবদুল মতিন জালালাবাদী অনু., (ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৯৯৪)।

আবু জাফর, *রাষ্ট্র দর্শনে মুসলিম মনীষা* (ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৯৭৯)।

ইমাম গাযালী, *সৃষ্টির দর্শন* (ঢাকা : হাবিবিয়া বুক ডিপো, ১৯৮২)।

ইমাম গাযালী, *সত্যিকারের সম্পদ*, এমদাদ উল্যাহ অনু., (ঢাকা : আজিজিয়া, কুতুব খানা, ১৯৭৫)।

শায়খ মুহাম্মদ আস-সালেহ আল ওসাইমীন, *আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতে আকিদা*, এ,কে,এম আবদুর রশিদ অনু., (ঢাকা : আলফালাহ প্রিন্ট প্রেস, ১৯৯৩)।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম গাযালী, *বিদায়াতুল হেদায়া*, মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্যাহ অনু., (ঢাকা : দারুল কিতাব, ১৯৯৪)।

ইমাম গাযালী, *আর রিসালাতুল-ওয়াজিয়্যাহ*, মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্যাহ অনু., (ঢাকা : দারুল কিতাব, ১৯৯৪)।

ইমাম গাযালী, *মজলিসে গাযযলী*, আবদুল জলিল অনু., (ঢাকা : রশিদ বুক হাউজ, ১৯৯৫)।

ইমাম গাযালী, *এসলাহে নফস*, আবদুল জলিল অনু., (ঢাকা : এস, এস পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫)।

মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব* (ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৯৮২)।

আল গাযালী, *তাবলীগে দ্বীন*, মাওলানা আশেক এলাহী অনু., (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৭)।

ইমাম গাযালী, *আদাবুন নবী*, কাজী আসাদুল্যাহ মাজহারী অনু., (ঢাকা : হাবিবিয়া বুক ডিপো, ১৯৮৩)।

ইমাম গাযালী, *দাকায়েকুল আখবার*, আবদুল জলিল অনু., (ঢাকা : আদর্শ পুস্তক বিপনী বিতান, ১৯৯৭)।

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* (কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৫৭)।

আবদুল বাকী, *দর্শনের কথা* (ঢাকা : হাসান বুক হাউজ, ১৯৭৩)।

মুফতি শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, মহিউদ্দীন খান অনু., (ঢাকা : ই. ফা. বা, ১৪১৩ হি.)।

আবদুল মওদূদ, *মুসলিম মনীষী* (ঢাকা : ই. ফা. বা, ১৯৮০)।

হারুনুর রশিদ, *মুসলিম মনীষীদের ছোটবেলা* (ঢাকা : ই. ফা. বা***)।

মোঃ গোলাম রসুল, *ইমাম গাযালীর পরিচিতি* (রাজশাহী : ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ই. ফা. বা, ১৯৮০)।

কাজী মোঃ আবদুল্যাহ্, *ছোটদের ইমাম গাযালী*।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম জাওযিয়্যাহ (রাঃ), *রূহ*, মুজীবুর রহমান অনু., (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৯)।

Dhaka University Institutional Repository

মুশতাক আহমদ, *তাহরীকে দেওবন্দ* (ঢাকা : শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৮)।

ডঃ এম, হুদা, *মুসলিম দর্শনের মূলতত্ত্ব* (ঢাকা : ইউরেকা বুক হাউজ ১৯৮৮)।

ইবনে গোলাম আসাদ, *ইসলামী শিল্প কলা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী)।

আবদুল গাফফার হাসান রহমান নদভী, *ইনতেখাবে হাদিস*।

নাজির আহমদ, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস* (ঢাকা : আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৮১)।

জি. এম, মেহেরুল্যাহ, *আরবী কবি সাহিত্যিক ও সাহিত্য* (ঢাকা : আল নাহদা প্রকাশনী, ১৯৯৩)।

সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ই. ফা. বা. ১৯৯১), ১০ম খণ্ড।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৭।

Muhammad Sharifkhan, Muhammad Anwar Saleem, *Muslim Philosophy and Philosophers* (Delhi : Ashish Publishing House, 1994).

Fazlul-Karim, *Muslim world* (New Delhi : Islam breaks Fresh Ground Ashish publishing House, 1986).

R.A. Nicholson, *A Literary History of Arabs* (Delhi : Adam Publishers and Distributers, 1907).

lBn Khailikan, *Biographical Dictionary*, Vol-1.

D.B. Macdonald, *Development of Muslim Theology*, 1903.

W.H.T. Gairdnes, *An account of Ghazzalis life and works* (Madras : 1919).